শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)

ডানা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

নদীর ধারের প্রকাণ্ড শিমুলগাছটায় পাতা নেই। অসংখ্য লাল ফুলে ভ'রে উঠেছে সেটা, আর তাকে কেন্দ্র ক'রে সাড়া প'ড়ে গেছে পাখিদের মহলে। জোয়ারি, হাঁড়িচাঁচা, টুনটুনি, শালিক, গো-শালিক, টিয়া, ছাতারে, কাক, বুলবুল—একটা হাট বসে গেছে যেন। কাকলী-কলরবে নদীতীর পরিপূর্ণ, আকাশটাও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন কৌতূহলভরে। নদীর স্বচ্ছ শীর্ণ ধারাতেও লেগেছে আনন্দের ছোঁয়াচ, অসংখ্য উর্মির শিহরণ জেগেছে যেন তার স্রোতোধারায়। নদীর ওপারে শুভ্র সৈকত। তার ওপারে মাঠ, গম যব মটর ছোলার ক্ষেত। শ্যামকান্তি নেই আর তাতে। শিশু-প্রাণের সবুজ অবুঝ উচ্ছলতা আর দেখা যাচ্ছে না, যৌবনের স্বর্ণাভা ফুটে উঠেছে চারিদিকে, ছড়িয়ে পড়েছে দিগ্‌দিগন্তে সকল সৌন্দর্যের সার্থক মহিমা। লুটিয়ে পড়েছে।

…মুগ্ধনেত্রে দেখছিলেন আগন্তুক পথিক। পদ্মাসনে ঋজু-মেরুদণ্ড হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি সেই প'ড়ো ঘরটির সামনের চাতালে। দেখতে দেখতে প্রায় পনেরো দিন কেটে গেছে। আরও কাটবে বোধ হয় কিছু কাল। এঁরা যতদিন না আপত্তি করেন, থাকবেন তিনি এখানে। থাকবার যে বিশেষ একটা আগ্রহ আছে, তা নয়। আগ্রহের সঙ্গত কারণ যদিও আছে একটা, কিন্তু সেটাকে আঁকড়ে ধ'রে থাকবার প্রবৃত্তি নেই তাঁর। থাকবেন, কারণ

কোথাও তো থাকতে হবে! এ জায়গাটা ভাল লাগছে। নদীতীর বেশ নির্জন। যে মেয়েটি ওই বাড়িটাতে থাকে, আশঙ্কা ছিল, সে হয়তো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। সে কিন্তু বিশেষ কিছুই করে না, ও-বাড়িতে কোন লোক আছে ব'লেই মনে হয় না। সামনের বারান্দায় ক্যাম্পচেয়ারে ব'সে থাকে চুপ ক'রে সামনের দিকে চেয়ে। কখনও পড়ে। বিকেলে নদীর ধারে বেড়াতেও দেখা যায়। মাঝে মাঝে তাঁর কাছেও আসে, খোঁজখবর নেয়। প্রশ্নও করে দু-একটা এমন বিষয়ে, যাতে মনে হয়, মেয়েটি অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছে। আগন্তুক হাসেন মনে মনে। ভাবেন, সবাই হাতড়াচ্ছে, কেউ সেটা বোঝে, কেউ বোঝে না।...ভাল লাগে মেয়েটিকে। হয়তো পিপাসা জেগেছে। মনে প'ড়ে যায় পুণার মুসলমানী সন্ন্যাসিনী হজরৎ বাবাজানের কথা। মুখময় বলি-রেখা, মাথায় শুভ্র কেশভার। চোখের দৃষ্টিতে কিন্তু শিশুসুলভ কৌতূহল যেন পাখা মেলে উড়তে চাইছে অজানার উদ্দেশে। ডানাকে দেখে শঙ্কা হয়েছিল তাঁর প্রথম প্রথম। এখন আর ভয় নেই। যে অনর্থ আশঙ্কা ক'রে মহাজনরা কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন, সে অনর্থের সম্ভাবনা ডানার মধ্যে লক্ষ্য করেন নি তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে। তার তূণে অসংখ্য মোহিনী বাণ আছে তা সত্য, কিন্তু তাঁর কাছে যখন আসে, তখন তূণটা ঢেকে রাখে। তখন তার চোখে মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে, তাতে কুহকিনীর ইন্দ্রজালের আভাসমাত্র দেখতে পান নি তিনি একদিনও। বরং পথহারার অনিশ্চিত ব্যাকুলতাই লক্ষ্য করেছেন মাঝে মাঝে।

পুষ্পিত শিমুলগাছটার দিকে চেয়ে রইলেন তিনি। অসংখ্য লাল ফুল, বিচিত্রবর্ণ অসংখ্য পাখি, অসংখ্য রকম কাকলী।...ডানাও আছে ওর মধ্যে, তিনি নিজেও। অনন্তমুখী অনন্ত লীলার স্রোতে ভেসে চলেছেন স্বয়ং ভগবান, দেহ এবং দেহাতীত একসঙ্গে।

এই চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন।

২

রূপচাঁদ যখন ডানার কাছে এলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সূর্যাস্তের রক্তিমাভা যদিও লেগে রয়েছে পশ্চিম দিগন্তে, কিন্তু অন্ধকার আসন্ন। রূপচাঁদ আপিস-ফেরত প্রায়ই আসেন আজকাল ডানার কাছে। অজুহাতের অভাব হয় না। শুধু তাই নয়, অজুহাতটা যে দরকার তাও মনে হয় না সব সময়ে। নানা প্রয়োজনে প্রত্যহ আসেন। কোনদিন না এলেই বরং ডানা বিস্মিত হয়।

সেদিন এসেই রূপচাঁদ যে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন তাও নূতন নয়, কয়েক দিন থেকেই কথাটা বলছেন তিনি। ডানা মনঃস্থির ক'রে উঠতে পারে নি এখনও। রূপচাঁদ এসে গলাব পাকানো চাদরটি খুলে রোজ যেমন রাখেন আজও তেমনই রাখতে যাচ্ছিলেন কপাটের উপর।

ডানা বললে, "আলনা থাকতে ওখানে রাখা কেন? দিন"

রূপচাঁদ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে এবং ঘাড়টা একটু নামিয়ে এমন ভাবে চেয়ে রইলেন তার দিকে, যার অর্থ আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—তুমি নেবে? এই ঘামেভেজা চাদরটা তোমার হাতে দেওয়া ঠিক হবে কি? কিন্তু এর গভীরতর যে অর্থ রূপচাঁদের মনের অন্তরালে ছিল, তা ডানা টের পাচ্ছিল না। সেটা হচ্ছে—তাই নাকি? আমার চাদরের সম্বন্ধে মমত্ব-বোধ জেগেছে নাকি তোমার? এইটেই তো প্রত্যাশা করছি।

বিনা বাক্যব্যয়ে চাদরটা তার হাতে তুলে দিলেন। তারপর চেয়ারে ব'সে পকেট থেকে সিগারেট-কেস বার ক'রে একটা সিগারেট নিয়ে সন্তর্পণে ঠুকতে লাগলেন সেটা সিগারেট-কেসের উপরে।

ডানাই আবার প্রশ্ন করলে, "দেশলাই আছে তো?"

"আছে"

পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগারেট ধরালেন, তারপর

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "কি ঠিক করলে শেষ পর্যন্ত ? আমি আজ ইন্‌স্‌পেক্‌ট্রেস্‌ অব্‌ স্কুল্‌সের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, তিনি বললেন—হয়ে যাবে। তুমি দরখাস্তটা ক'রে দাও"

স্থানীয় বালিকা-বিদ্যালয়ের হেড-মিস্ট্রেসের পদটি খালি হয়েছে। রূপচাঁদের ইচ্ছা, ডানা সেটির জন্য দরখাস্ত করুক। ডানার কিন্তু ইচ্ছা নয় তেমন। অথচ আর্থিক পরিস্থিতি এমন হয়ে উঠছে ক্রমশ যে, অর্থাগমের কোনও একটা ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে। সেটা যে কি ক'রে সম্ভব হবে তা তার জানা নেই—রূপচাঁদবাবুর এই প্রস্তাবে তার অবিলম্বে রাজী হয়ে যাওয়া উচিত; কিন্তু কিছুতেই সে মনঃস্থির ক'রে উঠতে পারছিল না। সে বিদ্যা অর্জন করেছিল মানসিক সংস্কৃতির জন্যে, চাকরি করবার জন্যে নয়। তাকে যে কোনও দিন চাকরি করতে হবে—এ সম্ভাবনা পর্যন্ত কল্পনা করে নি কখনও সে।

রূপচাঁদ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন, "মুদীর দোকান থেকে চাল ডাল তেল ঘি দিয়ে গেছে সব ?"

"হ্যাঁ, গেছে"

"আনন্দ তোমাকে যে চাকরটা এনে দিয়েছে, সেটা কাজ করছে তো ভাল ক'রে ? না হ'লে বল, আমার হাতে একটা ভাল চাকর এসেছে, রাঁধতেও পারে"

"না, এ বেশ কাজ করছে"

"মাইনে কত ঠিক হয়েছে ?"

"আমি কিছু ঠিক করি নি। আনন্দবাবু কিছু বলেন নি আমাকে"

"আগে থাকতে ঠিক ক'রে নেওয়া ভাল। পরে গোলমাল না হয়। আনন্দ কি এসেছিল এর মধ্যে ?"

"কাল এসেছিলেন"

"ও"

চুপ ক'রে গেলেন রূপচাঁদ। ডানাও চুপ ক'রে রইল। একটা অদৃশ্য রহস্য যেন ঘনীভূত হয়ে উঠল দুজনকে ঘিরে। সিগারেটে টান

দিয়ে রূপচাঁদ হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "দু-চার দিনের মধ্যে জন মজুর এসে পড়বে। কালই আসত, আজকাল যা পায়া-ভারী ব্যাটাদের। কন্‌স্টেব্‌ল্ পাঠিয়ে তবে ঠিক করতে হয়েছে। আসবে ঠিক"

"জনমজুর কেন ?"

"সামনেই বর্ষা। এই প্রকাণ্ড খোলার বাড়ি, না সারিয়ে দিলে থাকাই যাবে না"

"কিন্তু সারাতে গেলে অনেক খরচ প'ড়ে যাবে যে—"

"তা পড়বে বইকি। বাঁশ দড়ি খাপরা সবই অগ্নিমূল্য আজকাল। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। অমরেশের টাকার অভাব নেই"

রূপচাঁদের মুখ হাস্যোদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"তার বাড়ি সেই সারাবে। আমি শুধু ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি, মানে—ঝঞ্ঝাটটা পোয়াচ্ছি"

এই শেষ উক্তিটি ক'রে রূপচাঁদ ডানার দিকে এমন ভাবে চাইলেন, যার অর্থ—তোমার জন্যেই পোয়াচ্ছি।

ডানা লজ্জিত হয়ে পড়ল। শুধু লজ্জিত নয়, শঙ্কিতও হ'ল। তার মনে হতে লাগল, একটা বেড়াজাল ক্রমশ যেন এগিয়ে আসছে তার চারিদিক ঘিরে। একটি মাত্র ফাঁক আছে—স্কুলের চাকরি নেওয়া। পরের দাক্ষিণ্যের উপর কতদিন থাকবে সে এমন ক'রে ? দাক্ষিণ্যের কি প্রতিদান প্রত্যাশা করেছে এরা ?

"আচ্ছা, স্কুলের হেড-মিস্ট্রেসের কি কোয়ার্টার্স আছে ?"

"না। যতদিন কোয়ার্টার্স না হচ্ছে, ততদিন তারা মাসে পঁচিশ টাকা ক'রে ভাড়া দেবে। এই বাড়িটাই নিতে পার তুমি, সেইটে নেওয়াই সুবিধে, কারণ অমরেশকে যে ভাড়া আমি বলব তাতেই রাজী হয়ে যাবে সে। পঁচিশ টাকা দিয়ে শহরের মধ্যে এত বড় বাড়ি তুমি পাবে না। খালি বাড়িই নেই। তোমার জন্যে খুঁজতে কসুর করি নি তো"

এই কথায় ডানা আবার মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। সহসা

আর একটা কথাও মনে পড়ল তার। রূপচাঁদবাবু কেমন সহজে 'আপনি' থেকে 'তুমি' বলতে আরম্ভ করেছেন। যদিও এতে অন্যায় বা অস্বাভাবিক কিছু নেই, আমাদের দেশে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বয়ঃ-কনিষ্ঠকে তুমিই ব'লে থাকে সাধারণত; তবু কিন্তু প্রথম যেদিন শুনেছিল, সেদিন কেমন একটু খটকা লেগেছিল। অমরেশবাবু, আনন্দবাবু—এঁরাও তো আসেন, কিন্তু এঁরা কখনও 'তুমি' বলেন না তো!। অবান্তরভাবে হঠাৎ সে ঠিক করলে, ওঁদেরও আর সে 'আপনি' বলতে দেবে না। ওঁদেরও অনুরোধ করবে 'তুমি' বলবার জন্যে। রূপচাঁদবাবু একাই ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তার দাবি করবেন কেন? কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, রূপচাঁদবাবু দাবি করতে পারেন বইকি। একা এই বিদেশে রূপচাঁদবাবু না থাকলে কি করত সে? রূপচাঁদবাবুই তো তাকে আশ্রয় খুঁজে দিয়েছেন এবং এখনও প্রতিদিন কিসে তার সুবিধা হয় তারই চেষ্টা করছেন। অথচ এখনও পর্যন্ত তাঁর ব্যবহারে এমন কিছুই সে লক্ষ্য করে নি, যা সন্দেহজনক।···সে অন্য দিকে চেয়ে ভাবছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, রূপচাঁদবাবু নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে আছেন এবং সে চাহনি থেকে যা ক্ষরিত হচ্ছে তা আতঙ্কজনক নয়, অথচ ঠিক আশ্বাসজনকও নয়।

খানিকক্ষণ নির্নিমেষে ডানার দিকে চেয়ে থেকে রূপচাঁদ বললেন, "তুমি দরখাস্তটা ক'রে দাও আজই। কারণ পরশু দরখাস্ত দেবার শেষ দিন"

"ভাবছি—"

রূপচাঁদ ভাবনাটা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইলেন মনে মনে। কিন্তু ওই একটি কথা ব'লেই ডানা থেমে গেল। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করলে, তার মনের নিগূঢ় কথাটা কি তা সে নিজেই জানেনা ভাল ক'রে।

"কি ভাবছ?"

"ভাবছি, এই অচেনা জায়গায় নিজেকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলাটা কি ঠিক হবে?"

"অচেনা জায়গা চেনা হতে কদিন লাগে ?"

"আমার বেশ একটু দেরি লাগে"

"রেঙ্গুন ছাড়া আর কোনও চেনা জায়গা আছে কি তোমার ?"

"না, তাও নেই"

"তবে ?"

এই ধরনের 'তবে'র উত্তর দেওয়া শক্ত, সহসা কিছু বলা যায় না। ডানা চুপ ক'রে রইল। তারপব হঠাৎ সমস্ত চোখ মুখ জ্বালা ক'রে মুখটা লাল হয়ে উঠল তার, দুঃসহ একটা বেদনা যেন মূর্ত হয়ে উঠল। হঠাৎ সে ব'লে ফেললে, "তবে এটা ঠিক যে, এখান থেকে যাবার আগে সকলকার প্রাপ্য আমি চুকিয়ে দিয়ে তবে যাব। আমার দু-একখানা গয়না আছে এখনও—"

একটা স্নিগ্ধ হাস্যে রূপচাঁদের মুখভাবের তীক্ষ্ণতাটা কোমল হয়ে এল। বিদেশিনী বিদুষী এই তরুণীর মধ্যে চিরন্তনী নারীকে দেখে একটু আশ্বস্ত হলেন তিনি যেন। ধরবার ছোবার মত কিছু যেন পেলেন একটা। এতদিন অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিলেন। কেতাদুরস্ত মৌখিক ভদ্র আলাপের মুখোশ বিভ্রান্ত ব্যাহত করছিল তাঁকে এতদিন। আজ তার কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর ধ্বনিত হওয়াতে আনন্দিত হলেন তিনি।

হেসে বললেন, "দেখ, সস্তা কবিত্ব করবার ভারি সুন্দর একটা সুযোগ দিয়েছ তুমি। এখনই তুমি যা বললে, তার উত্তরে অনায়াসেই বলতে পারতাম, গয়না-বিক্রি-করা টাকা দিয়ে সব রকম প্রাপ্য শোধ করা যায় না, এবং সেটা মিথ্যা কথাও হ'ত না। কিন্তু আমি ওসব বলব না। আমি বরং বলব—হ্যাঁ, নিশ্চয়, সকলের ন্যায্য প্রাপ্য শোধ করতে হবে বইকি। তা না করলে আত্মসম্মান বজায় থাকে না। আর তোমার মত মেয়ের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে—এর চেয়ে শোচনীয় ছবি আমি কল্পনাও করতে পারি না। গয়না বিক্রি না ক'রেও যাতে সেটা হয়, সেই চেষ্টাই করছি আমি তাই গোড়া থেকে। আর একটা

কথাও তোমার মত মেয়ের বোঝা উচিত যে, গয়না বিক্রি ক'রে ধার শোধ করাটাও এক হিসাবে আত্মসম্মানহানিকর। উপহারের মর্যাদাকে প্রয়োজনের তাগিদে বিসর্জন দেওয়াটা কি ভাল?"

একটানা এতগুলো কথা ডানাকে তিনি বলেন নি ইতিপূর্বে। তাঁর নিজের কানেই কথাগুলোর অতি-নাটকীয়তার ঢঙটা বিশ্রী ঠেকল। মনে হ'ল, রাশটা বোধ হয় বেশি আলগা ক'রে ফেলেছেন। অপ্রতিভ হলেন নিজের অক্ষমতায় এবং পরমুহূর্তেই এমন ভাবে সংযত করলেন নিজেকে যে, মুখের চেহারা বদলে গেল। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সিগারেটে টান দিলেন আর একটা, এবং নাক মুখ দিয়ে যে ধূম উদ্‌গিরণ করলেন তা দেখে ডানার হঠাৎ মনে হ'ল, এ সিগারেটের ধোঁয়া নয়—আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া। কিছুক্ষণ নীরবতার পর ডানা বললে, "আত্মসম্মানের চুল-চেরা বিচারই যদি করতে হয়, তা হ'লে আর একটা কথাও ভাবা উচিত"

ডানার মুখের দিকে ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে রইলেন রূপচাঁদ। তারপর বললেন, "কি সেটা?"

"ঠকানোটা কি আত্মসম্মানজনক?"

"তার মানে?"

"যা আমি জানি না, তা করবার ভান ক'রে বেতন নেওয়াটা কি ঠকানো নয়? ইতিপূর্বে কখনও আমি মাস্টারি করি নি। আমার বিশ্বাস, ও-বিষয়ে আমার তেমন কোনও যোগ্যতাও নেই; একটা ডিগ্রী থাকলেই যোগ্যতা হয় না—"

"সত্যি সত্যি তোমার যাতে যোগ্যতা আছে ব'লে আমি মনে করি, তদনুসারে চলতেও তোমার বিবেকে বাধবে"—ব'লেই রূপচাঁদ থেমে গেলেন এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আবার বললেন, "সেটা কি, তা বলতেও আমার বাধবে। আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এমনই বিচিত্র এবং আমাদের প্রয়োজনের তাগিদ এতই প্রবল যে, যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবার সুযোগ আমরা প্রায়ই

পাই না। জীবনে সকলকেই আপোস ক'রে চলতে হয় সব দিক বাঁচিয়ে। আমি এক কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্র ছিলাম, কেমিস্ট্রিতে আমার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং অদ্ভুত যোগ্যতা ছিল, কিন্তু সারা জীবন আমাকে কাটাতে হচ্ছে পুলিস-সায়েবের কেরানীগিরি ক'রে। কেরানী হবার যোগ্যতা আমার ছিল না—"...হঠাৎ আবার থেমে গেলেন রূপচাঁদ। মনে হ'ল, সস্তা হৃদয়াবেগের আবর্তে খেই হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। তা ছাড়া আর একটা অদ্ভুত অনুভূতি আচম্বিতে এসে অবাক ক'রে দিলে তাঁকে। মনে হ'ল, এ বিষয়ে আর বেশি কিছু বলতে গেলে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়বে তাঁর। নিগূঢ় বেদনার উৎসমুখে যে কঠিন পাথরটা চাপা দেওয়া ছিল, সেটা ন'ড়ে উঠল সহসা যেন। নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতার শ্মশান-ভূমি থেকে একটা হিমশীতল হাওয়া হাহাকার ক'রে চ'লে গেল যেন তাঁর অন্তরতম সত্তার ভিতর দিয়ে। মনের এই অদ্ভুত আচরণে বিস্মিত হলেন তিনি। রাগও হ'ল। এমনভাবে বিচলিত হওয়ার মানে কি? সিগারেটটার দিকে এক নজর চেয়ে টান দিলেন তাতে দু-একটা, তারপর ফেলে দিলেন সেটা।

ডানা হেসে জবাব দিলে, "আপনি যা বললেন, তা ঠিকই। কিন্তু অযোগ্য কেরানী দেশের তত অনিষ্ট করে না, যত করে অযোগ্য মাস্টার বা অযোগ্য ডাক্তার। এদের হাতে দেশের প্রাণশক্তির ভার আছে। অত বড় ভার নেবার সাহস আমার নেই"

"কি করবে তা হ'লে ঠিক করেছ?"

"আমি ভাবছি, চ'লে যাব এখান থেকে। কলকাতা কিংবা বম্বে—"

রূপচাঁদের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল।

"তাতে লাভটা কি হবে?"

"সেখানে নিজের যোগ্যতা অনুসারে কাজ জুটিয়ে নিতে পারব একটা। ধরুন, টেলিফোনে কাজ পেয়ে যেতে পারি, কেরানীগিরিও পেতে পারি কোথাও, শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং জানা আছে আমার।

তা ছাড়া গানবাজনা শিখেছিলাম ভাল ক'রে—তাও শেখাতে পারি। বড় বড় শহরে অনেক রকম কাজ পাওয়া যায়। এসব জায়গায় মাস্টারি ছাড়া অন্য গতি নেই"

"তা ঠিক"

যুক্তিযুক্ত কথার প্রতিবাদ করা রূপচাঁদের স্বভাব নয়। কিন্তু তাঁর সমস্ত মুখে আশঙ্কার ছায়ার সঙ্গে তিক্ত বিদ্রূপের এমন একটা সম্মিলিত রূপ প্রতিভাত হয়ে উঠল, যা প্রতিবাদের চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন, "তুমি যদি আমার নিজের লোক হতে, তা হ'লে তোমাকে এর আর একটা দিক দেখাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে অধিকার আমার নেই"

শশব্যস্ত হয়ে ডানা ব'লে উঠল, "না না, ও কথা বলছেন কেন? পৃথিবীতে আপনারাই এখন আমার একমাত্র আত্মীয়। আপনাদের সাহায্য না পেলে আমার যে কি হ'ত, তা জানি না। আপনাদের মতের বিরুদ্ধে আমি কিছু করব না। আমি ভাবছিলাম, কলকাতায় গেলে অন্যভাবে উপার্জনের পথ একটা পেতাম হয়তো। মাস্টারি আমি করতে পারব না"

ঘাড়টা একটু নীচু ক'রে নির্নিমেষে তার দিকে চেয়ে ছিলেন রূপচাঁদ অর্ধনিমীলিত নেত্রে। মনে হচ্ছিল, ডানার কথাগুলো উপভোগ করবেন কি না প্রণিধান করছেন। শুনে নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "সত্যিই যদি তুমি আমাকে নিজের আত্মীয় ব'লে মনে কর, তা হ'লে বলছি, শোন—তোমার মতের বিরুদ্ধে কিছু করতে হবে না তোমাকে। তুমি যেমন আছ, তেমনই থাক"

"এমন ভাবে থাকা যায় নাকি?"

"কেমন ভাবে থাকতে চাও বল, তারই ব্যবস্থা করছি"

"ব্যবস্থা তো করেছেন, কিন্তু আমার অস্বস্তি লাগছে"

হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে মুখে একটা তিক্ত হাসি ফুটিয়ে ব'লে উঠলেন রূপচাঁদ, "তোমার এ অস্বস্তি কেন জান?"

"কেন বলুন ?"

"তুমি সত্যি আমাকে আত্মীয় ব'লে ভাবতে পারছ না। পারলে তোমার এ অস্বস্তি হ'ত না। তুমি মুখে আমাকে আত্মীয় বলছ, অথচ তোমার ব্যবহারে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে না। আমি তোমার জন্যে সামান্য যা করছি, তার বদলে তুমি কি করবে তার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ মনে মনে, অথচ ভেবে পাচ্ছ না কি ক'রে সেটা করবে"

অত্যন্ত সপ্রতিভ হাসি হেসে ডানা জবাব দিলে, "ঠিকই ধরেছেন আপনি। আপনাদের আত্মীয় ব'লে ভাবতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ব্যবহারে সেটাকে ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না। কেমন যেন বাধো-বাধো লাগছে"

"কেন ?"

আবার একটু হেসে ডানা জবাব দিলে, "কি জানি !"

রূপচাঁদও হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে। তারপর বললেন, "জটিল মনস্তত্ত্বের অরণ্যে প্রবেশ করলে দিশাহারা হয়ে পড়বে। ঋণ-পরিশোধ যদি করতে চাও ক'রো। কিন্তু তার জন্যে এখনই ব্যস্ত হবার দরকার নেই। প্রতীক্ষা করবার মত ধৈর্য আমার আছে··"

ধৈর্যভরে কেউ ঋণ-শোধের জন্য প্রতীক্ষা করছে—এ চিত্রটা আরও অস্বস্তিকর ব'লে মনে হ'ল ডানার। কিন্তু সে চুপ ক'রে রইল।

"দরখাস্ত তা হ'লে করবে না, এই ঠিক হ'ল তো ?"

"হ্যাঁ। ওসব থাক্ এখন"

"আচ্ছা, তা হ'লে চাদরটা দাও, এবার উঠি"

"এখনই যাবেন ? চা করতে বলেছি"

"তা হ'লে চা-টা খেয়েই যাই"

চা খাওয়ার প্রস্তাবটার মধ্যে একটা নূতন আলোক যেন দেখতে পেলেন রূপচাঁদ। রোজই তিনি চা খেয়ে যান, কিন্তু আজ যেন এটাকে একটু অভিনব ব'লে মনে হ'ল। একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। তারপর সহসা সোৎসাহে বললেন, "দেখ, একটা কথা তুমি জেনে রাখ, আমি

যখন তোমার ভার নিয়েছি, তোমার ভয় নেই। তুমি যদি চাকরি করতে, তা হ'লে আমার পক্ষে সেটা সহজ হ'ত। টাকাকড়ির দিক থেকে নয়, লোকচক্ষুর দিক থেকে। একজন অপরিচিতা বিদেশিনীর এখানে থাকার একটা সঙ্গত অর্থ করতে পারত তারা, অবশ্য তাতেও যে তাদের মুখ বন্ধ হ'ত তা নয়, তবে আমার দিক থেকে দেবার মত একটা জবাবদিহি থাকত"

অপ্রত্যাশিতভাবে ডানা ব'লে উঠল, "কে কি বলবে তা নিয়ে আমার ভাবনা নেই। আমার ভাবনা—"

ব'লেই থেমে গেল সে মুচকি হেসে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন রূপচাঁদ। তবু চুপ ক'রেই রইল ডানা। কিন্তু রূপচাঁদ ছাড়বার পাত্র নন।

"তোমার ভাবনাটা কি শুনিই না, যদি বলতে তোমার আপত্তি না থাকে"

"আমার ভাবনা নিজেকে নিয়ে। নিজের কাছে যদি আমার আচরণ নিখুঁত হয়, তা হ'লে অপরের মতামতের তোয়াক্কা তত করি না। আমার নিজের আচরণ নিখুঁত হচ্ছে কি না বুঝতে পারছি না"

"ও"

আর কিছু বলবার পূর্বেই চা নিয়ে চাকরটা প্রবেশ করল এবং টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম রেখে চা ছাঁকতে লাগল। রূপচাঁদ নীরবে নিবিষ্টচিত্তে চাকরটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন। তার চেহারা, চলন, মুখভাব, পরিচ্ছদ, চা-ছাঁকবার ভঙ্গী—প্রত্যেকটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন তিনি। এইটে তাঁর একটা স্বভাব। কোনও প্রশ্ন না ক'রে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারা তিনি লোকচরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করেন, এবং যখন সেটা করেন তখন কেউ বুঝতে পারে না যে, তিনি এত বড় একটা কঠিন কাজে লিপ্ত আছেন।

চা-পর্ব নীরবেই সমাধা হ'ল।

চা শেষ হতেই উঠে পড়লেন রূপচাঁদ।

"চাদরটা দাও, এবার যাই—"

ডানা চাদর আনতে পাশের ঘরে গেল। রূপচাঁদ পকেট থেকে একটা খাম বার করলেন এবং ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন সেটার দিকে।

ডানা ফিরে আসতেই বললেন, "একটা কথা তোমাকে না জিজ্ঞেস ক'রে পারছি না। খোলাখুলি সেটা জিজ্ঞেস করাই ভাল বোধ হয়"

"কি কথা ?"

"আমি যে এখানে আসি যাই, তোমাকে সাহায্য করবার চেষ্টা করি, এতে আর যে যা বলে আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু তোমার মনে কোন রকম সন্দেহ হয় না তো আমার সম্বন্ধে ?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে চেয়ে রইলেন ডানার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ঠিক সত্যি কথাটা সোজা ক'রে বলতে পারলে না ডানা।

একটু হেসে বললে, "সে রকম কোনও কারণ ঘটে নি তো এখনও"

ক্ষণকাল নীরব থেকে কথাটা প্রণিধান করলেন রূপচাঁদ। তারপর বললেন, "যতক্ষণ তা না ঘটছে, ততক্ষণ আমাকে হিতৈষী আত্মীয় ব'লে মেনে নিতে আপত্তি নেই তা হ'লে ?"

"এত ভূমিকা কিসের বলুন তো—"

"তা হ'লে এইটে অসঙ্কোচে দিতে পারতাম তোমাকে"

খামটা দেখালেন।

"কি ওটা ?"

"আমি চ'লে যাবার পর খুলে দেখো"

খামটার দিকে চেয়ে মনে মনে একটু ইতস্তত করতে লাগল ডানা। তারপর মনঃস্থির ক'রে ফেললে।

"আচ্ছা, দিন"

খামটা দিয়েই বেরিয়ে গেলেন রূপচাঁদ।

ডানা খুলে দেখলে, একশো টাকার নোট রয়েছে একখানা, আর তার সঙ্গে ছোট একখানা চিঠি। ইংরেজীতে টাইপ করা।

চিঠির মর্ম ঃ—অতিশয় সসঙ্কোচে টাকাটা তোমায় দিচ্ছি। বন্ধুর সাহায্য হিসেবে নিতে যদি তোমার বিবেকে বাধে, ঋণ-স্বরূপই নিও। যখন সুবিধে হবে, শোধ দিও। বলা বাহুল্য, আমার দিক থেকে কখনও কোনও তাগাদা থাকবে না।—নীচে কোনও নাম নেই।

ডানা নোটখানা হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ নীরবে। রূপচাঁদবাবুর উপর রাগ হ'ল না। সঙ্কোচও হ'ল না তেমন কিছু। তবে তার অজ্ঞাতসারেই তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল একটু। যে নিষ্ঠুর নিয়তি তার জীবনকে সুখের শিখর থেকে চ্যুত করেছে, তারই করাল ছায়া মুখের উপর পড়ল যেন ক্ষণকালের জন্য। মনে পড়ল একটা চিত্র। তারা যখন বর্মা থেকে পালায়, তখন পথে এক হিতৈষী প্রতিষ্ঠান তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। হাজার হাজার লোক পালিয়ে আসছিল, পালিয়ে আসছিল যথাসর্বস্ব ফেলে। তফাত ছিল না ধনী আর ভিক্ষুকে। ভীত পীড়িত ভগ্নহৃদয় বুভুক্ষু জনতার সেই মিছিলটা ভেসে উঠল তার চোখের উপর আবার। হিতৈষী প্রতিষ্ঠানটি সকলের খাওয়ার আয়োজন করেছিল একটি নদীর তীরে। জলের সুবিধার জন্যই সম্ভবত। আয়োজন বিশেষ কিছু নয়। মোটা ডাল-চালের খিচুড়ি আর শাক-সবজির একটা ঘণ্ট সারি সারি পাতা পেতে দিচ্ছিল সবাইকে। জাতিধর্মনির্বিশেষে দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা তাই খাচ্ছিল সাগ্রহে বার বার চেয়ে চেয়ে। পথে উপর্যুপরি তিন দিন কোনও খাবার পাওয়া যায় নি। হঠাৎ দেখা গেল, একটি লোক খাচ্ছে না। খিচুড়ির দিকে চেয়ে পাতার সামনে ব'সে আছে চুপ ক'রে। লোভ মূর্ত হয়ে উঠেছে তার চোখের দৃষ্টিতে, কিন্তু খাচ্ছে না। হাত গুটিয়ে ব'সে আছে চুপ ক'রে। মুখময় খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি। গায়ে সিল্কের ময়লা পাঞ্জাবি, হাতে বেমানান-রকম উজ্জ্বল হীরের আংটি একটা। কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে লোকটিকে প্রশ্ন করলেন, "আপনি খাচ্ছেন না কেন?" লোকটি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ সবিস্ময়ে। তারপর

নিজের পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধে সচেতন হতেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল একটু, বললে, "হ্যাঁ, খাব। তবে আমার একটা অনুরোধ যদি রাখেন।", কর্মকর্তা বললেন, "কি বলুন?" একটু ইতস্তত ক'রে লোকটি বললে, "আমার পাতাটা যদি সরিয়ে একটা আলাদা জায়গায় দেন!" কর্মকর্তা লোক ভাল ছিলেন, আলাদা জায়গাতেই খেতে দিলেন তাকে। ডানা পাশেই ছিল, সবিস্ময়ে শুনছিল সব। লোকটি পংক্তি থেকে আলাদা জায়গায় ব'সে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর বোকার মত হাসতে হাসতে কর্মকর্তার দিকে চেয়ে বললে, "আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এই কয়েকদিন আগেই আমি কোটিপতি ছিলাম। আমার বাড়িতেই প্রত্যহ আড়াই শো কাঙালী ভোজন করাতাম। এখন আমি সর্বস্বান্ত, তবু ওদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ব'সে খেতে পারছি না।"—আবার ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর গপগপ ক'রে খেতে লাগল। ডানার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক সমস্ত ছেড়ে এসেছেন বর্মায়, একটি জিনিস কিন্তু ছেড়ে আসতে পারেন নি। অহঙ্কার। অনেক দিন পরে আজ আবার মনে পড়ল ছবিটা। মনে হ'ল, রূপচাঁদবাবুর টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে অশোভন আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করবে না সে।

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ল। সকালবেলা আনন্দবাবু এসেছিলেন। নদীর ওপারের আকাশটা মনোহর হয়ে উঠেছিল তখন। সাদা মেঘের বিরাট একটা জাল টাঙিয়ে দিয়েছিল কে যেন নীল আকাশপটে। আনন্দবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর কথাগুলো এখনও ডানার কানে বাজছে।

"আপনি আর আমি কিন্তু ঠিক এক রকম দেখছি না। পৃথিবীতে কোনও দুটি লোক ঠিক এক রকম দেখে না, যদিও একই জিনিস দেখে"

তারপর অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তিনি চেয়েছিলেন আকাশের দিকে। মনে হ'ল, দৃষ্টি তাঁর হারিয়ে গেল যেন ওই নীল অসীমের মাঝখানে।

হঠাৎ বললেন, "কাগজ আছে?"

"চিঠি লেখার প্যাড আছে একখানা"
"দেবেন ? একটা কবিতা লিখতাম তা হ'লে"
তার প্যাডে একটা কবিতা লিখে রেখে গেছেন তিনি।
ডানা টেবিলের কাছে স'রে গিয়ে কবিতাটা পড়ল আবার।

আকাশ কেবল বাহিরেই নাই, সখি,
মনেরও ভিতরে আকাশ রেখেছ ঢাকি
সে আকাশ ভরি' যে তারার ঝকমকি
গভীর নিশীথে দেখেছ কখনও তা কি ?

তোমার আকাশে জাগিছে তোমারই ভাষা
হয়তো নয় তা সাবেক তপন তারা
আমার আকাশে কাঁপিছে আমার আশা
আপনার সুরে আপনি আত্মহারা
তোমার আকাশে যে রাগিণী শোন তুমি
আমার হয়তো শুনিতে আছে তা বাকি।

তোমার আকাশে যে ইন্দ্রধনু ছটা
তাহার মহিমা একাই দেখেছ তুমি
আমার আকাশে বরষার ঘনঘটা
আকুল করিয়া তোলে মোর মনোভূমি
তব অভিসার ছায়া পথে পথে যবে
ধ্রুবতারা পানে চেয়ে থাকে মোর আঁখি।

বাহির-আকাশে জাগে অনন্ত নীল
মনের আকাশে বহু বর্ণের খেলা
এ দুয়ের মাঝে আছে কি না কোনও মিল
তারই সন্ধানে বসেছে কবির মেলা
যুগ-যুগান্ত জাগিছে তন্দ্রাহীন
ছন্দে ছন্দে তাহারই হিসাব রাখি।

দুই অম্বরে বাজে গম্ভীর বাণী
জানি না কি সুরে কে যে সঙ্গীত গাহে
কান পেতে আছে কবি গুণী সন্ধানী
শিল্পী তাহারে চিত্রে আঁকিতে চাহে
বৃথা সন্ধানে হয়তো জীবন কাটে
ভুল রঙ দিয়ে সত্যের ছবি আঁকি'।

ডানার সহসা মনে হ'ল, আনন্দবাবুর কবিতা আর রূপচাঁদবাবুর একশো টাকার নোট একই জিনিষের দুই রূপ, রসায়নশাস্ত্রে যাকে বলে অ্যালোট্রপিক মডিফিকেশন। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। মনের অন্ধকারে মনে হ'ল, প্রেতের মতন কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

৩

অতিশয় উত্তেজিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন বৈজ্ঞানিক তাঁর নিজের বাড়ির পিছন দিকে। দোয়েলটা খুব ডাকছে নিমগাছের উঁচু ডালটায় ব'সে। এটা তাঁরই দোয়েল, অর্থাৎ গত বছর যে পাঁচটা দোয়েলের পায়ে তিনি রিং পরিয়ে দিয়েছিলেন, এটা তারই একটা, বাকি চারটেকে এখনও দেখতে পান নি তিনি। এটাকেও এতদিন খুঁজে পান নি। হঠাৎ আজ নজরে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক তাঁর নোট-বুক বার ক'রে তাড়াতাড়ি তারিখটা লিখে নিলেন, দোয়েলটাকে কোথায় প্রথম দেখা গেল, তাও লিখলেন। হঠাৎ আবার সেই সন্দেহটা মনে জাগল। সমস্ত শীতকাল এদের এত কম দেখা যায় যে, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, এরা বোধ হয় এদেশে থাকেই না। শীত একটু কমলে তবে আসে। সিন্ধু, করাচী প্রভৃতি স্থান থেকে এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে দোয়েলরা যে চ'লে আসে—এ কথা লাহা

মশায় লিখেছেন। হয়তো শীতের সময় ওরা ওই অঞ্চলেই চ'লে যায়, কে জানে! শীতকালে ও-দেশের টেম্পারেচার কত থাকে একটু খোঁজ করতে হবে।···দোয়েলটা উড়ে গিয়ে বসল টেলিগ্রাফের তারের উপর। গানের ধরনটাও গেল বদলে। ধমকের সুর ফুটে উঠল। বৈজ্ঞানিক আশেপাশে চেয়ে দেখলেন, কারণটা কি, নিশ্চয় আর কেউ এসেছে। দেখতে পেলেন না কিছু। পাখিটা লেজ খাড়া ক'রে তেড়ে যেতেই চোখে পড়ল আর একটা দোয়েল। এইটেই প্রত্যাশা করছিলেন। দ্বিতীয় দোয়েলটা তাড়া খেয়ে অপরাধীর মত পালিয়ে গেল কিছুটা দূর, কিন্তু কিছু দূর গিয়েই রুখে দাঁড়াল। তাৎপর্যটা বুঝতে বৈজ্ঞানিকের দেরি হ'ল না। এ কথা বইয়ে পড়েছেন এর আগে। প্রত্যেক পাখিরই নিজের নিজের এলাকা থাকে। নিজের এলাকায় কেউ কাউকে ঢুকতে দেয় না। দুটো এলাকার মাঝখানে থাকে খানিকটা 'এজমালি' এলাকা, সেখানে সব এলাকার পাখিই যেতে পারে। দ্বিতীয় দোয়েলটি প্রথম দোয়েলের এলাকায় ঢুকে যে বে-আইনী কাজ করেছে তা বেশ জানে, তাই অপরাধীর মত স'রে পড়ল তাড়া খেয়েই। কিন্তু এজমালি এলাকায় গিয়ে, যেখানে তারও অধিকার আছে, সে আর বকুনি সহ্য করতে রাজী নয়। পালক ফুলিয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছে। প্রথম পাখিটা তেড়ে গেল তার দিকে, দ্বিতীয়টা তুড়ুক ক'রে স'রে বসল আর একটা ছোট ডালে আর তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল। অমরবাবুর মনে হ'ল, এটা গান তো নয়ই, হাহাকারও নয়, অনেকটা হুমকি-গোছের। ঘাড়ের রোঁয়াগুলো ফুলে উঠেছে, লেজটা উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে বারংবার, মনে হচ্ছে—যুদ্ধং দেহি, যুদ্ধং দেহি বলছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু পিছু হটার ভাবও আছে। শেষ পর্যন্ত পালাতেই হ'ল বেচারীকে। প্রথম পাখিটা এমন ছোঁ মেরে তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল যে, টিকে থাকা অসম্ভব হ'ল তার পক্ষে। চোঁ-চা দৌড় দিলে বকুলগাছের পাশ দিয়ে। প্রথম পাখিটা আর পশ্চাদ্ধাবন করলে না,

ফিরে এসে বসল নিমগাছের সেই উঁচু ডালটাতে। এটা তার নিজের নিমগাছ, এর ত্রিসীমানায় দ্বিতীয় কোনও দোয়েলকে আসতে দেবে না সে আর। বৈজ্ঞানিক নিজের নোট-বুকে এই দোয়েলটির এলাকার ম্যাপ এঁকে নিলেন একটি। বকুলগাছ আর আমগাছের মাঝামাঝি জায়গাটা বোধ হয় এজমালি এলাকা। পূর্বদিকে নিমগাছ, পশ্চিমে মল্লিকের বাগানের দেওয়াল, উত্তরে মালিদের ওই ঘরটা আর দক্ষিণে আস্তাবল। প্রায় বিঘে দশেক জায়গা হবে। এইটুকুই মনে হচ্ছে এই দোয়েলটির স্বরাজ্য।···এক ঝাঁক টিয়া এসে বসল বকুলগাছটাতে, আমগাছের যে ডালটা সবচেয়ে উঁচু, তার উপর এসে বসল একটা পুরুষ টুনটুনি। কুচকুচে কালো রঙের উপর নীলের আভা বেরুচ্ছে। ডানার পাশে ছোট্ট একটু লাল জ্বলছে আগুনের মত। চি হুইট্, চি হুইট্, চি হুইট্···মুখ উঁচু ক'রে ডাকতে লাগল পাখিটা। সারি দিয়ে বাঁশপাতি পাখি উড়ছে একদল। চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল—দূর থেকে ভেসে আসছে পাপিয়ার অবিশ্রান্ত ডাক।

···ক্ষণিকের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তাঁর মনে হ'ল, তিনি যেন কোনও অবাস্তব স্বপ্নলোকে এসে হাজির হয়েছেন, যেখানে সুর আর রঙ ছাড়া প্রকাশের আর কোনও ভাষা নেই। সহসা যেন তিনি ভুলে গেলেন যে, দোয়েল পাখির জীবনের অনেক খুঁটিনাটি সংগ্রহ করতে হবে তাঁকে, অন্যমনস্ক হ'লে চলবে না। কিন্তু মনকে কি এমন ক'রে একমুখী ক'রে রাখা সম্ভব? একই মন সহস্র দিকে সহস্র ডানা মেলে উড়তে চাইছে যে অহরহ। দোয়েলের ডাকেই ঘোর ভাঙল বৈজ্ঞানিকের। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, নিমগাছের উঁচু ডালে ব'সে প্রাণ খুলে গান গাইছে। এক ঝাঁক গিটকিরি যেন অদৃশ্য পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে বাঁশীর তানে ভর ক'রে। একটু আগেই যে এই পাখিই মারমুখী হয়ে উঠেছিল, তা কে বলবে! একটু দূরে টুনটুনি ডাকছে, টিয়ার ঝাঁক বসেছে

পাশের বকুলগাছে, বাঁশপাতি পাখির ঝাঁক উড়ে বেড়াচ্ছে স্বচ্ছন্দে আশেপাশে, দোয়েলের তাতে আপত্তি নেই। দ্বিতীয় আর একটি দোয়েল এলে কিন্তু ও আর কিছুতে সহ্য করবে না তাকে। আত্মীয়-প্রীতি মোটে নেই। কারই বা আছে? হঠাৎ মনে হ'ল বৈজ্ঞানিকের। আত্মীয়দের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক হয় না, কারণ তাদের সঙ্গে স্বার্থের সম্পর্কটা এত উগ্ররকম মুখ্য যে, প্রীতির সৌকুমার্য নষ্ট হয়ে যায়। তোমার সুখ-সুবিধায় ভাগ বসাতে উৎসুক তারা সর্বদা। তোমার ঐশ্বর্যে যদি ভাগ বসাতে দাও তাদের, তবু তারা সুখী হবে না, হিংসায় জ্ব'লে মরবে। জটিল মনস্তত্ত্ব। এই জন্যেই পৃথিবীর বড় বড় কাব্যের বিষয় বোধ হয় আত্মীয়-বিরোধ। বড় বড় গণিতজ্ঞ যেমন শক্ত শক্ত অঙ্ক নিয়ে মাথা ঘামাতে ভালবাসেন, বড় বড় কবিরা তেমনই জটিল মনস্তত্ত্বের রহস্য নিয়ে আত্মহারা হতে চান—থিয়োরিটা খাড়া ক'রে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলেন একটু। আশ্চর্য! অনাত্মীয়ের সঙ্গেই প্রেম হয়। যার সঙ্গে কোনদিন চেনাশোনা ছিল না, সেই হয়ে ওঠে সবচেয়ে বেশি অন্তরঙ্গ। আগে সভ্যসমাজে লোকে বোনকেই বিয়ে করত, সে যখন আরও সভ্য হ'ল তখন এ প্রথা উঠে গেল। বৈজ্ঞানিকের মনে হ'ল, পরের মেয়েকে গৃহিণী করার প্রথা শুধু যে প্রজনন-বিজ্ঞানের উপযোগিতার জন্য প্রবর্তিত হয়েছিল, তা মনে করবার কোনও কারণ নেই। প্রজনন-বিজ্ঞান অনেক পরের ব্যাপার। রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের সঙ্গে প্রেম জমে না—এই সত্যটাই মানুষ বোধ হয় অনেক আগে আবিষ্কার করেছিল। আবার বৈজ্ঞানিক সচেতন হয়ে উঠলেন।···চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে। দোয়েলটার দিকে আবার মন দিতে চেষ্টা করলেন। ওই যে সঙ্গিনীটিও এসে নীচের ডালে বসেছেন। ভাবটা, যেন কিছুই জানেন না। ওকে কেন্দ্র ক'রেই যে এখনই অত বড় যুদ্ধ একটা হয়ে গেল, ওরই উদ্দেশে উপরের শাখায় যে অমন সঙ্গীতচর্চা চলছে, সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন যেন। ফুড়ুৎ ক'রে উড়ে গিয়ে আর একটা ডালে বসল। যদিও গায়ের রঙ

পুরুষ পাখিটার মতই, কিন্তু অত চকমকে কালো নয়, একটু পাঁশুটের আভাস আছে। কিন্তু ওই পাঁশুটে কালোর মধ্যেই বেশ সুন্দর শ্রী আছে একটি। পুরুষটার চেয়ে একটু বেশি মার্জিতও যেন। পুরুষ পাখিটা উড়ে গিয়ে আর এক জায়গায় বসল, আবার শুরু করল গান।

...পদশব্দ শুনে বৈজ্ঞানিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন, রত্নপ্রভা আসছেন। পিছনে একজন চাকর। তার মাথায় প্রকাণ্ড একটা আয়না।

রত্নপ্রভা বললেন, "কোথায় রাখব ?"

বৈজ্ঞানিক হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন ছেলেমানুষের মত।

"ওই নিমগাছটার তলায় রাখলে কেমন হয়! গাছপালা দিয়ে একটু ঘিরে দিতে হবে কিন্তু। আর আমরা কোন্‌খানটায় বসব বল দিকি ? কাছাকাছি আমাদেরও বসবার একটা জায়গা করতে হবে, ফোটো তুলব কিনা!"

"আমাদের ছোট তাঁবুটা এখানে টাঙিয়ে দিলেই তো হয়"

"বেশ তো, তা হ'লে চমৎকার হবে"

"ওই উঁচু জায়গাটায় দিই ?"

"তা হ'লে তো গ্র্যাণ্ড হবে। গাছপালা দিয়ে ঢেকে দিতে হবে কিন্তু। মানে তাঁবু-টাবু দেখে পাখিটা—"

"বুঝেছি। আগে তুমি খেয়ে নাও। চা ভিজিয়ে এসেছি"

"ও, চল"

বৈজ্ঞানিক ফিরেই দেখলেন, কবিও আসছেন।

"ও, আপনি এসে গেছেন! ভালই হয়েছে। আজ একটা এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করব ভাবছি"

"কি ?"

"দেখতেই পাবেন, আগে চা খেয়ে নেওয়া যাক্‌, চলুন।"

গাছপালা দিয়ে ঢাকা ছোট তাঁবুটির মধ্যে অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি

ক'রে কবি আর বৈজ্ঞানিক ব'সে ছিলেন। নিমগাছের তলায় প্রকাণ্ড আয়নাটাও গাছপালা দিয়ে এমনভাবে রত্নপ্রভা রেখে দিয়েছিলেন যে, সেটাও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

রুদ্ধশ্বাসে ব'সে ছিলেন বৈজ্ঞানিক দোয়েলের আগমন-অপেক্ষায়। কবি নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করছিলেন এক জোড়া শালিককে। সামনের চালাটার উপর ব'সে ঘাড় নেড়ে কত কথাই বলছে যে! ওর রূপ রঙ গলার স্বর কিছুই খারাপ নয়, কিন্তু প্রত্যহ দেখে দেখে এমন হয়ে গেছে যে, মনে আর কোনও চমক লাগায় না। কেমন যেন একটা অতিপরিচিত ঘরোয়া ভাব। শালিকদের মধ্যেও পুরুষ আছে নিশ্চয়, কিন্তু ওদের পুরুষ ব'লে মনেই হয় না। উৎক্রোশ বা শিকৃরে-জাতীয় পাখিদের তো কথাই নেই, পুরুষ-দোয়েল বা নীলকণ্ঠেরও একটা পৌরুষ আছে যেন। শালিক পাখি কিন্তু অন্য রকম, অতিপরিচিতা প্রতিবেশিনী যেন। বৈজ্ঞানিক প্রায় নির্নিমেষে আয়নাটার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন উপুড় হয়ে এবং কবির দিকে চেয়ে চুপিচুপি বললেন, "আপনিও এমনই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ুন। কতক্ষণ যে থাকতে হবে ঠিক নেই।"

বৈজ্ঞানিক আর কোনও কথা বললেন না। গিরগিটির মত মাথা তুলে নিমগাছের পাতার আড়ালে ছোট্ট কি একটা পাখি চিকচিক ক'রে বেড়াচ্ছিল, সেইটেকে দূরবীন দিয়ে দেখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কবি অতি দুরূহ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত না হয়ে শালিকটাকেই লক্ষ্য করতে লাগলেন একাগ্রচিত্তে। মাথা নেড়ে নেড়ে ঘাড়ের রোঁয়া ফুলিয়ে ফুলিয়ে কত কথাই বলছে! হঠাৎ মনে জেগে উঠল কবিতা—

শালিকের সাথে মালিকের মিল যদিও আছে
কর্তার মতো হাবভাব তার মোটে নয়

আলিসার 'পরে গোয়ালের ধারে কিংবা গাছে
এ যাবৎ তার মিলিয়াছে যত পরিচয়
সে যেন কেবল গিন্নী।
ঘাড় নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করে
খড়কুটো তুলে বাসা বানায়
পাড়াপড়শীর সঙ্গেতে ব'সে
সুখ-দুঃখের কথা জানায়।

সুবিধা মতন পোকা মাকড়টা যা পায় খোঁটে,
সইতে পারে না আদিখ্যেতা বা ঠ্যাকার মোটে,
বেরাল নেউল সাপ দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠে,
হয়তো বা মানে সিন্নি।
সে যেন কেবল গিন্নী।

"এসেছে এইবার"

ফিসফিস ক'রে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। পিং শব্দ ক'রে শালিকটাও উড়ে গেল। তুড়ুক ক'রে কোথা থেকে নেমে এল একটা পুরুষ-দোয়েল। নেমেই ছোট্ট একটা ফড়িং ধ'রে এক ঝটকায় সেটাকে মেরে গলাধঃকরণ ক'রে ফেললে। তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল একটু। একটা ভাঙা ঘুঁটে প'ড়ে ছিল, সেইটেকেই ঠোকরাতে লাগল। তারপর হঠাৎ নিজের প্রতিচ্ছবিটাকে দেখতে পেলে আয়নায়। পাওয়ামাত্রই ল্যাজটা খাড়া হয়ে উঠল সোজা। চিকচিক ক'রে গলা থেকে শব্দের স্ফুলিঙ্গ ছুটে বেরুল যেন দুটো। তারপর ঘাড় ফুলিয়ে তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচের ভঙ্গীতে এগিয়ে যেতে লাগল আয়নার দিকে। ল্যাজটা ঠিক খাড়া আছে। ক্লিক ক'রে শব্দ হ'ল। বৈজ্ঞানিক ফোটো নিলেন। দোয়েলটা তারপর তেড়ে গিয়ে আক্রমণ করল, কিন্তু আয়নায় প্রতিহত হয়ে উড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। উড়ে গিয়ে বসল পাশের পেয়ারাগাছের ডালে আর

সেখানে পুচ্ছ আস্ফালন ক'রে সুরের শায়ক বর্ষণ করতে লাগল সবেগে। তারপর হঠাৎ উড়ে গেল।

বৈজ্ঞানিকের চোখ থেকে আনন্দ যেন উপচে পড়ছিল।

"দেখলেন ?"

"হ্যাঁ, দেখলাম বইকি"

"পাখিটার চোখ দুটো লক্ষ্য করেছিলেন কি ?"

"লক্ষ্য করবার ছিল নাকি কিছু ?"

"বাঃ, ছিল বইকি! চোখের দৃষ্টিতে একটা হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছিল। ওইটেই তো আসল। যখন ওরা প্রণয় নিবেদন করে, তখনও ওরা অমনই তুড়ুক তুড়ুক ক'রে নাচে, গানও গায়"

"মানে, রাগ আর অনুরাগের চেহারা প্রায় একই রকম ?"—হেসে বললেন কবি।

"না, তফাত আছে একটু। চোখের ভাবটা তখন বদলে যায়। অন্যরকম হয়"

"অন্যরকম মানে ?"

"মোলায়েম। অনেকটা এইরকম গোছের"

বৈজ্ঞানিক নিজের চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু ক'রে মোলায়েম দৃষ্টি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কবি হেসে ফেলতেই কিন্তু লজ্জিত হয়ে পড়লেন একটু।

তারপর বললেন, "দোয়েলদের স্ত্রী পুরুষ আলাদা আলাদা দেখতে। কিন্তু যেসব পাখির স্ত্রী পুরুষ এক রকম এবং তারা যখন হাজার হাজার মাইল অতিক্রম ক'রে অন্য দেশে চ'লে যায়, তখন পুরুষ-পাখিরা স্ত্রী-পাখিদের চেনে কি ক'রে ? ওই ভাবভঙ্গী দেখে। ইংরেজীতে ওকে বলে 'পশ্চারিং' (Posturing)। ওদের তাড়া ক'রে যাওয়া আর প্রণয় নিবেদন করার ধরনটা প্রায় একই রকমের। স্বজাতের যে কোনও পাখি দেখলেই পুরুষ-পাখিটা ওই রকম 'পশ্চার' করতে থাকে। অচেনা পাখিটা

যদি চুপ ক'রে থাকে কিংবা গুটিসুটি মেরে ব'সে পড়ে, তা হ'লে বোঝা যায় যে, সেটা স্ত্রী-পাখি। কিন্তু সে যদি ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় কিংবা তেড়ে আসে, তা হ'লে বোঝা যায়, সেটা পুরুষ-পাখি। দোয়েলের বেলায় কিন্তু ঠিক এ কথা খাটে না। কারণ স্ত্রী-দোয়েল দেখতে আলাদা। আমি দেখতে চাইছি, স্ত্রী-দোয়েলকে দেখে ওরা যেমন গান গায়, যেমন ভঙ্গী করে, পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখলেও ঠিক সে রকম করে কি না! একটু আগেই যা দেখলাম—দেখুন দেখুন, দেখলেন? একটা ঘুঘু একটা হাঁড়িচাচার পিছনে পিছনে ছুটছে। দেখেছেন? ওই দিক দিয়ে গেল"

"দেখেছি। ঘুঘুর এমন মিলিটারি ভাব কেন?"

"হাঁড়িচাঁচা ঘুঘুর ডিম খেয়ে ফেলে যে"

"বলেন কি! পাখি পাখির ডিম খায়?"

"খায় বইকি। কোনও পাখিই নিরামিষাশী নয়। হাঁড়িচাঁচাগুলো কাকের নিকট-আত্মীয় কিনা, সেজন্যে আরও বেশি আমিষভক্ত"

"কি বললেন নাম?"

"হাঁড়িচাঁচা, টাকাচোরও বলে কেউ কেউ। ইংরেজী নাম ট্রি পাই (Tree Pie), আর বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে ওর—"

"বৈজ্ঞানিক নামে দরকার নেই। খুব শ্রুতিকটু হবে নিশ্চয়। হাঁড়িচাঁচা নামটাও শ্রুতিকটু। টাকাচোরও সুবিধের নয়। পাখিটা দেখতে কিন্তু বেশ। হিন্দি নাম নেই?"

"আছে। কোট্রি, মহোখা"

"সেদিন যে মহোখা ব'লে একটা পাখি দেখালেন, যার বাংলা নাম 'কুকো'?"

"হ্যাঁ, সেটাকেও মহোখা বলে—Centropus Sinensis—"

"কুকো নামটাও ভাল নয়। আমি ওর নাম দিয়েছি বাদামী-কালো। হাঁড়িচাঁচাকেও নূতন নাম দিতে হবে একটা"

"চুপ চুপ, আর একটা দোয়েল এসেছে। ওই যে—"

দোয়েলটা গাছের একটা উঁচু ডালে ব'সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গান ধ'রে দিলে। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাসিত চোখে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। কবিও মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ নীরবে ব'সে রইলেন দুজনে। পাখিটা গেয়েই চলেছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "চমৎকার! নয়?"

কবি উত্তর দিলেন কবিতায়—

"সুরের আবেগে সুরের মেঘেতে সুরলোকে নাবে সুরের শ্রাবণ
সুরের ঝর্ণা, সুরের বন্যা, সুরের ফোয়ারা, সুরের প্লাবন।"

রত্নপ্রভা এসে হাজির হলেন অপ্রত্যাশিতভাবে।

ধরা-গলায় বললেন, "সবজিবাগের বাড়িতে ডানা ব'লে যে মেয়েটি থাকেন, তিনি এসেছেন"

"তাই নাকি?"

শশব্যস্ত হয়ে বৈজ্ঞানিক উঠে পড়লেন।

কবি কেবল বললেন, "ও!"

তাঁর চোখের দৃষ্টি অবর্ণনীয় হয়ে উঠল।

ডানা যদিও খুব সপ্রতিভভাবে ব'সে ছিল বাইরের ঘরটাতে, মনে মনে কিন্তু তার কুণ্ঠার অন্ত ছিল না। কুণ্ঠার কারণ, অন্তরে সে ভিক্ষাপাত্র হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্তরের ভিখারিণী-ভাবটাকে সে কিছুতেই অবলুপ্ত করতে পারছিল না। আত্মসম্মান বজায় রাখবার প্রেরণাতেই এসেছিল সে, কিন্তু কামনা করছিল, আহা, যদি অন্য রকম হয়ে যায়! গম্ভীরপ্রকৃতির রত্নপ্রভা তার সামনে খাবারের থালা এবং চায়ের পেয়ালা ধ'রে দিয়ে অতিশয় সম্ভ্রমসহকারেই অভ্যর্থনার আয়োজন করেছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁর মনে হচ্ছিল, এই বিপন্না বিদুষী বিদেশিনীকে যতটা আপ্যায়িত করা উচিত, ততটা তিনি ঠিক পারছেন না। কথা তিনি বেশি বলতে পারেন না। যার-তার সামনে মোটা ধরা-গলায় কথা বলতে তাঁর লজ্জাও করে। কালো-কালো মুখখানিতে তাই একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠেছিল

তাঁর। অক্ষমতাজনিত লজ্জা, অভিজাতসুলভ ভদ্রতা এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য মিশে এমন একটা জটিল ভাব হয়েছিল, স্বল্প পরিচয়ে যার মর্মোদ্ভেদ করা শক্ত। কখনও তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করছিলেন, হাসবার চেষ্টা করছিলেন কখনও, ইতস্তত ক'রে দু-চারটি কথা ব'লে সহসা আবার এত বেশি গম্ভীর হয়ে পড়ছিলেন যে, ডানা ঠিক বুঝতে পারছিল না ব্যক্তিটি কি রকম। রত্নপ্রভাকে দেখে ডানার প্রথম বাঙালী ব'লেই মনে হয় নি। ভেবেছিল, মাদ্রাজী কিংবা সাঁওতাল আয়া বোধ হয়, বাঙালীর পোষাক প'রে আছে। পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। এ রকম বলিষ্ঠগঠন বাঙালী মেয়ে দেখা যায় না বড়। ইনিই অমরেশবাবুর স্ত্রী? রত্নপ্রভাও তন্বী ডানার মার্জিত মুখশ্রীতে, বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে, সপ্রতিভ স্বল্পভাষণে এমন একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন, যা সচরাচর দেখা যায় না এবং যা তিনি ইতিপূর্বে আর দেখেন নি। ভারি ভাল লেগে গেল মেয়েটিকে। কিন্তু এই ভাল-লাগাটাকে কিছুতেই তিনি ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছিলেন না। এই বিদুষীর সঙ্গে ঠিক কি ভাবে আলাপ করলে যে শোভন হবে, সে রকম আলাপ করবার যোগ্যতাও যে তাঁর নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব ততটা করা উচিত—এই জাতীয় জটিল মনস্তত্ত্বের জালে জড়িয়ে প'ড়ে তাঁর আচরণ সহজ হচ্ছিল না কিছুতেই, এবং সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ছিল তাঁর চোখে মুখে। আলাপ জমছিল না কিছুতে।

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে ব'সে ছিল। বৈজ্ঞানিক ও কবির পদশব্দ বারান্দায় শোনা গেল। বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরও। কবির সঙ্গে কথা কইতে কইতে তিনি ঘরে ঢুকলেন।

"পাখিদের গান নিয়ে আপনারা কবিতা লিখছেন লিখুন, কিন্তু ও নিয়ে বেশ ভাল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও লেখা যায়। বিদেশী লেখকরা লিখেওছেন। টার্নবুলের Bird Music বইখানা দেখেছেন আপনি? তাতে দেখবেন, পাখির সুরের বিশ্লেষণ করেছেন উনি। পাখিরা

কেন গান গায়, সেই গানের মূল উপকরণ, মানে Component Elements কি কি—"

তারপর হঠাৎ ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "ও, আপনি এসেছেন! নমস্কার নমস্কার! ভারি আনন্দিত হলাম, বসুন বসুন। আমরা দুজনে দোয়েল দেখছিলাম—"

কবিও সহাস্য দৃষ্টি মেলে চাইলেন ডানার দিকে। তাঁর মনে হ'ল, যদিও প্রমাণ করা যাবে না, কিন্তু যদি যেত বেশ হ'ত যে, দোয়েলের গান আর ওই ডানার রূপ আসলে এক জিনিষ। একটা কান দিয়ে মর্মে পৌঁছোয়, আর একটা চোখ দিয়ে। অমরবাবুকে বললে তিনি বোধ হয় হেসেই উড়িয়ে দেবেন, কিন্তু আসলে কোনও তফাত নেই সত্যি।

ডানা বললে, "আপনার কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম"

"কি বলুন তো ?"

"আমি ঠিক করেছি, কলকাতা যাব।" ডানা ক্ষণকাল থেমে রইল কি যেন একটু প্রত্যাশা ক'রে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "ও, তাই নাকি ? বেশ তো"

ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে সর্বস্বান্ত হ'লে মনের যে রকম অবস্থা হয়, কবির মনের অবস্থা সেই রকম হ'ল অনেকটা। খবরটা শুনে বিবর্ণমুখে নির্বাক হয়ে রইলেন তিনি।

ডানা বললে, "কলকাতায় আমার তেমন চেনাশোনা কেউ নেই তো। আপনার যদি কেউ চেনাশোনা থাকে আর তাদের নামে আপনি যদি দু-একটা চিঠি দিয়ে দেন, তা হ'লে আমার একটু সুবিধে হয়"

"বেশ তো, দিয়ে দেব। কলকাতায় আপনি গিয়ে আমার বাড়িতেও উঠতে পারেন। বাড়িটা তো খালি আছে, নয় ?"

"না। সেটা কালীবাবুরা নিয়েছেন"—গম্ভীরভাবে বললেন রত্নপ্রভা। তাঁর চোখে হাসির আভা ফুটে উঠল।

"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে ছিল না। আচ্ছা, আমি চিঠি দিয়ে দেব"

ডানা বললে, "আর একটা কথা। আমি প্রায় দু মাস হ'ল আপনার বাড়িতে আছি। তার ভাড়াটা কত?—চুকিয়ে দিয়ে যেতে চাই"

"বাড়ি তো আমরা ভাড়া দিই নি"—ধরা-গলায় রত্নপ্রভাই আবার বললেন, "আপনাকে থাকতে দিয়েছিলাম"

ডানা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, "আবার অত খরচ ক'রে—"

"আপনি না থাকলেও সারাতে হ'ত। বাড়ি থাকলেই সারাতে হয়"

কথা কটি ব'লে রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চাইতে গিয়ে দেখলেন, তিনি ওধারে স'রে গিয়ে হেঁট হয়ে শেল্‌ফে বই খুঁজছেন। রত্নপ্রভার বড় বড় চোখ দুটি মধুর রসিকতার রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল যেন কানায় কানায়। কিন্তু একটি কথা বললেন না তিনি। হাস্যদীপ্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন শুধু স্বামীর দিকে।

ডানা বললে, "আমার আর কিছু বলবার নেই তা হ'লে। আপনাদের এই অকৃত্রিম ভদ্রতার মূল্য দিতে যাওয়া বর্বরতা, কিন্তু কি ক'রে যে এর প্রতিদান দেব বুঝতে পারছি না"

হঠাৎ ডানা থেমে গেল। তার নীচের ঠোঁট দুটো ঈষৎ কেঁপে উঠল যেন। কিন্তু তা এত ঈষৎ যে, কারও চোখে পড়ল না।

কবি এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ছিলেন। জীবনটা যে স্বপ্ন, যা দেখছি সবই মায়া—এ ধরনের কোনও বৈদান্তিক চিন্তাকে আঁকড়ে ধ'রে তিনি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছিলেন না। মর্মান্তিক দুঃখটাকেই তিনি উপভোগ করবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল—

মলয় হাওয়া চলিয়া গেল
আসিল ছুটে আঁধি
তবু যে লাগে ভালো,

তোমারি তরে বিজন ঘরে
বসিয়া একা কাঁদি
জ্বালি আশার আলো।
কাননে পথে মেতেছে ঝড় কি গরজন তুলি
শিহরি ভাবি বুকেতে যারে ধরিয়াছিল ধূলি
মুছিয়া গেল বুঝি রে সেই চরণরেখাগুলি
ঘনাল ঘন কালো,
তবুও লাগে ভালো।

ডানা থেমে যেতেই তাঁর ঘোরটা কেটে গেল যেন সহসা। ডানার দিকে চেয়ে তিনি বললেন, "আপনি স্কুলে যে চাকরি নেবেন কথা হচ্ছিল, তার কি হ'ল ?"

"সেটা না নেওয়াই ঠিক করলাম। মাস্টারি তো কখনও করি নি, ও আমি পারব না"

বিবর্ণমুখে কবি উত্তর দিলেন, "ও। যা বলছেন তা এক হিসেবে অবশ্য ঠিক, কিন্তু আবার আরম্ভ করলে দেখতেন হয়তো অন্যরকম"

"ও আমার ভালও লাগে না"

"চলুন, আমরা ভিতরে যাই"—রত্নপ্রভা ডানার দিকে চেয়ে বললেন। তারপর কবির দিকে ফিরে বললেন, "আপনাদের আরও চা চাই নিশ্চয় ?"

বৈজ্ঞানিক বই খুঁজতে খুঁজতে বললেন, "চা নয়, কফি"

"আচ্ছা"

ডানাকে সঙ্গে নিয়ে রত্নপ্রভা ভিতরে চ'লে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক একটা পাতলা গোছের বই শেল্‌ফ্ থেকে বার ক'রে সেটার ধূলো ঝাড়লেন।

"টার্নবুলের বইখানা পেয়েছি। পাখির গান আর ভাষা নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন ভদ্রলোক। পাখিরা কেন গান গায়,

তার কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টাও করেছেন। তাঁর মতে বসন্তঋতুই পাখিদের গান গাইবার একটা প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ বোধ হয় দিয়েছেন প্রণয়লীলা—মানে, Nuptial Display"

তাড়াতাড়ি বইটার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

"এই যে, তৃতীয় কারণ দিচ্ছেন Rivalry—মানে, প্রতিযোগিতা; Defiance, অর্থাৎ যুদ্ধং দেহি ভাব এবং Assertion of Rights—মানে, নিজের অধিকার জাহির করা। আর চতুর্থ কারণ হচ্ছে, Joy and high spirits—মানে, আনন্দ স্ফূর্তি। আমরা এখনই যে দোয়েলটাকে লক্ষ্য করলাম, এর সবগুলোই তার মধ্যে পাওয়া গেল, কি বলেন? কিন্তু দাঁড়ান—"

আবার পাতা ওলটাতে লাগলেন।

"এই যে—"

"কি?"

"পাখির ডাককে ইনি বারো দফায় ভাগ করেছেন। দেখা যাক, দোয়েলের মধ্যে সবগুলো পাওয়া যাচ্ছে কি না। Song Proper—মানে, রীতিমত গান, শুনেছি; Little Song—মানে, ছোটখাট গান, শুনেছি; Phrases—মানে, এমনই ডাক, শুনেছি; Chirrups, নিজেদের মধ্যে আলাপ, শুনি নি; Call Notes—আহ্বান, শুনি নি; Flight Notes—মানে ওড়বার ডাক, শুনি নি; Alarm Notes—ভয়ের ডাক, শুনি নি; Love Notes—প্রণয়-সম্ভাষণ, শুনেছি; Imprecations—অভিশাপ, শুনেছি; Cradle Notes—বাচ্চাদের সঙ্গে ওরা যে সব কথা বলে, শুনি নি; Grief Notes—ব্যথা পেলে যে ভাবে ডাকে, বোধ হয় শুনি নি। Drumming of woodpecker—এ অবশ্য আলাদা জিনিষ—"

কবি যদিও মনমরা হয়ে পড়েছিলেন একটু, তবু জিজ্ঞেস করলেন, "এত রকম ডাক আছে? একটু ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন তো। প্রথমটা কি হ'ল?"

উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক।

"প্রথমটা হ'ল Song Proper—মানে, পুরোদস্তুর পাবলিক গান। দোয়েল যে গানটা কোনও উঁচু ডালে ব'সে একটানা গেয়ে যায়, তার ইচ্ছেটা, যেন সবাই এ গান শুনুক। Little Song হচ্ছে ওরই ছোট সংস্করণ। আর Chirrups হচ্ছে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, চড়ুই বা ছাতারে যা ক্রমাগত করছে। দোয়েলের মধ্যে সেটা লক্ষ্য করি নি কখনও। দোয়েল গম্ভীর পাখি, বাজে বকবক করতে শুনি নি। Phrases—মানে, এমনই একটানা ডাক, কাক যেমন কা-কা করে বা ঘুঘু যেমন একটানা ডেকে যায়, দোয়েলের শিসটা এই ধরনের বলতে পারেন। Call Notes হচ্ছে যখন একটা পাখি আর একটা পাখিকে ডাকে কিংবা একদল পাখি যখন আর একদল পাখিকে ডাকে, তখন সেই ডাককে Call Note বলে। একদল বক বা হাঁস যখন উড়ে যায়, দেখবেন, একটা বা দুটো ডাকতে ডাকতে যাচ্ছে। দোয়েলের শিসটাকে Call Noteও বলা যেতে পারে। শিস দিয়ে অনেক সময় সঙ্গিনীকে ডাকে ওরা, আলাদা কোনও Call Note শুনেছি ব'লে তো মনে হয় না। Flight Notes হচ্ছে ঠিক ওড়বার সময় অনেক পাখি একটা ডাক দিয়ে তবে ওড়ে। শালিক পিং ক'রে একটা শব্দ করে, কোকিল খুব তাড়াতাড়ি কু-কু-কু-কু ক'রে উড়ে যায়। দোয়েল নিঃশব্দে ওড়ে, ওর Flight Note শুনি নি, Alarm Noteও শুনি নি। ভয় পেলে কিংবা উত্তেজিত হ'লে Alarm Note শোনা যায়। সাপ বা বেড়াল দেখলে শালিকরা যে ভাবে ডাকে, তাই হচ্ছে Alarm Note। Love Notes মানে ভালবাসার ডাক; দোয়েলের Love Notes ভারি মিষ্টি। শোনাব একদিন আপনাকে। Imprecation হচ্ছে গালাগালি, ফিঙেদের মুখে প্রায় শুনবেন। দোয়েলরা একটা মৃদু কের্‌র্‌র্ গোছের শব্দ করে। Cradle Notes, শালিক-চড়ুইয়ের শোনা যায়, যখন তারা বাচ্চাদের খাওয়ায়। দোয়েলের শুনি নি, এবার শুনতে হবে,

বুঝলেন। আমার গোয়াল আর আস্তাবলের কার্নিসে ওরা বোধ হয় বাসা করবে, তখন শোনা যাবে। Grief Notes দোয়েলের কখনও শুনি নি, তবে শীতের সময় ওরা যে করুণ ডাক ডাকে, তাকে Grief Notes বলা যায়। সাধারণত কষ্ট পেলেই—"

মুন্সিকে দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

"হুজুর, পাখিগুলো বড্ড বেশি ডাকছে আজ সকাল থেকে"

"তাই না কি! খেতে দিয়েছিলি তো?"

"হাঁ, হুজুর। খাবার তো আজকাল কষ্ট নেই। মল্লিকবাবু আজকাল রোজ অনেক ফড়িং পাঠিয়ে দেন"

কবি জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ পাখিগুলো?"

"সেই রেডস্টার্টগুলো, যাদের নাম দিয়েছেন আপনি ফুলকি। এই সময় ওরা ফিরে যায় কিনা, তাই ছটফট করছে বোধ হয়। চলুন দেখি গিয়ে"

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কফির সরঞ্জাম নিয়ে একজন চাকর এসে হাজির হ'ল।

"কফিটা খেয়েই যাওয়া যাক তা হ'লে, কি বলেন? মুন্সি, তুই এগো, আমরা আসছি"

কবির কিছুই ভাল লাগছিল না। যন্ত্রচালিতবৎ তিনি কফির একটা পেয়ালা তুলে নিলেন।

বৈজ্ঞানিক কফি খেতে খেতে আড়চোখে কবির দিকে একবার চেয়ে দুষ্টু ছেলের মত একটু হেসে বললেন, "আজ কিন্তু আবার এমন একটা কাজ করতে হবে, যা হয়তো আপনার মনঃপূত হবে না ঠিক"

"কি?"

"আরও কয়েকটা রেডস্টার্ট ডিসেক্‌ট্ করতে হবে। দেখতে হবে, ওদের ওভারি (ovary) আর টেস্‌টিস্ (testes) গুলোর অবস্থা কি এখন"

কবি কফিতে চুমুক লাগিয়ে কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বলা হ'ল না, রত্নপ্রভা এসে পড়লেন। রত্নপ্রভা এসে এমন একটা কথা বললেন, যা অপ্রত্যাশিত, যা শোনামাত্র কবির অসাড় মন সজাগ হয়ে উঠল নিমেষে।

রত্নপ্রভা বললেন, "আচ্ছা, তুমি তো একজন প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়েছ, তোমার ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে, তোমার প্রবন্ধ টাইপ করবার জন্যে। এঁকেই সেই কাজটা দাও না। উনি বি. এ. পাশ, শর্টহ্যাণ্ড টাইপ-রাইটিং জানেন। উনি মাস্টারি করতে চান না, এই ধরনের কাজ খুঁজতেই উনি কলকাতা যাচ্ছেন"

"বেশ তো! উনি যদি থাকতে রাজী হন, আমার কিছু আপত্তি নেই"

"উনি রাজী আছেন। তবে উনি আলাদা থাকতে চাইছেন, এক বাড়িতে থাকতে একটু ইতস্তত করছেন"

রত্নপ্রভার গম্ভীর মুখে একটা হাসির আভা ফুটে উঠল।

"যেখানে আছেন, সেখানেই থাকতে পারেন। আমার কাজের সময় পেলেই হ'ল"

অনাবশ্যক উচ্চকণ্ঠে কবি ব'লে উঠলেন, "সে তো চমৎকার হবে!"

"চলুন, রেডস্টার্টগুলো দেখি গিয়ে, ডাকছে কেন!"

বেরিয়ে পড়লেন দুজনে। কবি সোৎসাহে বললেন, "দেখুন, যদিও প্রথম প্রথম আপনার ওই ডিসেক্‌শন ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগত, এখন কিন্তু ভেবে দেখছি, ও রকম খারাপ লাগার কোনও মানে নেই। যা কর্তব্য তা করতে হবে"

"খারাপ-লাগা ভাল-লাগাটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। প্রথম প্রথম আমারও খারাপ লাগত, এখন কিন্তু বেশ লাগে"

"ঠিক"

দুজনে হন হন ক'রে অগ্রসর হতে লাগলেন।

৪

মন্দাকিনী খুব ভোরেই উঠেছেন সেদিন। উঠেই প্রথমে তিনি গেলেন ঘুঁটেগুলো দেখতে। কাল রাত্রে এক-পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ঘুঁটেগুলো ভিজে গোবর হয়ে গেল বোধ হয়! গিয়ে দেখেন, ঘুঁটে-গুলো ভিজে তো গেছেই, একপাল গোশালিক এসে তছনছ করছে সেগুলোকে। ঠুকরে মাড়িয়ে চীৎকার চেঁচামেচি ক'রে কি কাণ্ডই যে বাধিয়েছে মুখপোড়ারা! নিরুপায় ক্ষোভে তাঁর চোখে জল এসে গেল যেন। একে আজকাল কয়লা কাঠ কিছুই পাওয়া যায় না, চাকর-বাকর নেই, ঠিকে ঝি এবেলা ওবেলা কোন রকমে বাসনটা মেজে দিয়েই পালায়, নিজের হাতেই কাল ঘুঁটে দিয়েছিলেন। সমস্ত ভিজে গেছে। গোশালিকগুলো নিমগাছটার উপর ব'সে কলরব করছিল, সেদিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে গেলেন তিনি সুন্দরীর গোয়ালে। গোয়ালেও যা দেখলেন, তা আনন্দজনক নয়। গোয়ালের চাল ছাওয়ানো নেই ভাল ক'রে, সুন্দরী সমস্ত রাত ভিজেছে বৃষ্টিতে। বাছুরটার সারা গায়ে গোবর। সুন্দরীর পিছনের পা দুটোও গোবরে মাখা। সব পরিষ্কার করতে হবে নিজেকে। হঠাৎ যেন বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা শক্তি সঞ্চারিত হ'ল তাঁর; উৎসাহের উৎসমুখ অবারিত হ'ল সহসা; নিজের অজ্ঞাতসারেই জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। খাদ্য পেলে পুলকিত হয় যেমন ক্ষুধার্ত, কাজ পেলে তেমনই আনন্দিত হন মন্দাকিনী। দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে তিনি বাছুরটাকে সরিয়ে বাঁধলেন, সুন্দরীকে বাইরে বার ক'রে দিলেন। আমগাছটার দিকে একবার চাইলেন, খুব মুকুল এসেছিল, বৃষ্টিতে ধুয়ে গেল সব। ক্ষণকাল ধৌত-পরাগ মুকুলগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, পাপে ভ'রে রয়েছে পৃথিবী, তাই এই সব অনাসৃষ্টি হচ্ছে। গরুর দুধ নেই, খেজুরগুড়ে গন্ধ নেই, অসময়ে বৃষ্টি। সুন্দরীকে বেঁধে গেলেন তিনি বাড়ির মধ্যে। রান্নাঘরের একটা

উনুন পরিষ্কার ক'রে নিকিয়ে কাঠের জ্বালে চা করতে হবে। নিজের জন্যে নয়—ওঁর জন্যে। তারপর রান্নাঘর ধুয়ে, উনুনে ডালের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে চান করতে যাবেন তিনি। ততক্ষণ ঠিকে ঝিটা এসে যাবে, বাজার ক'রে আনবে, তারপর বাসন মাজবে, জল তুলবে, ঘরদ্বার পরিষ্কার করবে। ততক্ষণ মন্দাকিনীর স্নান সারা হয়ে যাবে, পূজোও সারা হয়ে যাবে। তারপর পাথরের গ্লাসে ক'রে একটি পুরো গ্লাস চা খাবেন তিনি। চা খেয়ে তারপর বাকি রান্নাটা করবেন। ঝি চ'লে যাবে। আনন্দবাবু তো চা খাবার পরই রোজ বেরিয়ে যান বাইনাকুলার হাতে ক'রে পাখি দেখতে। বারোটার আগে কোনও দিন ফেরেন না। এই সময়টুকুর মধ্যে মন্দাকিনী টুকিটাকি নানা কাজ করেন। সুন্দরীর তদারক করেন, খাবার করেন, বিকেলের জন্য পরোটা তরকারি করতে হয়, মাঝে মাঝে দু-একটা শৌখিন খাবারও করেন জিনিসপত্র পেলে। কাল গোয়ালার কাছ থেকে দুধ কিনে ক্ষীর ক'রে রেখেছেন রাত্রে, আজ মালপোয়া করার ইচ্ছে আছে। সোৎসাহে তিনি উনুন পরিষ্কার করতে লাগলেন। পরিষ্কার ক'রে কাঠের ঘরে গেলেন কাঠ আনতে। কাঠের ঘরের চালাটাও শত-ছিদ্র, জল প'ড়ে সব কাঠ ভিজে গেছে। ওরই মধ্যে থেকে বেছে বেছে কিছু কাঠ নিয়ে এলেন তিনি, পুরোনো খবরের কাগজ আর সামান্য কেরোসিন তেল দিয়ে ধরালেন সেগুলো। একটু ধ'রেই নিবে গেল আবার। বেশি কেরোসিন দিলে ধ'রে যেত। কিন্তু উনুন ধরাবার জন্যে বেশি কেরোসিন আজকাল খরচ করা চলে না। পয়সা ফেললে বাজারে মিলবে না। রাত্রে পড়াশোনা করবার জন্যে ওঁর তেল চাই। শুয়ে শুয়ে না পড়লে ঘুমই হয় না। যত সব বদ অভ্যাস! ঘরে আলো জ্বললে তাঁর তো ঘুমই আসে না। এই দুঃখে ওঁর কাছে শোওয়া ছেড়েই দিয়েছেন তিনি আজকাল। পাশের ঘরে শোন। উনি একা ঘরে পড়েন শুয়ে শুয়ে। কখনও বা উঠে লিখতে ব'সে যান।

অদ্ভুত মানুষ! না, কেরোসিন আর খরচ করা চলবে না। হেঁট হয়ে উনুনে ফুঁ দিতে লাগলেন আর গজগজ ক'রে গাল পাড়তে লাগলেন। আনন্দমোহনকে নয়, নিজের অদৃষ্টকেও নয়, বিধাতাকে। মন্দাকিনীর ধারণা, ওই মুখপোড়াই দুষ্টুমি ক'রে মাঝে মাঝে গোলমাল করে দেয় সব। খোকনের প্রতি তাঁর যে মনোভাব, বিধাতার প্রতিও তেমনই। এও তাঁর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস, শত দুষ্টুমি সত্ত্বেও খোকনকে যেমন শেষকালে হার মানতে হয় তাঁর কাছে, বিধাতাকেও তেমনই হবে। সেই ছেলেবেলায় পুণ্যি-পুকুর থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত তিনি যে পথে নিষ্ঠাভরে চ'লে এসেছেন, সেই পথেই তিনি লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। বিধাতার সাধ্য নেই, তাঁকে আটকায়। মাঝে মাঝে তিনি দুষ্টুমি করে পথের মাঝখানে বিঘ্ন সৃষ্টি করেন—মনের জোর আছে কি না পরীক্ষা করবার জন্যে। কিন্তু ওসবে দমবার লোক মন্দাকিনী নন। কিন্তু দুষ্টুমি করার তো একটা সীমা থাকা উচিত, অসময়ে বৃষ্টি ক'রে শুকনো কাঠগুলো ভিজিয়ে দেশসুদ্ধ লোকের চোখকে ধোঁয়ায় জ্বলিয়ে দেওয়ার মানে হয় কোনও? মন্দাকিনী হেঁট হয়ে হয়ে ক্রমাগত ফুঁ দিতে লাগলেন।

কবি সকালে উঠে মুখ ধুয়েই গিয়েছিলেন ছাতে। মনটা খুব প্রসন্ন ছিল। অকারণ পুলকে ঝলমল করছিল সমস্ত অন্তঃকরণ। মোটা মোটা ঠোঁট দুটোকে কুঁচকে শিস দেবার চেষ্টা করলেন একটু। রাত্রের বৃষ্টিতে সব মলিনতা ধুয়ে গেছে যেন। গাছপালার শ্যামশোভা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দোয়েল পাখিটা ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের ডালে ব'সে ডেকে চলেছে অবিরাম। ফিঙে একটা ব'সে আছে টেলিগ্রাফের তারে। নীলকণ্ঠ উড়ে এসে বসল একটা। কালো কালো দুর্গাটুনটুনিরা ডাকছে ক্রমাগত। হঠাৎ চোখে পড়ল, উত্তর দিকে ক্ষান্ত-বর্ষণ একটা মেঘ লম্বিত রয়েছে, তাতে রোদের আভা লেগেছে, মনে হচ্ছে একটা অপরূপ পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে কেউ যেন। মনে পড়ল কুমারসম্ভবের শ্লোক—

যত্রাংশুকাক্ষেপবিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্

দরীগৃহদ্বার বিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তী।

কল্পনায় জেগে উঠল হিমালয়ের গুহাভ্যন্তরে নগ্না কিন্নরীকুলের লজ্জা-নিবারণের জন্য মেঘ যবনিকার মত ঢেকে দিয়েছে গুহামুখ। অদ্ভুত কল্পনা কালিদাসের। স্তম্ভিত বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ সেদিকে। গিটকিরিভরা এক ঝাঁক সুর আছড়ে পড়ল সহসা তাঁর চেতনায়। উজ্জয়িনী থেকে ফিরে আসতে হ'ল, নেমে পড়তে হ'ল হিমালয় থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন সজনে গাছের উপর একঝাঁক পাখি ডাকছে। তাড়াতাড়ি নেবে গেলেন নিজের তেতলার ঘরটিতে। দূরবীনটা নিয়ে দেখতে লাগলেন ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে। জানলার ভিতর দিয়ে গাছটা স্পষ্ট দেখা যায় আরও। বিস্মিত হয়ে গেলেন দেখে। গোশালিকের ঝাঁক। গোশালিকের এত রূপ! এত সুর তার কণ্ঠে! যে গোঁশালিকের দল একটু আগে মন্দাকিনীর ক্রোধের কারণ হয়েছিল, তারাই জাগাল কবির মনে কবিতা—

রূপ যে তোমার নতুন ক'রে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা
ও গোশালিক, দেখতে পেলাম
তুচ্ছ তো নও, রূপান্বিতা!
দেখতে পেলাম ভোরের আলোয়
মানিয়েছে বেশ সাদায় কালোয়
ঠোঁটে তোমার রঙ মেহেদি
চোখ মেলে তো দেখিই নি তা।

দোয়েল শ্যামা বুলবুলিরা
সুর-গরবে অহঙ্কারী
শুনুক তারা কণ্ঠে তোমার
উঠছে সুরের কি ঝঙ্কারই

অতি-চেনার বোরখা প'রে
দাঁড়িয়েছিলে ঘরের দোরে
বেরিয়ে এলে বোরখা খুলে
অর্থটা তার বলবে কি তা ?
রূপ যে তোমার নতুন ক'রে
দেখতে পেলাম আজকে মিতা।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে মন্দাকিনী প্রবেশ করলেন। ক'রেই বললেন, "তোমার কি ভীমরতি ধরেছে নাকি! রাঁধুনী বামুন রাখতে চাইছ, টাকা কোথায় অত ?"

"রাঁধুনী বামুন!"

স্বপ্নলোক থেকে নেবে এলেন কবি এবং নেবে এসেই সচেতন হলেন পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে।

"একটা মৈথিল বামুন এসেছে। বলছে, তুমি নাকি রূপচাঁদবাবুকে বলেছিলে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। এই খরচই কুলোতে পারছি না, আবার বামুন কেন ?"

একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন কবি।

বললেন, "হ্যাঁ, বলেছিলাম বটে রূপচাঁদকে। এসেছে বামুন ? রাখ না। খেটে খেটে মরবার যোগাড় হয়েছ যে!"

মন্দাকিনী মনে মনে প্রীত হলেন একটু। মুখে কিন্তু বললেন, "খাটলে আবার মানুষে মরে নাকি ? কাজকর্ম না থাকলে সমস্ত দিন করবই বা কি ?"

"কাজের ভাবনা কি ? এস না, দুজনে মিলে পাখি দেখি। কি অদ্ভুত যে—"

"হয়েছে"—হেসে ফেললেন মন্দাকিনী। "নাও, চা-টা খেয়ে নাও, পেয়ালাটা নিয়েই যাই"

কবি ডিশে ঢেলে ঢেলে চা খেতে লাগলেন। চলকে খানিকটা চা প'ড়ে গেল কাপড়ে।

ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন মন্দাকিনী, "আবার কাপড়ে চা ফেললে তো! সমস্ত কাপড়গুলোতে দাগ হয়ে গেছে! চায়ের দাগ সহজে কি উঠতে চায়?"

কবি হেসে বললেন, "ওঠাবার দরকার কি, থাক্ না"

"ওসব নোংরামি আমি দেখতে পারি না"

দুজনেই চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। গোশালিকের কলরব আবার উদ্দাম হয়ে উঠল নিমগাছে। কবির চোখ আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। সমস্ত চা-টা ডিশে ঢেলে এক নিমিষেই পান ক'রে ফেললেন সবটা।

"বামুনটাকে রাখ, বুঝলে? পাখি যদি একবার দেখতে আরম্ভ কর, তা হ'লে বুঝবে, কি চমৎকার জিনিস ও। এই গোশালিকই এতদিন অচেনা ছিল আমার কাছে"

কবি হঠাৎ একটা প্রত্যাশাভরা দৃষ্টি তুলে চাইলেন তাঁর স্ত্রীর দিকে। মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগল, গোশালিকের মধ্যে তিনি যেমন অপ্রত্যাশিতভাবে নূতন রূপ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর প্রৌঢ়া গৃহিণীর মধ্যেও হয়তো তিনি আজ তেমনই আবিষ্কার ক'রে ফেলবেন সঙ্গিনীকে, যে শুধু তাঁর সন্তানের জননী নয়, সংসারের কর্ত্রী নয়, যে তাঁর কবি-মানসের বিবিধ বিচিত্র খেয়ালের সহচরী। মন্দাকিনীর উত্তর শুনে কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মস্থ হতে হ'ল তাঁকে।

"ঝাঁটা মারি আমি গোশালিকের মুখে। সমস্ত ঘুঁটেগুলোকে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে, নখ দিয়ে খুঁড়ে তছনছ করেছে একেবারে"

"ও বেচারাদের চ'রে খেতে হবে তো! ওদের তো আর পেনশন নেই আমার মত"

এর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনই অনুভব করলেন না মন্দাকিনী। ঘরের কোণে যে ফুল-ঝাড়ুটা রাখা ছিল, সেটা নিয়ে তিনি কবির বই-রাখা শেল্‌ফগুলো ঝাড়তে লাগলেন। প্রচুর ধুলো জমেছিল। কবি একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। কৃতজ্ঞতায় সমস্ত মন ভ'রে

উঠল সহসা। বারো বছর বয়সের যে কিশোরীটিকে বিয়ে ক'রে এনেছিলেন তিনি বহুকাল পূর্বে, তাকে যেন তিনি দেখতে পেলেন হঠাৎ। সেই থেকে ক্রমাগত সেবা ক'রে চলেছে। কিছুতেই থামবে না। মন্দাকিনীর মত স্ত্রী না পেলে কি তাঁর মত মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে লেখাপড়া করা সম্ভব হ'ত? সংসারের কোন আঁচটি তাঁর গায়ে লাগতে দেয়নি। তখনই কিন্তু মনে হ'ল, তা দেয় নি বটে, কিন্তু মন্দাকিনী তাঁর জীবনে ঠিক সেই প্রেরণা সঞ্চার করতে পেরেছে কি, যার জন্যে তাঁর কবি-চিত্ত সতত উন্মুখ হয়ে আছে? এমন একটি মহিমময় মহূর্ত মন্দাকিনী তাঁর জীবনে মূর্ত ক'রে তুলতে পেরেছে কি, যার জন্যে সমস্ত সুখ-সুবিধা তুচ্ছ ক'রে অকূলে ঝাঁপিয়ে পড়তেও লোকে ইতস্তত করে না? তিনি কবি, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ তিনি, তাঁর সমিধ-সম্ভারে একটি স্ফুলিঙ্গও দিতে পেরেছে মন্দাকিনী কোনও দিন? সে আগুনের জন্যে বারে বারে তাঁকে অপরের দ্বারস্থ হতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। ডানার মুখখানা মনে পড়ল। এমন অদ্ভুত একটা বহ্নি আছে মেয়েটির মধ্যে, যার সান্নিধ্যে এলেই সমস্ত মন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। না, ঠিক যৌন-লালসা নয় এটা—বৈজ্ঞানিকেরা যা-ই বলুন, আকর্ষণ মাত্রেই যৌন-আকর্ষণ নয়। লোহার সঙ্গে চুম্বকের সম্পর্কটা কি যৌন? একএকটা বিশেষ লোককে দেখলেই মনে হয়, এই তো সে, যাকে খুঁজছিলাম এতদিন, তা সে নারী পুরুষ যে-ই হোক। তার কাছে গেলেই মনে ছবি জাগতে থাকে উদার আকাশের, দিগন্তবিস্তৃত মাঠের, দুরারোহ পর্বতের, সীমাহীন সমুদ্রের। অপূর্ব পুলকে সমস্ত চিত্ত ভ'রে ওঠে, অদ্ভুত উৎসাহ সঞ্চারিত হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, কোনও কিছু অসম্ভব ব'লে মনে হয় না, মনে হয়, সব পারব, মন ডানা মেলে উড়তে চায়। মন্দাকিনী ঠিক এ জাতের নয়। মন্দাকিনী বিচক্ষণ সচিব, অভিজ্ঞ গৃহিণী। কিন্তু প্রিয়সখী নয়, ললিতকলাবিধির কোনও ধার ধারেনা ও।

আশ্চর্য, ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে মন্দাকিনীও ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। নিজের চরিত্রে বা আচরণে যদিও কোন দোষ তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন না, কবির কবি-প্রতিভা সম্বন্ধেও হঠাৎ তিনি যে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তাও নয়, তবু কেমন যেন আবছাভাবে তাঁর মনে হচ্ছিল, এ লোকটির ঠিক সঙ্গিনী তিনি হতে পারেন নি। মনে হওয়ামাত্রই রাগ হ'ল তাঁর, নিজের উপর নয়—কবির উপর। বুড়ো বয়সে ওই সব ছেলেমানুষি মানায় নাকি! সঙ্গে ক'রে তীর্থে নিয়ে যেতে চাও রাজী আছি, পাখি দেখে বেড়াবার বয়স আছে কি আর এখন? ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখলেন একবার। কবি জানলায় দাঁড়িয়ে আছেন চোখে দূরবীন লাগিয়ে। আশ্চর্য মানুষ! হেঁট হয়ে শেল্‌ফের তলার ধূলোগুলো পরিষ্কার ক'রে নিলেন। একটা কাগজে সেগুলো নিপুণভাবে তুলে বাইরে ফেলে দিলেন। আবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন। তখনও দাঁড়িয়ে আছেন কবি নিস্পন্দ হয়ে, চোখে দূরবীন।

"কি দেখছ অত তুমি?"

কবি চমকিত হলেন। তারপর হেসে বললেন, "একটা ফিঙে। ফিঙে দেখেছ ভাল ক'রে কখনও? ওয়াণ্ডারফুল!"

"টেলিগ্রাফ পোস্টের ওপর কি চমৎকার ব'সে আছে তখন থেকে! কুচকুচে কালো, গা থেকে রোদ পিছলে পড়ছে যেন! সূর্য যেন শত ধারায় সোনা ঢালছে ওর গায়ে আর ও যেন ঘাড় বেঁকিয়ে বলছে, চাই না তোমার সোনা, নিয়ে যাও, নিছক কালোই ভাল আমার, অলঙ্কার দরকার নেই, থ্যাঙ্ক্‌স!"

হেসে ফেললেন মন্দাকিনী, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত অন্তরও স্নেহে বিগলিত হয়ে পড়ল যেন। চুলে পাক ধরলে কি হবে, লোক নিতান্ত ছেলেমানুষ এখনও। ছি ছি, এ রকম লোককে নিয়ে কি সংসার করা চলে?

"দেখবে?"

"ওসব ছেলেমানুষি করবার সময় নেই আমার এখন"

মুখে যদিও এ কথা বললেন, কিন্তু মনে মনে দেখবার লোভ যে একটু ছিল না তা নয়।

"একটুখানি দেখ না—"

খুব অনিচ্ছাসহকারে যেন কবিকে বাধিত করবার জন্যেই এগিয়ে এলেন মন্দাকিনী। দূরবীনে চোখ লাগিয়ে দেখলেন ফিঙেটাকে। বাঃ, বেশ চমৎকার দেখাচ্ছে তো! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে ছুটলেন দ্বারের দিকে—"ওই যাঃ, ডালটা পুড়ল বোধ হয়, গন্ধ ছাড়ছে, কি যে ছেলেমানুষি কর তুমি!" পর-মুহূর্তেই বেরিয়ে গেলেন। কবি দেখতে লাগলেন ফিঙেটাকে আবার। একটা কথা মনে প'ড়ে গেল। কাল ভোরে অদ্ভুত রকম মিষ্টি সুরে একটা পাখি ডাকছিল। উঠে টর্চ ফেলে দেখেছিলেন, অভিনব কোন পাখি নয়, ফিঙে। পাশে সঙ্গিনীটিও ব'সে আছে বলে মনে হ'ল। কি রে মেকি কি মেকি কি মেকি কি—ক্রমাগত ডেকে চলছে। শুকতারা জ্বলজ্বল করছে পূর্বাকাশে। কি রে মেকি কি মেকি কি মেকি কি। কবির হঠাৎ মনে হ'ল, যা কিছু মেকি তার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে ও যেন। সূর্যের সোনা ও চায় না, ফরসা হবার কোনও লোভ নেই ওর। আফ্রিকার জুলুর মত, ভারতবর্ষের কালা-আদমির মত কৃষ্ণবর্ণের গৌরবেই ও গৌরবান্বিত, আর সেটাকে প্রচারও করতে চায় স্পষ্টভাবে। শ্বেতাঙ্গদের বহু শতাব্দীর অত্যাচারের আগুন ওর বুকের ভিতর জ্বলছে। ভোরবেলায় প্রিয়াকে সম্বোধন করবার বেলাতেও তাই বোধ হয় ওর মনে হয়, এও মেকি নয় তো? সুরে সুরে বার বার প্রশ্ন করছে তাই—কি রে, মেকি কি, মেকি কি, মেকি কি?

ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—
চেনে নি তোমায় আজও যাহারা

কোন দেশে বাস করে তাহারা
উদ্যত ওগো কালো পতাকা
সদা-জাগ্রত কড়া পাহারা
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

কখনও বসিয়া আছ সু-উচ্চ টেলিগ্রাফ পোস্টে
গরু ছাগলের পিঠে কখনও বা ভ্রমিতেছ গোষ্ঠে
ফিং দিয়ে ছুটে যাও কখনও বা পতঙ্গ লক্ষ্যি'
ওগো ফিঙে পক্ষী,
খাইয়া তোমার তাড়া
কাক চিল পাড়াছাড়া
নিমেষে
ঠোকর খাইয়া মরে যদি হয় এতটুকু ঢিমে সে।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

বুকে যে আগুন জ্বলে সারা গায়ে তারই কালো ঝুল কি ?
জ্বলজ্বলে লাল চোখে দেখা যায় বুঝি তারই ফুলকি,
তাই বুঝি চোখে মুখে ফুটে আছে 'আয় দেখি' ভঙ্গী
ওগো ফিঙে জঙ্গী,
পুচ্ছেতে এক জোড়া
বাঁকা বাঁকা কালো ছোরা
শাণিত
জবাব তখুনি দেবে যদি কেউ করে অপমানিত।
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

আঁধার রজনী-শেষে আলোর আভাস যবে ঝলকে
প্রেয়সীর দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের সুর তোলে বল কে
মেকি কি মেকি কি তুমি বল বল জীবনের সঙ্গী—
ওগো ফিঙে রঙ্গী

তখন যে গাও গান
ওঠে রসিকের প্রাণ
মাতিয়া
রাগে আর অনুরাগে প্রেয়সীও ওঠে বুঝি তাতিয়া
ওগো ফিঙে, ওগো ফিঙে, ফিঙে গো—

কবিতাটা লিখে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন দূরে। হঠাৎ মনে হ'ল, বসন্তের আগমনে সমস্ত প্রকৃতি উৎসবে মেতেছে, কর্ণিকার ফুলের কি অদ্ভুত স্বর্ণকান্তি, অশোক-গুচ্ছের কি রূপ!

কু-কুক্-কুক্-কুক্—

কলকণ্ঠে সাড়া দিয়ে উড়ে গেল একটা স্ত্রী-কোকিল। সূর্যের সোনালী আলোয় ঝলমল ক'রে উঠল তার জংলা শাড়িখানা।

মন্দাকিনী এক কাপ দুধ হাতে ক'রে প্রবেশ করলেন।

"বুঝলে, সুন্দরীর দুধ আজকাল এত ঘন হয়েছে যে, চড়িয়ে উনুন-গোড়া থেকে নড়বার জো নেই, সঙ্গে সঙ্গে তলা ধ'রে যাবে"

"ডালটা পুড়ে গেল?"

"না। খুব বেঁচে গেছে"

মন্দাকিনীর মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটে উঠল।

কবি দুধের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "বামুনটা রাখ, কত আর খাটবে?"

"তুমি বোঝ না, রাখব কি ক'রে, মাইনে দিতে হবে তো একটি কাঁড়ি?"

"কিছু টাকার যোগাড় হয়েছে"

"কোথা থেকে?"

"আমি রঘুবংশ আর কুমারসম্ভবের যে নোট লিখেছিলাম গেল বছর, সে দুটো একজন ছাপাতে চায়, মাসে আমাকে আশি টাকা ক'রে দেবে বলছে"

খুব খুশি হলেন মন্দাকিনী এ সংবাদে।

"তবে রাখ। মাইনে ঠিক করেছ কিছু?"

"না। তুমিই যা হয় কর না গিয়ে"

সানন্দে মন্দাকিনী নীচে নেমে গেলেন।

কবিও বাইনাকুলার নিয়ে বেরুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে অমরবাবুর চাকর মুন্সি এসে গোটা দুই বই দিলে তাঁর হাতে। অমরবাবু একটা ছোট চিঠিও লিখেছেন,—এই বই দুটো উলটে পালটে দেখবেন। সাধারণ পাখিদের অনেক খবর আছে এতে। আমাদের বাড়ির সামনে 'চোখ গেল' খুব ডাকছে। পাখিটাকে দেখতে পাই নি এখনও। একটু খুঁজলেই দেখতে পাওয়া যাবে। দেখতে চান তো আসুন।

কবি বই দুটো টেবিলে রেখে বেরিয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে।

৫

রূপচাঁদ মৌলিক আপিসে বেরিয়ে গেছেন। বকুলবালা নিজের ঘরে তন্ময় হয়ে ব'সে আছেন তাঁর নূতন খেলনাটি নিয়ে। কাল রূপচাঁদ হলদে পাখিটি এনে দিয়েছেন তাঁকে। আনন্দবাবু যে কবিতাটা লিখে দিয়েছেন সেটা বড় বড় ক'রে লিখে দিয়ে গেছেন রূপচাঁদ একটা কাগজে। কিন্তু কবিতাটা বড়—অত বড় কাগজ খাঁচায় ঠিক সাঁটা যাচ্ছে না। বকুলবালা শেষে ঠিক করলেন কাগজটা দেওয়ালে ছবির মত ক'রে টাঙিয়ে দেবেন। টাঙিয়ে তার পাশে খাঁচাটা টাঙিয়ে দেবেন। অনেক খুঁজে খুঁজে পেরেক বার করলেন চারটে। তারপর রান্নাঘর থেকে নোড়া নিয়ে এলেন। নোড়া দিয়ে পেরেক ঠুকতে গিয়ে আঙুলে লাগল দু-একবার। কিন্তু বকুলবালার তাতে গ্রাহ্য নেই। অনেক কষ্টে হেঁট হয়ে হয়ে চারটে পেরেকই ঠুকে ফেললেন তিনি। কিন্তু ঘরের দেওয়াল পাকা

ভাল ক'রে ঠোকা গেল না, ঠোকবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা পেরেক প'ড়ে গেল, কবিতার কাগজটা বেঁকে গেল। রোখ চ'ড়ে উঠল বকুলবালার। খানিকটা ময়দা বার ক'রে গুললেন প্রকাণ্ড এক অ্যালুমিনিয়ামের বাটিতে, তারপর ঘুঁটে জ্বেলে উনুনটা ধরিয়ে ফেললেন। ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে জল পড়তে লাগল। কিন্তু এসবে নিরস্ত হবার পাত্রী বকুলবালা নন। একবার যখন ঝোঁক উঠেছে কাগজটাকে সাঁটতে হবে, তখন না সেঁটে কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। আঠা হয়ে গেল। কিন্তু ভয়ানক গরম। বাটিটাকে সাঁড়াশি দিয়ে এক চৌবাচ্চা জলের উপর ধ'রে রইলেন। সমস্ত চৌবাচ্চার জলটা যে কালো ভুসোতে ভ'রে গেল সেদিকে খেয়াল নেই। একটু ঠাণ্ডা হতেই তুলে নিয়ে এলেন সেটাকে, হাত দিয়ে দেখলেন, বাটিটা ঠাণ্ডা হয়েছে বটে, কিন্তু আঠা এখনও বেশ গরম। কতক্ষণ চৌবাচ্চায় ডুবিয়ে রাখবেন তিনি? উঠে গিয়ে মশারির চাল থেকে পাখাটা নিয়ে এলেন—পাখার বাঁট দিয়ে দিয়ে আঠা মাখাতে লাগলেন কাগজটায়। খুব বেশি ক'রে ক'রে লাগিয়ে দেওয়ালে সেঁটে দিলেন কাগজটা। তারপর একটু দূরে স'রে গিয়ে দেখলেন। বাঃ চমৎকার হয়েছে, আনন্দে হাততালি দিয়ে আপনার মনেই নেচে উঠলেন একবার। কিন্তু ওখানে খাঁচাটাকে টাঙাবেন কি ক'রে? ওখানে তো খাঁচা টাঙানো যাবে না। কি করা যায়? ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর এক ছুটে ঘরের মধ্যে চ'লে গেলেন। ঘরের ভিতর রূপচাঁদের রিভল্‌ভিং বুক-শেল্‌ফ্ ছিল একটা। বেশ উঁচু। সমস্ত বইগুলো বার ক'রে স্তূপীকৃত করলেন মেঝের উপর। তারপর হিড়হিড় ক'রে বুক-শেল্‌ফটাকে টেনে নিয়ে গেলেন বাইরে, দেওয়ালে যেখানটায় কবিতা লেখা কাগজটা সাঁটা ছিল সেইখানে। উঃ, ভারী কি কম! জগদ্দল পাথর যেন একটা। হাঁপাতে লাগলেন। বিরক্তি ফুটে উঠল সারা মুখে। কিন্তু খাঁচাটা তার উপর রাখতেই আনন্দে হেসে উঠল আবার চোখ দুটি। কি চমৎকারই না

দেখাচ্ছে! বাঃ! রিভল্‌ভিং শেল্‌ফটা ঘোরালে কিন্তু ভয় পাচ্ছে পাখিটা।

"ভয় লাগছে বুঝি? আচ্ছা, আর ঘোরাব না"

খাঁচার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মুচকি হেসে সান্ত্বনা দিলেন তাকে বকুলবালা।

"কই, কথা বল একটা, শুনি!"

পাখির কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

"কথা বলবে না?"

তবু কোন উচ্চবাচ্য করে না বেনে-বউ।

"ও বাবা, রাঙা মূলো নাকি তুমি?"

পাখি নীরব।

"ভাব করবে না আমার সঙ্গে?"

বেনে-বউ ভাব করবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ করলে না।

"এমনই গোমড়া মুখ ক'রে ব'সে থাকবে নাকি রাতদিন? তবেই তো হয়েছে! আমার মদনলাল খুব লক্ষ্মী—মদনলাল, তোমার কথা শুনিয়ে দাও তো ওকে"

বারান্দার কোণে লোহার খাঁচায় মদনলাল ব'সে ছিল লোম ফুলিয়ে চোখ বুজে। প্রবীণ একটি চন্দনা। ডাক শুনে চোখ খুললে।

"কথা শুনিয়ে দাও ওকে। বল—"

মদনলাল চোখ মিটমিট করতে লাগল, তারপর ব'লে উঠল হঠাৎ, "শিউজি, গোটি পী যাও, গোটি পী যাও, শিউজি, গোটি পী যাও—"

পশ্চিমের একজন কন্‌স্টেব্‌ল চন্দনাটিকে এই বুলি শিখিয়েছিল।

"শুনলে তো? তুমিও কথা বল একটি, শুনি"

বেনে-বউ গম্ভীর হয়ে রইল, একটি কথা বললে না।

"খিদে পেয়েছে নাকি? খাবে? দিচ্ছি, দাঁড়াও, ভাল পেঁপে আছে। পেঁপে খেয়ে কথা বলতে হবে কিন্তু"

একটা পেঁপে বার ক'রে কাটতে ব'সে গেলেন বকুলবালা।

পেঁপে কাটতে দেখে তাঁর সব পাখিগুলোই চঞ্চল হয়ে উঠল। দাঁড়ের উপর দুলতে লাগল টিয়াটা। ময়নাটা ব'লে উঠল, 'ওগো, শুনছ!' বুলবুলির কণ্ঠে ফুটে উঠল কুটুর কুটুর আওয়াজ। শ্যামা শিস দিয়ে উঠল। 'শিউজি, গোটি পী যাও'—মদনলাল নিজের কৃতিত্ব জাহির করলে আবার। তাদের দিকে একটা রোষদৃষ্টি হেনে বকুলবালা বললেন, "এখুনি তো খেয়েছ সব, আগে ওকে দিই, তারপর তোমাদের দিচ্ছি"

পেঁপে খেয়ে বেনে-বউ কিন্তু উল্লসিত হ'ল না তেমন। একবার ঠুকরে দেখলে, তারপর ব'সে রইল চুপ ক'রে। বকুলবালা তাঁর প্রত্যেক পাখিকে এক টুকরো ক'রে দিয়ে আবার এসে দাঁড়ালেন বেনে-বউয়ের খাঁচার সামনে।

"কই, খাচ্ছ না যে তুমি? পেঁপে ভাল লাগে না বুঝি? আমার মতন অবস্থা বুঝি তোমার? আমারও ভাল লাগে না পেঁপে। লজেঞ্জ খাবে? চকোলেট?"

ছুটে গিয়ে ঘরের ভিতর থেকে লজেঞ্জ আর চকোলেট নিয়ে এলেন।

"এই নাও"

একটা লজেঞ্জ আর একটা চকোলেট খাঁচার মধ্যে ফেলে দিলেন। বেনে-বউ নির্বিকার।

"এও খাবে না? ও বাবা! বুঝেছি, আসলে তোমার দুষ্টুমি। কিছু শুনছি না আর। কথা বল এবার। বল না একটা কথা। বল, লক্ষ্মীটি"

বহুবার অনুরোধ ক'রেও বেনে-বউয়ের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ পেলেন না বকুলবালা। হঠাৎ রাগ হ'ল।

"তবে রে মুখপোড়া, আমাকে চিনিস না?"

পাখাটা তুলে ঘা কতক বসিয়ে দিলেন খাঁচারই উপর।

পাখিটা ত্রস্ত হয়ে উঠল, কিন্তু একটি শব্দ করলে না। পাখাটা ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে পাখিটার দিকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ বকুলবালা। তারপর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল হঠাৎ আবার। অমন সুন্দর পাখিটাকে কি বেশি নির্যাতন করা যায়? কিন্তু কি মুশকিল, কথা যদি না বলে, তা হ'লে ও পাখি নিয়ে কি হবে? পাখিটা বোবা নয় তো? মানুষের মধ্যে যেমন বোবা আছে, পাখিদের মধ্যেও হয়তো থাকে। হয়তো পাখিওলা ঠকিয়ে একটা বোবা পাখি বিক্রি ক'রে গেছে। আর একবার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন পাখিটার দিকে। কি চমৎকার গায়ের রঙ! হঠাৎ হিংসে হ'ল। বলে উঠলেন, "আমারও হলদে রঙের শাড়ি আছে, দামী রেশমী শাড়ি, তোর মত আমিও সাজতে পারি, দেখবি?" তৎক্ষণাৎ ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন বকুলবালা এবং হলদে শাড়িখানা বার ক'রে সত্যি সত্যি সাজতে ব'সে গেলেন। শাড়ি প'রে মাথার চুল আঁচড়ে এমনভাবে ফিতে দিয়ে বাঁধলেন যে, খানিকটা চুল গলায় এবং পিঠের উপর পড়ল গিয়ে। বেনে-বউয়ের মাথা আর গলার কাছটা যেমন কালো, অনেকটা তেমনই দেখাতে লাগল। তারপর ঠোঁটে রঙ দিলেন বেশ ভাল ক'রে। টুকটুকে হ'ল ঠোঁট দুটি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে দেখলেন খানিকক্ষণ। তারপর রূপচাঁদের কালো মাফলারটা বার ক'রে সেটা কোমরে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন দু পাশ দিয়ে, তারপর বেরিয়ে গিয়ে বাইরে চৌকিটার উপর উপুড় হয়ে পাখির মত ব'সে বেনে-বউকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "এই দেখ, তোমার চেয়ে কিছু কি খারাপ দেখাচ্ছে আমাকে? এস, এইবার ভাব কর আমার সঙ্গে। কথা বল একটি"।

বেনে-বউ তবু কথা বলে না।

এইবার কবিতাটার দিকে নজর পড়ল বকুলবালার। তাঁর মনে হ'ল, ওর সম্বন্ধে যে কবিতাটা লেখা হয়েছে, সেটা তো শোনানো

হয় নি ওকে! তাই অভিমান ক'রে ব'সে আছে নাকি? কিন্তু কবিতা কি ক'রে প'ড়ে শোনাবেন এখন? তিনি তো পড়তে জানেন না! হঠাৎ একটা গভীর বেদনায় টনটন ক'রে উঠল সমস্ত মনটা। কবিতাটা রূপচাঁদ প'ড়ে শুনিয়েছিলেন তাঁকে—মনে করবার চেষ্টা করলেন লাইনগুলো। 'কও না কথা হলদে পাখি'—এই লাইনটা মনে পড়ল শুধু। আর কিছু মনে পড়ল না। কেমন একটা অস্বস্তি লাগল, উঠে পড়লেন তিনি। মনের ভিতর কি যে হচ্ছে তা প্রকাশ করবার ভাষা নেই। উঠোনে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। নির্মল নীল আকাশ। রাস্তার ওধারে বটগাছটার পাতা ঝ'রে ঝ'রে পড়ছে, শিশুগাছটা ভ'রে উঠেছে কচি কচি শ্যাম কিশলয়ে, উঠোনের আমগাছটায় অজস্র মুকুল ধরেছে, যেন পাতার আড়াল থেকে উঁকি মারছে কারা—মুখ দেখা যাচ্ছে না, সোনালি চুলগুলো দেখা যাচ্ছে শুধু। মৌমাছির ঝাঁক উড়ছে, বোলতা উড়ছে, চিল উড়ছে উঁচুতে,...সবাই উড়ছে। বসন্তের হাওয়া বইছে। বকুলবালার সমস্ত অন্তঃকরণ ছটফট করতে লাগল একটা কারাগারের মধ্যে। কবিতাটা পড়তে না-পারার বেদনায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি, হয়তো ছুটে বেরিয়ে পড়তেন বাইরে। গাড়ি ডাকিয়ে চ'লে যেতেন রূপচাঁদের আপিসে তাঁকে ডেকে আনবার জন্যে। কিন্তু তার আর দরকার হ'ল না—চণ্ডী এসে পড়ল। স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছে চণ্ডী। পাখিওলার কাছ থেকে পরশু সে শুনেছে যে, হলদে পাখিটা রূপচাঁদবাবু কিনেছেন। পাখিওলা যখন রাস্তা দিয়ে যেত, প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে অনেকদিন দেখেছে সে এই হলদে পাখিটাকে।

"মাসীমা, আপনারা আর একটা পাখি কিনেছেন নাকি?"

"কে, চণ্ডী এসেছিস? ভালই হয়েছে।"

বকুলবালার বেশ দেখে চণ্ডী বললে, "আপনি কোথাও বেরুচ্ছেন নাকি?"

"না। এমনই পরেছি। পোড়ারমুখো পাখিকে দেখাচ্ছিলাম যে, হলদে শাড়ি আমারও আছে"

"সুন্দর পাখিটা, নয়?"—চণ্ডী সাগ্রহে খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"একটি কথা কইছে না কিন্তু। কবিতাটা পড়্‌তো"

"কোন্ কবিতা?"

"ওই যে দেওয়ালে সাঁটা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছিস না? ওর বিষয়েই কবিতা, আনন্দবাবু লিখে দিয়েছেন"

"ও"

চণ্ডী সোৎসাহে এগিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল কবিতাটা।

"চেঁচিয়ে পড়্‌না!"

চণ্ডী চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তে লাগল। তার সঙ্গে আবৃত্তি ক'রে যেতে লাগলেন বকুলবালা।

কও না কথা কও না কথা
কও না কথা হলদে পাখি
সোনার বরণ সুরের সাকী
চলবে না তো আর চালাকি
ধরা যখন প'ড়েই গেছ
নামটি তোমার বলবে না কি
কও না কথা হলদে পাখি।

যে কথাটি ঢাকছ কেবল
নানান ছলে নানান সুরে
সেই কথাটি শুনতে যে চাই
আজকে তোমায় খাঁচায় পুরে।

রঙটি গায়ে কলকে ফুলের
কুচকুচে রঙ মাথার চুলের
মনের কথাও রূপকথা কি ?
চুপটি ক'রে ছলবে নাকি
কও না কথা হলদে পাখি।

শর্ষে ফুলের স্বপ্ন ওগো
পদ্মফুলের বুকের রতন
সোনার কাঠির পরশ পেয়ে
রঙ হ'ল কি সোনার মতন।

তোমার তরেই চাঁদ সদাগর
পার হ'ল কি সাতটা সাগর
বিশ্ব উজল যে দীপ-শিখায়
তুমিই কি তার সলতে নাকি
কও না কথা হলদে পাখি।

তুজনে মিলে বার বার আবৃত্তি করতে লাগলেন কবিতাটা। আম্রমুকুলগন্ধমদির বসন্ত-দ্বিপ্রহর ছন্দভরে কাঁপতে লাগল যেন।

"ট্যিউ—"

হঠাৎ মিষ্টি স্থুরে ডেকে উঠল বেনে-বউ।

হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন বকুলবালা।

ঘর্মাক্ত কলেবরে রূপচাঁদ যখন আপিস থেকে ফিরছিলেন, তখনও বেশ বেলা রয়েছে। তাঁর বাঁ হাতে একটি পুঁটলি। পুলিস সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার রহমান মিঞা একটি তুর্লভ জিনিস উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে। কেপন—খাসি মুরগি। আপিসেরই চাপরাসীকে দিয়ে মুরগিটি জবাই করিয়ে কুটিয়ে মাংসের টুকরোগুলি নিপুণভাবে

কাগজে মুড়ে রুমালে বেঁধে নিয়ে আসছিলেন তিনি। ইচ্ছে ছিল, নিজেই রাঁধবেন। বাজার থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় মসলাও কিনে এনেছিলেন। বাড়িতে ঢুকতেই বকুলবালা ছুটে এলেন। তখনও তাঁর পরনে সেই হলদে কাপড়। ঠোঁটের লাল রঙ ঠোঁটেই নিবদ্ধ নেই, গালে এবং চিবুকেও লেগেছে। পরিবারের অসাধারণ প্রসাধন দেখে বিস্মিত হলেন রূপচাঁদ, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। বরং চোখমুখে এমন একটা ভাব প্রকাশ করলেন, যার অর্থ—কি অদ্ভুত রূপসী তুমি, কি চমৎকার মানিয়েছে তোমায়! বকুলবালা কিন্তু এসব সূক্ষ্ম ভাবের ধার দিয়েও গেলেন না। অন্য জগতেই ছিলেন যেন তখন। রূপচাঁদকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

"কি শয়তান তোমার ওই বেনে-বউ! উঃ, কম জ্বালানটা জ্বালিয়েছে আমায় সমস্ত দিন!"

"কেন, কি হ'ল ?"

"প্রথমে তো মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে রইল। একটি কথা কইবে না, কত সাধ্যসাধনা—কিছুতে না"

রূপচাঁদ ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সমস্ত বই মেঝের উপর স্তূপীকৃত।

"এ কি করেছ ?"

খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন বকুলবালা, তারপর রূপচাঁদের হাত ধ'রে হিড়-হিড় ক'রে টানতে টানতে বললেন, "বাইরে দেখবে চল না, কি করেছি! কম খোশামোদ করেছি তোমার পাখির ?"

রূপচাঁদের সর্বাঙ্গ জ্ব'লে উঠেছিল, কিন্তু হেসে বললেন, "এইটে রাখি দাঁড়াও আগে"

"কি ওতে ?"

"মাংস"

পুঁটলিটা কোণে রেখে দিয়ে বকুলবালার সঙ্গে বারান্দায় বেরিয়ে এসে রূপচাঁদ দেখলেন, তাঁর বুকশেল্ফের উপর পাখির খাঁচা রাখা

হয়েছে। দেওয়ালে কবিতা সাঁটা রয়েছে, তাও দেখলেন। সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে সোচ্ছ্বাসে ব'লে উঠলেন, "বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা করেছ তো! আমার মাথায় এত আসত না। সুন্দর হয়েছে!"

"তবু কি মন পেয়েছি তোমার পাখির! ওর মন ভোলাবার জন্যেই শেষে এই শাড়িটা পরলাম, তবু না। শেষকালে চণ্ডী এল, দুজনে মিলে ওই কবিতাটা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়লাম, তবে বাবুর মুখে কথা ফুটল, তাও একটি বার"

চণ্ডীর আগমনবার্তায় মনে মনে ঈষৎ অপ্রসন্ন হলেন পুলিস কর্মচারী রূপচাঁদ। বাইরের কোনও লোক বাড়িতে আসে, এ তিনি পছন্দ করেন না।

"চণ্ডী এসেছিল নাকি? বেশি আমল দিও না ওকে"

"কেন?"

"ছোঁড়াটা চোর শুনেছি"

অসঙ্কোচে মিথ্যা কথাটা বললেন রূপচাঁদ।

"তাই নাকি?"

বকুলবালা চোখ বড় বড় ক'রে চেয়ে রইলেন।

প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হবার জন্যে রূপচাঁদ বললেন, "তোলা-উনুনটাতে আঁচ দাও। আমিই মাংস রাঁধব আজ"

"তোলা-উনুনে কেন?"

"মুরগির মাংস যে"

"ও!"

বকুলবালা মুরগির মাংস খান, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকতে দেন না। বকুলবালা তোলা-উনুনটা বার করলেন কোণ থেকে।

"উঃ, এর মধ্যেই কি রকম গরম প'ড়ে গেছে দেখেছ? পাখাটা এখানে প'ড়ে কেন?"

পাখাটা তুলে হাওয়া করতে যেতে ময়দার আঠা লেগে গেল হাতময়।

"এ কি, এতে লেগে আছে কি ?"

"ও ! আঠা লাগিয়েছিলাম ওটা দিয়ে। কবিতাটা দেওয়ালে লাগাবার জন্যে আঠা করেছিলাম যে। তোমার পাখির জন্যে কম ভোগান ভুগতে হয়েছে আজ !"

ক্রোধে কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল রূপচাঁদের। মুখে কিন্তু সুমিষ্ট হাসি ফুটিয়ে বললেন, "করতেও পার এত !"

উত্তরে বকুলবালাও হাসলেন। রূপচাঁদ ঘরে ঢুকে জামা জুতো ছেড়ে বেরিয়ে এলেন আবার। বকুলবালা তোলা-উনুনে ঘুঁটে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছিলেন। হঠাৎ আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল তাঁর।

"কম দুষ্টু তোমার বেনে-বউ। কবিতা শোনবার পর 'টিউ' ক'রে ছোট্ট একটি শব্দ করেছিল খালি। তারপর অনেক সাধ্যসাধনা করলাম, না রাম না গঙ্গা, কিচ্ছু বললে না। এই একটু আগে, পরোটা বেলছি, হঠাৎ ব'লে উঠল, 'ওকি ওকি ও'! কি দুষ্টু বল তো—তার মানে, পেঁপে খেয়েছি, ছাতু খেয়েছি, পরোটাও চাই একটু। পরোটা দিলাম, খেলে না, ওর মন পাওয়া ভার"

আনন্দে আত্মহারা হয়ে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

একটু মুচকি হেসে সংযতবাণী রূপচাঁদ বললেন, "আস্তে আস্তে ভাব হবে। তোমার মন পেতে আমাকেও কম বেগ পেতে হয় নি"

"আহা !"

কোঁপকটাক্ষে স্বামীর দিকে একবার চেয়ে ঘুঁটেয় কেরোসিন ঢালতে লাগলেন বকুলবালা। মাথায় জবাকুসুম মেখে চৌবাচ্চার দিকে অগ্রসর হলেন রূপচাঁদ। স্নান ক'রে চা জলখাবার খেয়ে মাংস রাঁধতে বসবেন।

"এ কি, চৌবাচ্চার জলে কালো কালো এসব ভাসছে কি ?"

"কই ? ও, অ্যালুমিনিয়ামের গরম বাটিটা ঠাণ্ডা করবার জন্যে চৌবাচ্চায় বসিয়েছিলাম। দাঁড়াও, ঠিক ক'রে দিই"

তাড়াতাড়ি এসে বকুলবালা হাত দিয়ে ভাসমান ভুসোগুলোকে

সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু সমস্ত জলটাই ঘুলিয়ে উঠল তাতে। রূপচাঁদের মনের ক্রোধাগ্নি দাউদাউ ক'রে জ্বলছিল।

কিন্তু খুব শান্তকণ্ঠে তিনি বললেন, "থাক্, আমি জল তুলেই স্নান করছি"

কেবল ব্রহ্মচারীর নয়, চার্বাকপন্থীরও সংযম দরকার সিদ্ধিলাভের জন্য।

স্বহস্তে ইঁদারা থেকে জল তুলে স্নান সেরে যখন ফিরে এলেন, তখন ঘুঁটের ধোঁয়ায় চারিদিক ভ'রে গেছে, তার মধ্যে দগদগে হলদে কাপড়-পরা বকুলবালা ব'সে চা ছাঁকছেন। রূপচাঁদের মনে হঠাৎ একটা গানের একটা লাইন ভেসে এল, 'ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে'। যে স্বর্গলোকে সে ডানা মেলে উড়তে চায়, সেখানে পৌঁছতে হ'লে অনেক নালা নর্দমা আঁস্তাকুড় পার হতে হবে, দ'মে গেলে চলবে না।

"দেখ, মাংসটা আজ ভাল ক'রে রাঁধব। অমরেশকে দিয়ে আসব একটু। সে আমার হাতের রান্না খেতে চেয়েছে। ঘি আছে তো?"

"আছে। মসলা কি কি চাই?"

"বলছি"

টিফিন-কেরিয়ারটি হাতে ক'রে খাওয়া-দাওয়া সেরে রূপচাঁদ যখন বেরুলেন, তখন রাত্রি নটা বেজে গেছে। পূর্ববন্দোবস্তমত কন্স্টেব্ল্ রামখেলাওন মিশির এসে বারান্দায় শুয়েছে বকুলবালার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। রূপচাঁদ বকুলবালাকে বলেছেন যে, অমরেশ-বাবুর বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরে আসতে রাত হবে তাঁর।

অন্ধকার গলি জনবিরল হয়ে এসেছে। রূপচাঁদবাবুর পায়ে কেড্স্। নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি। মনের মধ্যে অদ্ভুত ভাব জাগছে একটা। দুঃসাহসী হিমালয়-আরোহীর মনে যে ধরনের ভাব জাগে, অনেকটা সেই রকম। হিমালয়-আরোহী জানে

যে, হয়তো তার অভিযান ব্যর্থ হবে, হয়তো সে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে উঠতে পারবে না, কিন্তু যদি পেরে যায়! ওই 'যদি'টা আলেয়ার মত প্রলুব্ধ ক'রে নিয়ে যায় তাকে দুর্গম পথে। তা ছাড়া, সাফল্য যদি না-ও হয়, অভিযান করার মধ্যেই কি আনন্দ নেই? ভয় জিনিসটার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে একটা। অনিশ্চয়তার মধ্যে অপ্রত্যাশিতের চমকপ্রদ যে সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন থাকে, তার আহ্বানে, ছুটে যেতে চায় মন। কোন কষ্টকেই কষ্ট ব'লে মনে হয় না তার, বরং বাধা যত দুরতিক্রম্য হয়, সে তত যেন আকুল হয়ে ওঠে, শক্তি তত যেন সংহত হয়, জেদ তত যেন চ'ড়ে ওঠে। অজানার আহ্বান নূতনের প্রলোভন সুরার মত সঞ্চরণ ক'রে বেড়ায় তার দেহে মনে স্বপ্নে কল্পনায়। বাইরের নানা বাধা অতিক্রম ক'রে কাম্যলোকে পৌঁছবার ঢের আগেই তার সমস্ত সত্তা কল্পনায় পৌঁছে যায় সেখানে, এবং পৌঁছে গিয়ে যে আনন্দ পায়, তারই আবেগে সে হাসিমুখে অতিক্রম করে সমস্ত বাধা। তার কৃচ্ছ্র সাধন ব্রহ্মলোলুপ তপস্বীর কৃচ্ছ্র সাধনের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। তার লক্ষ্য আলাদা, পথও তাই আলাদা। নিজের স্বর্গলোকে সেও মুক্তি পেতে চায়। তার মনও ডানা মেলেছে—বহুবর্ণবিচিত্র রূপ-রস-রঙের লীলাতীর্থে, মৃন্ময়ী ধরণীর মহিমালোকে—সূক্ষ্ম অবাস্তবে নয়, স্থূল বাস্তবে: পরোক্ষে নয়, প্রত্যক্ষে। পথ পিচ্ছিল, পর্বত দুরারোহ, সমুদ্র দুস্তর, কণ্টক কঙ্কর কর্দম—বাধার অন্ত নেই। কামনারও অন্ত নেই।

অন্ধকারে হঠাৎ খুব জোরে একটা হোঁচট খেলেন রূপচাঁদ। পায়ের বুড়ো-আঙুলটায় খুব জোরে লাগল জুতো থাকা সত্ত্বেও। সামলে নিয়ে আবার চলতে লাগলেন। বলা বাহুল্য অমরেশের কাছে যাচ্ছিলেন না তিনি, যাচ্ছিলেন ডানার কাছে।

অন্ধকার চতুর্দিকে। নদীতীরের বন-জঙ্গল থেকে অবিরাম ঝিল্লীধ্বনি হিল্লোলিত ক'রে তুলছে অন্ধকারকে। অন্ধকার সমুদ্রে অসংখ্য সুরের উর্মি ছন্দিত হয়ে উঠছে যেন, স্পন্দিত করছে নক্ষত্র-কুলকেও। সন্ন্যাসী স্থির হয়ে ব'সে ছিলেন এতক্ষণ আনন্দময় স্তব্ধতার মধ্যে। চরাচরব্যাপী সঙ্গীতের স্পর্শ তাঁকেও আত্মহারা ক'রে তুলল ক্রমশ। হঠাৎ তিনিও গান গেয়ে উঠলেন। মীরার একটা ভজন রূপায়িত হয়ে উঠল তাঁর মনে।

চিতনন্দন আগে নাচুংগী
নাচ নাচ পিয়তম হিঁ রিঝাউ
প্রেমী জনকো জাচুংগী ॥
প্রেম প্রীতকা বাঁধ ঘুংঘরা
সুরতকী কছনী কাছুংগী।
লোক লাজ কুলকী মরজাদা
য়া মৈঁ এক ন রাখুংগী
পিয়াকে পলংগা জা পৌঢ়ুংগী
মীরা হরিরংগ রাচুংগী ॥

তাঁর উদাত্ত অনুপম কণ্ঠে ভ'রে উঠল চারিদিক। পাগলিনী মীরাই যেন অন্ধকারে খুঁজে বেড়াতে লাগল তার চিতনন্দন প্রিয়তমকে। অন্ধকারের স্তরে স্তরে, গঙ্গার কূলে কূলে, বনস্পতির শাখায় শাখায়, আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রে সেই সন্ধানের সূক্ষ্ম তীব্র আকুতি সঞ্চারিত হ'ল যেন। ঘুরে বেড়াতে লাগল নামহীন সমুদ্রের সৈকতে সৈকতে। সন্ন্যাসীর গান থেমে গেল কিছুক্ষণ পরে, কিন্তু আকুতি থামল না। তার অবাঙ্‌ময় আবেদন সূক্ষ্মতর হয়ে অনুপ্রবিষ্ট হ'ল বিশ্বের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, ঘনিষ্ঠতর হয়ে গেল নিবিড়তায়, তীব্রতর হয়ে উঠল অনুভূতিলোকে। চোখ বুজে ব'সে রইলেন তিনি। অনেকক্ষণ

ব'সে রইলেন। যখন চোখ খুললেন, তখন দেখতে পেলেন, ভাঙা সিঁড়িটার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

"কে ?"

"আমি। আপনার গান শুনছিলাম"

ডানা এগিয়ে এসে প্রণাম করলে সন্ন্যাসীকে। তার হঠাৎ কেমন যেন মনে হ'ল, এ ব্যক্তিটি প্রণম্য।

"থাক্ থাক্"—সঙ্কুচিতভাবে সরে গেলেন সন্ন্যাসী। উঠে দাঁড়ালেন। বিব্রত বোধ করলেন একটু।

"যে গানটা গাইছিলেন, সেটা ভজন, নয় ?"

"হ্যাঁ, মীরার ভজন"

"গানের কথাগুলো খুব মিষ্টি, কিন্তু মানে বুঝতে পারলাম না ভাল"

সন্ন্যাসী নীরব হয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "এই যে ঝিল্লীর সঙ্গীত, এর কি মানে বুঝতে পার ?"

"আমি বুঝতে না পারলেও ঝিল্লীরা বুঝতে পারে নিশ্চয়"

"কিন্তু তুমি তো ঝিল্লী নও, তুমি মানুষ। তোমার বোঝায় আর ঝিল্লীর বোঝায় তফাত থাকবে না ? ঝিল্লী ওর এক রকম মানেই জানে, কিন্তু তুমি ওর হাজার রকম মানে বার করতে পার, সে শক্তি সে স্বাধীনতা দিয়েছেন তোমাকে ভগবান"

হঠাৎ একটা নূতন জগতে প্রবেশ ক'রে ডানা যেন স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। সন্ন্যাসীও চুপ করে রইলেন। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ঘনিয়ে আসছিল, এমন সময়ে ডানার চাকরটা এসে বললে যে সে গোয়ালা-বাড়ি থেকে দুধ আনতে যাচ্ছে। ঘর খোলা রইল। চাকরের আবির্ভাবে বিব্রত ভাবটা কেটে গেল উভয়েরই।

ডানা সপ্রতিভভাবে বললে, "আপনি আসবেন আমার ওখানে ? চলুন না, একদিনও তো যান নি"

"আমি ? আচ্ছা, চল"

ডানার পিছু পিছু সন্ন্যাসী চলতে লাগলেন। সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে ডানার মনে গোড়া থেকেই কেমন একটা কৌতূহল জেগেছে—কেমন যেন অস্পষ্ট শ্রদ্ধা একটা। এতদিন নানা ছলে ওই ভাঙা ঘরটার আনাচে কানাচে ঘুরেছে সে, কিন্তু সোজাসুজি মুখ ফুটে নিমন্ত্রণ করতে পারে নি। আজ করতে পেরে যেন আনন্দিত হ'ল।

ঘরে ঢুকে ডানা বললে, "বসুন"

সন্ন্যাসী নির্বিকারভাবে মাটিতেই ব'সে পড়লেন।

"চেয়ারে আপনি বসেন না বুঝি?"

"না, আজকাল আর বসি না।" তারপর একটু হেসে বললেন, একটা ব্রত চলছে আমার—তুমি ব'স চেয়ারে"

"কম্বল পেতে দেব আপনাকে?"

"কম্বলে আপত্তি নেই। কিন্তু থাক্ না, কি দরকার?"

"আপনি মাটিতে ব'সে থাকবেন, আমি কি ক'রে চেয়ারে বসি?"

ডানা একটা কম্বল পেতে দিলে। সন্ন্যাসী তার উপর উঠে সলেন। ছোট একটা আসন পেতে ডানা বসল এক ধারে।

তারপর বললে, "আপনি এখনই স্বাধীনতা সম্বন্ধে কি যেন লছিলেন—"

"বলছিলাম, তুমি মানুষ, ওই ঝিল্লীর গানের যে-কোনও অর্থ করবার শক্তি এবং স্বাধীনতা আছে তোমার। ঝিল্লীর তা নেই। একমাত্র মানুষকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন ভগবান, সে যা ইচ্ছে করতে পারে, যা খুশি হতে পারে। তার সামনে অসংখ্য পথ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। সে ভাল হতে পারে, মন্দ হতে পারে, যে কোনও জিনিসকে যেমন খুশি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখতে পারে। এ স্বাধীনতা আর কারও নেই"

"কেন, পশুরাও তো কম স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় না?"

"পশুরা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। রাত্রি হ'লে তাকে ঘুমুতেই হবে, ইচ্ছে করলেও সে জেগে থাকতে পারে না। ক্ষুধার উদ্রেক হ'লেই

তবে সে খায়, অক্ষুধার সময় কিছুতেই তাকে খাওয়াতে পারবে না। মানুষ কিন্তু যখন ইচ্ছে ঘুমুতে পারে, যতক্ষণ খুশি জাগতে পারে। ক্ষুধা অক্ষুধা—কোন সময়েই তার খাওয়ার বাধা নেই, সামনে খাবার থাকতে স্বেচ্ছায় সে উপবাসও করতে পারে। অন্য কোন প্রাণী তা পারে না—”

হঠাৎ চুপ ক'রে গেলেন তিনি, কেমন যে স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। তারপর আপন মনেই বললেন, “সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে অপেক্ষা করছেন তিনি। জোর করেন না কখনও। অপেক্ষা করেন”

“কিসের অপেক্ষা ?”

“তুমি তাঁকেই নির্বাচন ক'রে নাও কি না, তারই অপেক্ষা। তোমার চোখের সামনে খুলে দিয়েছেন সীমাহীন ঐশ্বর্যভাণ্ডার, তোমার অন্তরে দিয়েছেন কামনা, মস্তিষ্কে দিয়েছেন বুদ্ধি। অনন্ত শক্তি দিয়ে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন অসংখ্য পথের মোহনায়, যে-কোনও পথ বেছে নেওয়ার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। অপেক্ষা করছেন, তুমি তাঁকেই বেছে নাও কি না।”

“এ রকম ধাঁধায় ফেলার মানে কি ?”

“জোর ক'রে দখল করায় কোনও আনন্দ নেই। তিনি আনন্দময়, আনন্দ ছাড়া অন্য কিছু কাম্য নেই তাঁর। তুমি যদি স্বেচ্ছায় তাঁকে বরণ ক'রে আনন্দ পাও, তা হ'লেই তাঁর আনন্দ। সত্যিকার আনন্দে ভণ্ডামির স্থান নেই, স্থান নেই জবরদস্তির। জবরদস্তির স্থান নেই ব'লেই বোধ হয় তিনি অন্য পথগুলোও মনোহর করেছেন, তাতেও দিয়েছেন কিছু কিছু আনন্দের খোরাক”

আবার চুপ করলেন তিনি। আবার ঘনিয়ে এল নীরবতা। স্পষ্ট হয়ে উঠল নদী-তীরের ঝিল্লীধ্বনি।

“আচ্ছা, একটা কথা মনে হচ্ছে, তিনিও কি লোলুপ ?”

ডানা এমন স্বরে কথাগুলো বললে যে, সন্ন্যাসীর মনে হ'ল,

সত্যিই তার প্রাণে জিজ্ঞাসা জেগেছে। মেয়েটির তীক্ষ্ণধীর পরিচয় পেয়ে মনে মনে আনন্দিতও হলেন তিনি। কিন্তু চুপ ক'রে রইলেন। যেন মনের গহনে তিনি উত্তর সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছেন—ডানার মনে হ'ল। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তিনিও লোলুপ। প্রেমের কাঙাল তিনি"।

"তবে শুনেছি যে, তিনি নিখুঁত নির্বিকার ?"

"তাও সত্য"

"ঠিক বুঝতে পারছি না"

"তীরের কাছে সমুদ্রের জল এক হাঁটু, আর একটু দূরে গেলে সেই সমুদ্রই অতলস্পর্শী—ছুটোই সত্য। সমুদ্র নীল এও যেমন সত্য, সমুদ্র নীল নয় তাও তেমনই সত্য। একটা ঘটিতে তুলে দেখ সমুদ্রের জল সাধারণ জলের মত। সামান্য সমুদ্রের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী সত্য যদি নিহিত হয়ে থাকতে পারে, তা হ'লে কোটি কোটি পর্বত-সমুদ্রের যিনি আকর, তাঁর মধ্যে সত্যের অনন্ত রূপের সন্ধান পাওয়া কি অসম্ভব ? তা ছাড়া নিজের অনন্ত রূপ তিনি দেখাচ্ছেন ব'লেই তুমি দেখতে পাচ্ছ"

"এ রকম পরস্পরবিরোধী সত্য দেখাবারই বা মানে কি ?"

"দেখাচ্ছেন বললে ঠিক বলা হয় না। তিনি নিজেই নিজের অনন্ত রূপ দেখছেন তোমার চোখ দিয়ে। উপভোগ করছেন সেটা। কবি যেমন নিজের কাব্যকে নব নব রূপে উপভোগ করেন বিভিন্ন রসিকের সমালোচনায়, তেমনই। তোমার ভিতর দিয়ে নিজেকেই আবিষ্কার করছেন তিনি বারংবার, কে জানে, হয়তো সংশোধনও করছেন নিজেকে। পুরাতন ছবিকে অবলুপ্ত ক'রে আঁকছেন নূতন ছবি, তাঁর রবারের সামান্য ঘষায় অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে পুরাতন সমুদ্র পর্বত, ঐতিহাসিক পড়ছে গিয়ে প্রাগৈতিহাসিকের পর্যায়ে, তুলির নূতন টানে ফুটে উঠছে আবার নব নব চিত্র, সৃষ্ট হচ্ছে নব নব লোকালয়, নব নব লোকপাল"

হঠাৎ আবার গান গেয়ে উঠলেন তিনি।

একৈকং জালং বহুধা বিকুর্বন্
অস্মিন ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ
ভূয়ঃ সৃষ্ট্বা পতয়স্তথেশঃ
সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা।

গান শেষ হ'লে চুপ ক'রে রইলেন তিনি।

ডানাও চুপ ক'রে রইল। বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গিয়েছিল সে। স্বল্পপরিচিত এই উদাসীন ব্যক্তিটির মধ্যে যে এত ঐশ্বর্য আছে, তা সে কল্পনাও করতে পারে নি। লোকটির ঔদাসীন্য প্রথমে কৌতূহলী করেছিল তাকে, তাঁর শুচিতা শ্রদ্ধান্বিতও করেছিল তারপর; কিন্তু এতটা সে প্রত্যাশা করতে পারে নি। নূতন আবেষ্টনীর আকাঙ্ক্ষা-অনিশ্চয়তার মধ্যে সে ততটা বিভ্রান্ত হয় নি। ভেবেছিল, নিরাপদ আশ্রয় কোথাও জুটে যাবেই একটা না একটা। বিপদে পড়েছিল সে নিজের মনকে নিয়ে। মনের পুরাতন আশ্রয় ছিন্ন হয়েছে, নূতন আশ্রয় পাওয়া যায় নি এখনও। কোথায় পাওয়া যাবে, কবে পাওয়া যাবে, কি রকম হবে সে আশ্রয়, কোন কিছুরই নিশ্চয়তা ছিল না। কল্পনা আকাশ-কুসুম সৃষ্টি করছিল নানা রকম। আদর্শও ঠিক হয় নি। আদর্শ ঠিক না হ'লেও অস্পষ্টভাবে যে আভাসটা তার চেতনায় আঁকা ছিল, তা সাধারণ বাঙালী নারীর গতানুগতিক জীবনেরই ছবি একটা। বিয়ে করবে, ঘরসংসার পাতবে, যুদ্ধ থেমে গেলে পৈতৃক সম্পত্তিও হয়তো ফিরে পাবে কিছুটা—এই ধরনেরই অনির্দিষ্ট চিত্র। নিখিল বিশ্বের বিধাতা যে তার চোখ দিয়ে নিজেকে দেখছেন, তার সমালোচনা শোনবার আশায় প্রতীক্ষা করছেন, তার রসবোধের কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচিয়ে নিতে চাইছেন—এ খবরটা শুধু যে অদ্ভুত রকম নূতন মনে হ'ল তার কাছে তা নয়, এর সত্যটা সহসা যেন মর্মে গিয়ে বিঁধল তার। সে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল। মনে

হ'ল, সে নিজেকে অত ছোট ক'রে ভাবছে কেন? মনে প'ড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা—

আমি নারী আমি মহীয়সী
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নারাতে নিদ্রাবিহীন শশী
আমি নইলে মিথ্যে হ'ত আকাশে চাঁদ ওঠা
মিথ্যে হ'ত কাননে ফুল ফোটা

মাটির ধূলিকণা থেকে আরম্ভ ক'রে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত সবাই প্রত্যাশাভরে তাঁরই জন্যে সেজে ব'সে আছে, এ কথা বিশ্বাস করলে নিজের দৈন্যবোধ আর থাকে না। সমস্ত মন আনন্দে ভ'রে ওঠে। এই আনন্দেই বোধ হয় ভ'রে উঠেছিল মীরার মন।

"মীরার যে ভজনটা আপনি গাইছিলেন এখনই, তারও বক্তব্য কি এই?"

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, "এ ছাড়া পৃথিবীতে আর কোনও বক্তব্য নেই। কেবল বলবার ধরনটা প্রত্যেকের আলাদা, কারণ প্রত্যেকে তাঁকে নিজের মত ক'রে দেখতে চাইছে, আসলে তিনি নিজেই নিজেকে নানাভাবে দেখছেন। মীরা যখন বলছেন, হে প্রিয়তম, হে চিতনন্দন, আমি পায়ে প্রেমের নূপুর প'রে, গায়ে অনুরাগের বসন জড়িয়ে, লোক-লজ্জা কুলমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তোমার সামনে নৃত্য করব, তোমার প্রেমকীর্তন করব, তোমার শয্যা আশ্রয় করব,—তখন বুঝতে হবে ভগবানেরই লীলা সেটা, মীরার মুখ দিয়ে নিজের একটা অভিব্যক্তি তিনি ব্যক্ত করছেন। তার প্রমাণ চোখ মেলে দেখলেই দেখতে পাবে। ওই দেখ, সুনীল আকাশ-প্রাঙ্গণে নৃত্যপরা হয়ে উঠেছে কোন্ পূজারিণী, বেজে চলেছে তার নূপুর, লুটিয়ে পড়েছে তার প্রেমাঞ্চল, কীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠছে দশদিক, তোমার মুখের দিকে আকুলনয়নে চেয়ে আছেন তিনি। ওই একই কথা বলেছেন আমাদের রবীন্দ্রনাথও আর এক ধরনে—"

হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন আবার সন্ন্যাসী—

আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে
তোমার সূর্য চন্দ্র তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে
কত কালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে—

গানটা কিন্তু সমাপ্ত হ'ল না। হতে পারল না। হঠাৎ দ্বার ঠেলে রূপচাঁদ প্রবেশ করলেন মাংসপূর্ণ টিফিন-কেরিয়ার হাতে নিয়ে। সন্ন্যাসীর দিকে এক নজর চেয়ে টিফিন-কেরিয়ারটা নামিয়ে রাখলেন তিনি ঘরের কোণে। তারপর ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "টিঞ্চার আইয়োডিন আছে তোমার কাছে ?"

"না, কেন বলুন তো ?"

"হোঁচট খেয়ে আঙুলটায় লেগেছে বড্ড"

সন্ন্যাসী হঠাৎ উঠে পড়লেন। নমস্কার ক'রে বললেন, "আচ্ছা, আমি এখন চলি তবে।"

উঠে বেরিয়ে গেলেন। অকারণে ডানার কান দুটো গরম হয়ে উঠল। তবু সে আত্মসম্বরণ ক'রে লণ্ঠনটা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দেখতে লাগল।

"খুব বেশি লেগেছে নাকি ? ইস, জুতোটা রক্তে ভিজে গেছে দেখছি যে! খুলে ফেলুন। এত রাত্রে আসবার কি দরকার ছিল অন্ধকারে ?"

"তোমার জন্যে মাংস রেঁধে এনেছি একটু। কেপনের মাংস।"

"মাংস? মাংস তো আমি খাই না।"

"তাই নাকি।"

নির্নিমেষে ডানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন রূপচাঁদ।

অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্যা সমাধান হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ডানা কিন্তু খুব নিশ্চিন্ত হয় নি। মনের নেপথ্যলোকে গোপন অস্বস্তির একটা কীট কোথায় যেন সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। তার ঠিক স্বরূপ সে দেখতে পাচ্ছিল না; কিন্তু অনুভব করছিল, সে ঠিক যা চাইছে তা পায় নি। অথচ সেটা যে ঠিক কি, তা-ও সে জানে না। খাওয়া পরা থাকা ছাড়া মাসিক দেড় শত টাকা বেতন মোটেই তুচ্ছ করার মত নয় এ বাজারে। এমন একটা ভদ্র পরিবারের আশ্রয়ও অবাঞ্ছিত নয়। তবু কি যেন একটা কি খচখচ করছে মনের ভিতরে। আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু—দুজনেই ভদ্র শিক্ষিত লোক, দুজনেই তাকে সাহায্য করবার জন্য উন্মুখ, অথচ—। সন্ন্যাসীর মুখটা মনে পড়ল। আশ্চর্য সন্ন্যাসী। কোনও ভড়ং নেই, গেরুয়া জটা কমণ্ডলু কিছু নেই, কথাও বলতে চান না বেশি। সব সময়ে থাকেনও না। নদী পার হয়ে মাঝে মাঝে চলে যান কোথায় যেন চরের উপর দিয়ে। দু-তিন দিন পরে হঠাৎ আবার ফিরে আসেন। নিজের হাতে ভাতে-ভাত রান্না করেন ইঁটের তৈরি উনুনে ছোট মাটির মালসায়। ডানার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ভিক্ষা করতে বার হন উনি বোধ হয়। ভিখারীকে ঘৃণা করতে শিখেছে সে ছেলেবেলা থেকে। এই সন্ন্যাসীটিকে ভিখারী ভাবতে ইচ্ছা করে না কিন্তু তার। ভিক্ষুকের মত কোনও দীনতা তো লক্ষ্য করে নি একদিনও সে। বরং উলটো কথাটাই মনে হয় তাঁর চেহারা দেখে। প্রকৃত ঐশ্বর্যশালীর আভিজাত্য যেন ফুটে বেরোয় তাঁর চোখে মুখে। তাঁর গাম্ভীর্য, তাঁর নির্বিকার ভাব-ভঙ্গী সমস্ত দীনতার অতীত ক'রে রেখেছে তাঁকে।...

...সশব্দে পাশের দুয়ারটা খুলে গেল। শশব্যস্ত বৈজ্ঞানিক এসে প্রবেশ করলেন। কুণ্ঠিত হাসিমুখে নমস্কার ক'রে বললেন, "আমার দেরি হয়ে গেছে বোধ হয়, না? আপনি প্রস্তুত নিশ্চয়"

"হ্যাঁ"

"আচ্ছা, তা হ'লে শুরু করা যাক এবার"

হাতে হাত ঘ'ষে বৈজ্ঞানিক একটা চেয়ারে বসলেন। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর হেসে বললেন, "আনন্দবাবুরও আসবার কথা ছিল, তাঁর জন্যে অপেক্ষা করব কিনা ভাবছি"

ডানা কি-যে বলবে ভেবে পেলে না ঠিক। তার মনে হ'ল, এঁর সঙ্গে সম্বন্ধটা এতদিন বেশ সহজ ছিল, কিন্তু সহসা ইনি মনিব হয়ে যাওয়াতে ব্যাপারটা একটু যেন গ্রন্থিল হয়ে পড়ল। এঁর আচরণে ঘুণাক্ষরে যদিও কোন রকম মনিবত্ব প্রকাশ পায় নি, কিন্তু ডানার মনে কেমন যেন একটা সঙ্কোচ জেগে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। অমরবাবু যথেষ্ট ভদ্রতাই করেছেন। ডিক্‌টেশন নেবার জন্যে ডানাকে তিনি অনায়াসে নিজের বাড়িতে যেতে বলতে পারতেন। তা কিন্তু বলেন নি তিনি। তিনি নিজেই এখানে আসবেন বলেছেন যখন দরকার হবে। চাকরি করার যেটা প্রধান গ্লানি—ঠিক সময়ে আপিসে রোজ হাজির দেওয়া—তার থেকে মুক্তি দিয়েছেন তাকে।

সঙ্কুচিত কণ্ঠে, যেন একটা অনুগ্রহ চাইছেন এমনই ভাবে, অমরবাবু বললেন, "ইয়ে, একটা কাজ যদি করতে পারেন, বেঁচে যাই আমি—"

"কি বলুন?"

"ইংরেজীতে একটানা ডিক্‌টেশন দেওয়া তো আমার অভ্যাস নেই কোন দিন। আমি ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে একটানা ব'লে যেতে পারি। হয়তো অনেক সময় এলোমেলোও হবে, আপনি সেটা শুনে যদি ইংরেজীতে লিখে যান, পারবেন কি, তারপর আমি সেটা দেখে দেব না হয়। পারবেন?"

"তা পারব বোধ হয়। চেষ্টা ক'রে দেখি একবার"

"পারেন তো বেশ হয়। জিনিসটা আপনি যদি বুঝতে পারেন,

তা হ'লে ইংরেজী করা আর শক্ত কি! বৈজ্ঞানিক নাম-টাম অবশ্য আপনাকে দিয়ে দেব আমি। নোট করে এনেছি সব"

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত ঢুকিয়ে কতকগুলো টুকরো কাগজ বার করলেন তিনি।

"আজকের বিষয়টা হচ্ছে 'পাখির ডিমের রঙ'। পাখিদের বার্ষিক গতিবিধি জিনিসটা যেমন বিস্ময়কর, তা নিয়ে যেমন গবেষণার অন্ত নেই, পাখিদের ডিমের রঙও তেমনই অদ্ভুত, তা নিয়েও বৈজ্ঞানিকরা নানাভাবে মাথা ঘামিয়েছেন। এই সব সম্বন্ধেই আলোচনা করব আজকের প্রবন্ধটাতে"

"আমি তা হ'লে খাতা পেন্সিল নিয়ে আসি"

ডানা ঘরের ভিতরে ঢুকে খাতা আর পেন্সিল নিয়ে এল। খাতা পেন্সিল আনিয়েই রেখেছিল সে এজন্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কবিও হাজির হলেন এসে।

"আপনার এত দেরি হয়ে গেল যে?"

"আমি একটু আটকে পড়েছিলাম রাস্তায়। অদ্ভুত একটা শোভা হয়েছে আজকাল, লক্ষ্য করেছেন সেটা?"

"কিসের শোভা?"—প্রশ্ন করলেন বৈজ্ঞানিক।

"প্রকৃতির। বসন্তকাল যে, খেয়াল আছে সেটা? ফুলই ফুটেছে কত রকম। আমের মুকুল তো ধরেইছে, তা ছাড়া আরও যে কত রকম ফুল, তার ইয়ত্তা নেই! লালে লাল হয়ে উঠেছে ওই বুড়ো শিমুলগাছটা। দেখেছেন? ন্যাড়া আমড়াগাছটা লক্ষ্য করেছেন? সবুজের শিখা ফুটে বেরুচ্ছে যেন তার সর্বাঙ্গ থেকে। একদল সোনার প্রজাপতি যেন পাখা মেলে ব'সে আছে শিয়ালকাঁটার বনে। ঘেঁটু-ফুলও ফুটেছে অজস্র, আর কি তাদের রূপ! ঘাসের ফুল দেখেছেন? সাদা সাদা ছোট ছোট ফুলগুলো কি যে চমৎকার! বটের গাছেও লাল লাল ফলের ভিড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কত জিনিসই যে আমরা দেখি না—"

হ্যাঁ, তা তো বটেই। ভাল ক'রে দেখার নামই তো দর্শন এবং দর্শনেরই একটা অংশ তো বিজ্ঞান। আমিও একটু পরেই বেরুব। এঁকে একটা প্রবন্ধের মালমসলা দিয়ে দিই। আপনি বসবেন, না, ঘুরে বেড়াবেন নদীর ধারে?"

"আমি বসছি একটু। বই-খাতা সঙ্গে এনেছি, ও-ধারটায় ব'সে আমিও লেখাপড়া করি একটু। আপনি ততক্ষণ কাজ সেরে নিন আপনার। একসঙ্গেই বেরুনো যাবে তারপরে। আপনার প্রবন্ধের বিষয় কি?"

"ডিমের রঙ"

"বেশ শোনাই যাক একটু"

"বেশ বেশ"—কৃতার্থ হয়ে গেলেন যেন বৈজ্ঞানিক। কবি একটা চেয়ার টেনে ধারে বসলেন।

বৈজ্ঞানিক শুরু করলেন, "দেখুন, এ বিষয়ে একটা প্রথমেই বলা দরকার—ডিমের এত বর্ণ-বৈচিত্র্য কেন, তা বিজ্ঞান ঠিক করতে পারে নি এখনও। এ যাঁরা বলেন যে, শত্রুদের কাছ থেকে ডিম গোপন করবার জন্যেই ডিমে এত রঙ, ইংরাজীতে যাকে camouflage বলে, তাঁরা সব ক্ষেত্রে তাঁদের মত সমর্থন করবার মত প্রমাণ খুঁজে পান নি। এই ধরুন না, কাকের ডিম greenish blue, শালিকের ডিম নীল রঙের। কিন্তু তারা কি সব সময়ে পারিপার্শ্বিক সবুজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে ডিম পাড়ে? শালিক পাখি অনেক সময় বাড়ির কার্নিসে বাসা বানায়, তা তো আমরা সবাই জানি। কাকের এলোমেলো বাসার মধ্যে যেখানে ডিমটা থাকে, সেখানে তো সবুজের কোনও চিহ্ন নেই। তা ছাড়া তাই যদি হ'ত, তা হ'লে যে সব পাখি গাছে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, সকলেরই ডিম সবুজ বা নীল হ'ত। তা কিন্তু হয় না তো। আর একদল বৈজ্ঞানিক বলেন যে, আলোর সঙ্গে রঙের সম্বন্ধ আছে। ট্রপিকাল দেশের মানুষের গায়ে যে কারণে pigment অর্থাৎ রঙ হয়, ঠিক সেই কারণে, তাঁদের মতে যে সব

ডিম যত সূর্যের আলো পায়, তারা তত বর্ণবহুল হয়। এরও অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে সব পাখি গর্তের মধ্যে অন্ধকারে ডিম পাড়ে, তাদের অনেকের ডিম অবশ্য সাদা, কিন্তু অনেকের আবার রঙিনও হয়, যেমন গাংশালিক। গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে না অথচ রঙ সাদা—এমন ডিমেরও অভাব নেই, যেমন ঘুঘু পায়রা হাঁস মুরগী। সুতরাং ঠিক নির্দিষ্ট ক'রে বলা যায় না কিছু। Bayne সাহেব বলেছেন একটা অদ্ভুত কথা। বলেছেন, স্ত্রী-পাখিদের এটা বোধ হয় artistic impulse অর্থাৎ শিল্প-প্রেরণা। স্ত্রী-পাখিদের গায়ে সাধারণত রঙ কম হয়, তাই তারা সে শখটা মেটায় ডিমের গায়ে নিজের নিজের পছন্দমত রঙ ফলিয়ে। এটা অবশ্য কবিত্ব"

বৈজ্ঞানিক কবির দিকে চেয়ে হাসলেন একটু।

কবি উত্তর দিলেন, "সেইজন্যেই বোধ হয় সত্য। কবিরাই সত্যকে দেখতে পায়। আপনারা কেবল আঁকুপাঁকু ক'রে মরেন, তাতেও অবশ্য আনন্দ কম নেই।"

বৈজ্ঞানিক উত্তর দিলেন, "এই camouflage ব্যাপারটা কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গাংচিল, বাটান প্রভৃতি পাখি বালির চড়ায় ডিম পাড়ে, কোনও বাসা বানায় না, কিন্তু ওদের ডিমের রঙ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এমন মিশে যায় যে চট ক'রে ধরা যায় না। লোকে অনেক সময় মাড়িয়ে ফেলে, তবু দেখতে পায় না। যাদেরই ডিম খাকী রঙের বা মাটির রঙের বা স্টোন কলার্ড (stone coloured) তাদের সম্বন্ধেই এ কথা বলা চলে, যেমন ধরুন Bustard, Curlew, Indian Courser, আরও অনেক আছে। ডিমের রঙের সম্বন্ধে আর একটা কথাও মনে হয়, ওদের Endocrine glands, বিশেষ ক'রে Adrenal নিশ্চয় এ সবের জন্যে দায়ী। জীবদেহের সমস্ত রকম pigment-এর সঙ্গে Endocrine gland-এর যোগ আছে। যাঁরা পাখিদের ডিম নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁরা সাতটা রঙই পেয়েছেন। আপনি ওখানটা একটু

ফাঁক রেখে দেবেন, রঙের কটমট বৈজ্ঞানিক নামগুলো আমি পরে বসিয়ে দেব। রঙগুলো স্পেক্‌ট্রাম অ্যানালিসিস্‌ ক'রে বার করেছেন Sorby ; এস ও আর বি ওয়াই; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—"

"আমি নদীর ধারে একটু ঘুরে আসি, বুঝলেন"—কবি উঠে পড়লেন।

"আচ্ছা, বেশ"—অপ্রস্তুত মুখে উঠে দাঁড়ালেন বৈজ্ঞানিকও।

"আমি এটা শেষ ক'রে ফেলব এখুনি। আপনি ততক্ষণ বাটানগুলোর খবর নিন না!"

কবি চ'লে গেলেন।

বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম যে?"

ডানা বললে, "রঙগুলো স্পেক্‌ট্রাম অ্যানালিসিস্‌ ক'রে বার করেছেন Sorby ; এই সূত্রে আর একটা কথাও মনে হয়—"

"ও, হ্যাঁ। সব রঙেরই মূল হচ্ছে সূর্যালোক। আমরা যখন কোনও জিনিসকে সবুজ দেখি, তখন আসলে কি হয়? সূর্যালোকের যে সাতটা রঙ আছে, তার ছটা রঙই সেই জিনিসটা আত্মসাৎ ক'রে নেয়, সবুজটাকে করে না, আমরা সেটা দেখতে পাই। সুতরাং বকের ডিমকে আমরা যখন সবুজ দেখছি, তখন বুঝতে হবে ভিবজিওরের জি-টা ছাড়া বাকি সবগুলো ওই ডিম শুষে নিচ্ছে। হয়তো বকের ভ্রূণের পক্ষে ওই ছটা রঙের তরঙ্গাঘাত প্রয়োজন, সবুজটা অনিষ্টকারী। এদিক দিয়েও ডিমের রঙের বিষয় চিন্তা করা যেতে পারে। তা ছাড়া পাখির খাদ্যের সঙ্গেও নিশ্চয় সম্পর্ক আছে এর। কারণ জীবজগতের যত কিছু রঙ, তা তো খাদ্য থেকেই তৈরী হয় শেষ পর্যন্ত। পাখির ডিমের রঙের সঙ্গে হিমোগ্লোবিন আর বাইল পিগ্‌মেন্টের যে সম্বন্ধ আছে, তা তো আবিষ্কারই করেছেন Sorby—"

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ কাংস্য স্বর বাতাসকে চিরে দিয়ে চ'লে গেল।

বৈজ্ঞানিক থেমে গেলেন এবং উদ্ভাসিত দৃষ্টি তুলে ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "শুনলেন ?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই শুনতে পাই। কি পাখি বলুন তো ?"

"কাঠঠোকরা। শব্দটা অদ্ভুত, নয় ? আচ্ছা, সংস্কৃতে ক্রেঙ্কারধ্বনি ব'লে একটা কথা আছে, তা কি এই রকম শব্দ ? আপনি তো সংস্কৃত জানেন"

"যে কোন কর্কশ শব্দকে ক্রেঙ্কারধ্বনি বলা যায়, কিন্তু হাঁসের ডাকের শব্দকেই ক্রেঙ্কারধ্বনি বলেছেন সংস্কৃত কবিরা"

"ও। কিন্তু এ সব শব্দকে কি কর্কশ বলা উচিত ?"

"সেটা নির্ভর করে শ্রোতার উপর"—মৃদু হেসে ডানা বললে।

"তা ঠিক। কাঠঠোকরা দেখেছেন ? দেখেন নি ? ভারি চমৎকার দেখতে। আজই চিনিয়ে দেব আপনাকে। এইটে হয়ে যাক, তারপর বেরুনো যাবে, কি বলেন ? আমি কয়েকটা ফর্দ ক'রে এনেছি ডিমের রঙের। পাখিগুলোর বাংলা নামই দিয়েছি। আচ্ছা, প্রবন্ধগুলো প্রথমে বাংলা কোনও কাগজে দিলে কেমন হয়, কি বলেন আপনি ? বাংলাতেই প্রথমে লিখে ফেলুন, পারবেন ?"

"পারব না কেন ? বাংলা ইংরেজী দু রকমই লিখে দেব"

"বাঃ, গ্র্যাণ্ড হবে তা হ'লে !"

কাগজের কয়েকটা টুকরো বার করলেন তিনি পকেট থেকে। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, লিখুন এইবার। আমি রঙ অনুসারে ভাগ করেছি। কুচকুচে কালো ডিম চেনাশোনা কোনও পাখিরই নেই। ভায়োলেট রঙের ডিমও বড় দেখতে পাওয়া যায় না এদেশী পাখির। ইন্‌ডিগো রঙের ডিমও দেখি নি। নীল রঙ অবশ্য অনেক আছে। আর একটা কথা, নিছক একরঙা ডিম খুব কম আছে। অধিকাংশ ডিমেই এক বা একাধিক বর্ণের সংমিশ্রণ দেখা যায়। তা ছাড়া অনেক ডিমের গায়েই কালো বা বাদামী বা লাল রঙের ছিটছিট থাকে"

ডানা দ্রুতবেগে লিখে যাচ্ছিল। অমরবাবু চুপ ক'রে গেলেন ডানার চলমান পেন্সিলের দিকে চেয়ে।

"হ'ল ?"

"হয়েছে। আপনি ব'লে যান না"

"নীল রঙের ডিম—ছাতারে, শালিক, গাংশালিক, গোশালিক। গাংশালিক গর্তের ভিতর ডিম পাড়ে, তবু কিন্তু ওর ডিম নীল। এইবার লিখুন ফিকে নীল—গ্রে হেডেড (Grey headed) ময়না, যাদের দেশী নাম—পাওয়াই, ব্রাহ্মণী ময়না, সবুজ মুনিয়া। সাদাটে নীল—দর্জিপাখি, শিকরা, দর্জিপাখির ডিম লালচেও হয়। অনেক পাখিরই ডিমের রঙ এক রকম হয় না। দর্জিপাখি আর শিকরার ডিমে ছিটছিট থাকে। সবুজাভ নীল—খয়রা, কোঁচ-বক—"

ডানা লিখতে লিখতে জিজ্ঞেস করলে, "খয়রা কি পাখি ?"

"ইংরেজী নাম স্নেক বার্ড (snake bird), অনেকটা হাঁসের মত। গলাটা কেবল সাপের মত লম্বা, অদ্ভুত লম্বা। ঝিলে প্রায় দেখা যায় এগুলোকে। যখন মাছ ধরে, মনে হয়, সাপে ছোবল দিচ্ছে। মাথা আর গলা এদের খয়েরী রঙের। সেইজন্যেই খয়রা ব'লে বোধ হয়। জানি না ঠিক। খয়রা মাছও আছে এক রকম, কিন্তু তাদের রঙ তো রূপোর পাতের মত। বলতে পারি না খয়রা নাম কেন,—সুনীতিবাবু হয়তো পারবেন। এ পাখিগুলো ডুব-সাঁতার দিতে খুব ওস্তাদ, ডুব-সাঁতার দিয়ে মাছ ধরে এরা।"

ডানা দেখলে খয়রা-প্রসঙ্গে বাধা না দিলে ক্রমাগত ব'লে যাবেন ইনি।

"ও। সবুজাভ নীল আর কোনও পাখির আছে কি ?"

"আর কারও নেই। নীলচে সবুজ আছে, কিন্তু সে সবুজের কোঠায় হবে এখন। এইবার লিখুন—নীলাভ সাদা। এগুলো সাদাই, একটু নীলের আভা আছে কেবল। গাই-বক (Cattle Egret), এদের ডিমের রঙ অনেকটা মাখন-তোলা দুধের রঙের মত।

ফ্লেমিংগোর (Flamingo) ডিমও নীলাভ সাদা। এরা অবশ্য স্পেন ইরাক প্রভৃতি দেশে ডিম পাড়ে। এ দেশে কচ্ছ প্রদেশে পাড়ে শুনেছি।"

"ফ্লেমিংগো? বাংলা নাম আছে কোনও?"

"রাজহংস বলে অনেকে। কিন্তু রাজহংস নামে অনেক পাখিই চলছে। বার-হেডেড গুজকে (Bar-headed Goose) অনেকে রাজহংস বলে, আবার মিউট সোয়ানও (Mute Swan) রাজহংস-রূপে চিত্রিত দেখেছি সরস্বতীর ছবিতে। পেলিকানও (Pelican) রাজহংস নামে চ'লে গেছে কোথাও। আপনি ফ্লেমিংগোই লিখুন। কিংবা বাংলা নামকরণ করতে পারেন যদি—

"পাখিটা দেখতে কি রকম?"

"দেখতে? রঙ সাদা, ডানার ধারে ধারে গোলাপী, পা দুটো খুব লম্বা, ঠোঁটও একটু বিশেষ ধরনে বাঁকানো।"

"পা দুটো লম্বা? খুব লম্বা?"

"খুব"

"তা হ'লে লম্বগ্রীব, লম্বকর্ণর মত লম্বচরণ বা লম্বপদ বলা যায় অনায়াসে"।

"বাঃ, চমৎকার হবে। তাই লিখুন। ব্র্যাকেটে ইংরেজী নামটা দিন।"

ডানা লিখতে লাগল। অমরবাবু চেয়ে রইলেন তার দিকে। মেয়েটি নিতান্ত তুচ্ছ করবার মত নয় তো। বাঃ! তার ঘাড়ের কুঞ্চিত কতকগুলো চুলের দিকে চেয়ে তাঁরও ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। পাখির পালকে ঠিক এই রকম দেখা যায়। সেদিন দোয়েলের যে পালকটি পেয়েছেন—।

হঠাৎ ডানা মুখ তুলে বললে, "তারপর বলুন। নীলাভ সাদা আর কোনও পাখির আছে?"

"আছে। শর্ট-টোড ঈগল (Short-toed Eagle), দেশী নাম

সাপমার। এদের ডিম ধবধবে সাদাও হয়। এদের আর একটা বিশেষত্ব—এরা মাত্র একটি ডিম পাড়ে। হোয়াইট ইবিস—সংস্কৃত নাম মুণ্ডক, এদের ডিমও নীলাভ সাদা, সবুজাভ সাদাও হয়। যাদের ডিম দু রকম বা তিন রকম রঙের হয়, তাদের নামটা আর একটা পাতায় টুকে যান তো। আগে পেয়েছেন দর্জিপাখি। যে সব ডিমে ছিটছিট থাকে—অর্থাৎ যাদের ডিম Blotched—তাদের আলাদা একটা লিস্ট করেছি আমি। আচ্ছা, এইবার সবুজে আসা যাক। ঠিক সবুজ ডিম হয় না কারও। গ্রে হেরনের (Grey Heron) ডিম সী-গ্রীন"

"গ্রে হেরনের বাংলা কি ?"

"কাঁক-পাখি, সাদা কাঁক, সংস্কৃত—কঙ্ক। সী-গ্রীনের বাংলা কি লিখছেন ? সাধারণত সমুদ্রকে আমরা নীল বলি, কিন্তু ওর সবুজ রঙও হয়—দেখেছেন কখনও ?"

"দেখেছি। সী-গ্রীন সাগর-সবুজ লিখলে ক্ষতি কি ?"

"কিছু ক্ষতি নেই। তাই লিখুন। এদেরই আর এক আত্মীয় পার্পল হেরন (Purple Heron) নীল-বক নামে পরিচিত। নীল-বক, কানা-বক, ওয়াক-বক এবং তাদের জ্ঞাতি-গুষ্টিদের···আপনি এট্‌সেট্‌রা এট্‌সেট্‌রা লিখে দিন···অনেকেরই ডিম ফিকে সবুজ রঙের। আরও দু রকম বকের কথা আগেই বলেছি, কোঁচ-বক গাই-বক, এদের ডিমে অবশ্য নীলেরই প্রাধান্য। সারস, ব্ল্যাক ইবিস্ (Black Ibis) দেশী নাম কাড়া কোল, এদের ডিমও ফিকে সবুজ, কিন্তু ছিটছিট। রীফ হেরন (Reef Heron) এ দেশে বড় দেখা যায় না, তাদেরও ফিকে সবুজ ডিম। এই সারস বকেদের দলে ঢুকে পড়েছে কিন্তু দুটি ছোট ছোট পাখি কালী-শ্যামা আর দুর্গা টুনটুনি। এদের ডিমও ফিকে সবুজ আর ছিটছিট। এই পাখি দুটি নিজেরা যেমন অস্থির, এদের ডিমের রঙেরও তেমনই কোন স্থিরতা নাই। [illegible] সাদা, পীতাভ, ফিকে সবুজ—তিন রকম

ডম হয়। দুর্গা-টুনটুনি ছাই রঙয়ের ডিমও পাড়ে। আশ্চর্য নয়? কটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি, পরে বলব। সবুজ, ফিকে বুজ হয়ে গেল, এইবার আসুন নীলচে সবুজ—Bluish Green। াগে হয়েছে Greenish Blue—সবুজাভ নীল। গোলমাল ক'রে লবেন না। কাক, দাঁড়কাক, জলকাক—যার চলতি নাম পানকৌড়ি, ইংরেজী নাম Cormorant—এদের ডিম নীলচে সবুজ। ক দাঁড়কাকের ডিমে ছিটছিট আছে, আর পানকৌড়ির ডিমের পর সাদা বা নীলচে সাদা খড়ির মত এক রকম গুঁড়ো-গুঁড়ো নিস মাখানো থাকে। বকেদের সঙ্গে যেমন জুটেছিল কালী-শ্যামা আর দুর্গা-টুনটুনি, কাকেদের সঙ্গে তেমনই জুটেছে দোয়েল আর শ্যামা। দোয়েলের ডিমে ছিটছিট আছে। লিখেছেন?"

"একটু বাকি আছে"

তাড়াতাড়ি লেখা শেষ ক'রে ডানা বললে, "হয়েছে, বলুন।"

কিন্তু বাধা প'ড়ে গেল।

একজন কন্‌স্টেব্‌ল সমভিব্যাহারে দুটো কুলি এসে হাজির হ'ল। দুটো কুলির মাথায় দুটো বাক্স। কন্‌স্টেব্‌ল ডানাকে সেলাম ক'রে চিঠি দিলে একটা। রূপচাঁদের চিঠি। রূপচাঁদ লিখছেন—

ডানা, কাল রাত্রে আবিষ্কার করলাম যে, গানের তুমি খুব ভক্ত একজন। আমাদের পরিচিত এক বন্ধু দারোগার একটি গ্রামোফোন ও অনেকগুলি ভাল ভাল গানের রেকর্ড ছিল। তিনি অল্প কিছু দিনের জন্য বদলি হয়ে বাইরে যাচ্ছেন। আমার কাছে এগুলো রেখে যাচ্ছিলেন, আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আশা করি, গান শোনবার জন্যে বাইরের লোক ডাকবার আর প্রয়োজন হবে না তোমার। ইতি—আর, সি,

বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন, "কি ব্যাপার?"

"রূপচাঁদবাবু একটা গ্রামোফোন আর কিছু রেকর্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন"

"ও, বেশ তো! আমার কাছে পাখির গানের কিছু রেকর্ড আছে পাঠিয়ে দেব এখন।"

ডানা কন্‌স্টেব্‌লের দিকে চেয়ে বললে, "ভিতরে রাখিয়ে দাও"

কন্‌স্টেব্‌ল কর্তব্য সমাপন ক'রে চ'লে গেল।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "নিন, তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে ফেলতে হবে এটা। আনন্দবাবু হয়তো অপেক্ষা করছেন আমার জন্যে নদীর ধারে"

আবার শুরু করলেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "এইবার আসুন অলিভ গ্রীনের কোঠায়। এর বাংলা কি হবে? জলপাই সবুজ? আমাদের দেশী পাখিদের মধ্যে একমাত্র গৈয়রই অলিভ গ্রীন ডিম পাড়ে"

"গৈয়র পাখির নাম শুনি নি তো?"

"ইংরেজী নাম স্টোন্ কারলিউ (Stone Curlew), অনেকটা বাটান পাখির মত—গায়ে বাদামী ডোরা, চোখে চশমার মত কালো দাগ আছে। পাথুরে জায়গায় থাকতে ভালবাসে। খাকী রঙের ডিমও হয় এদের কখনও কখনও। ডিমের গায়ে ছিটেফোঁটাও থাকে যে সব পাখি বালিতে, পাথরে কিংবা খোলা মাটিতে ডিম পাড়ে তাদের ডিমে সবুজের সঙ্গে নানা আমেজের খাকী, হলুদ আর ছাই রঙ দেখা যায়। গাংচিল (Tern) আর বাটানের (Plover) ডিম Greenish Grey—সবুজ-ধূসর, অন্য ধরনেরও হয়। ডিমে ছিটছিট থাকে। সবুজের ফর্দ শেষ হ'ল এইখানে, এইবারে হলুদে আসা যাক একেবারে ঠিক হলুদ রঙের কোনও ডিম নেই। জলমুরগির ডিম ফিকে হলুদ, খাকীও হয়।"

লিখতে লিখতে ডানা বললে, "জলমুরগি আছে নাকি আবার?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে। এগুলোর ইংরেজী নাম হচ্ছে Indian Moor Hen, ওয়াটার হেনও বলে কেউ, তবে আসল ওয়াটার হেন হচ্ছে ডাহুক। Indian Moor Henকে পানপায়রা, কোড়াও বলে। সংস্কৃত নাম কোযষ্টি। বিলে-টিলে খুব থাকে। এদের ডাক

হচ্ছে কিররিক-ক্রেক্-রেক্-রেক্। আর ডাহুকের ডাক কু-ওয়াক্, কু-ওয়াক্, কু-ওয়াক্, কুক্ কুক্ কুক্। এদের দুজনেরই ডাক বর্ষাকালেই শোনা যায় বেশি। বিদ্যাপতি, না, কার ভাল একটি কবিতা আছে ডাহুক নিয়ে। আনন্দবাবু থাকলে বলতে পারতেন।"

ডানা বললে, "আমি একটা জানি। মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া"—ব'লেই লজ্জিত হয়ে পড়ল সে, কিন্তু পর-মুহূর্তেই সামলে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল আবার।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটেই। বোধ হয় বর্ষার গান। এই সব পাখিদের মেটিং সিজন (Mating Season) বর্ষার সময় কি না, আর সেই সময় খুব ডাকে ওরা।"

"ফিকে হলুদ রঙের ডিম আর কোন্ কোন্ পাখির আছে বলুন ?"

"আর কারও নেই। তারপর লিখুন ক্রীম। কালীশ্যামা, তিলে-বাজ, দুধরাজ, গ্রে তিতির আর ডাহুক। কালীশ্যামার ডিম ফিকে সবুজ হয়, একথা আগেই বলেছি। ডাহুকের ডিমও লালচে সাদা হয় অনেক সময়। কালীশ্যামা, দুধরাজ আর তিলেবাজের ডিম ছিটছিটও। মানে, Blotched ; এইবার লিখুন ফিকে ক্রীম—ময়ূর, নাক্‌টা হাঁস। ময়ূরের ডিমে ছিটছিট থাকে, নাক্‌টার ডিম আইভরির অর্থাৎ হাতীর দাঁতের তৈরি ব'লে মনে হয়। লিখেছেন ?"

"হ্যাঁ"

"তারপর, লিখুন, পিংকিশ ক্রীম—কুলোপাখি আর বাজ। বাজের ডিম অবশ্য পেল স্টোনও (Pale stone) হয়। দেখুন এসব রঙের বাংলা নাম কি হবে—কপিশ-টপিশ হবে বোধ হয়, সেগুলো আপনি ঠিক ক'রে নেবেন তো ?"

"চেষ্টা করব। তারপর বলুন।"

"নানা ধরনের স্টোন রঙ আছে। কাদাখোঁচার ডিম Yellowish Stone, Coot-এর ডিম Buffy stone, গাংচিল আর বাটানের ডিমও Buffy stone".

"কুট কি পাখি ?"

"যার সংস্কৃত নাম কারণ্ডব"

"ও"

"পাশে লিখে রাখুন, গাংচিল আর বাটানের ডিমে ছিটছিট থাকে। এইবার আসুন খাকী রঙে। খাকী রঙের ডিম হয় Quail-দের। যাদের বটের বলে। তবে খাকীতে নানা রঙের আমেজ থাকে। Quail আছেও তো অনেক রকম। তাই খাকীর সঙ্গে কখনও লালচে, কখনও পীতাভ, কখনও ক্রীম মিশে থাকে। হুক্‌নার ডিমও এই ধরনের'

"হুক্‌না ? সে আবার কি রকম পাখি ?"

"ইংরেজী নাম Indian Courser। শুকনো জায়গায় বালির চড়ায় থাকে সাধারণত। গায়ের রঙও Sandy Brown। চোখের উপর সাদা সাদা দাগ। আগেই বলেছি, যে সব পাখি বালিতে কিংবা খোলা মাটিতে ডিম পাড়ে, তাদের ডিম হয় খাকী, Greenish খাকী বা ওই ধরনের। এই দলে ফেলতে পারেন Lapwing মানে টিট্টিভদের, Pipit মানে বাগেরিদেরও। এদের ডিম ছিটছিটও। এই বাগেরিদের সগোত্র হচ্ছে আবার ভরতপাখির দল—Finch Lark, Sky Lark, Crested Lark প্রভৃতি। এরাও মাটিতে ডিম পাড়ে। এদের ডিমও ওই ধরনের Greyish, Greyish Yellow বা Yellowish White। নানা রকম শেড আছে। এইবার আসুন লালের কোঠায়। ঠিক লাল ডিম কারও নেই। তবে বাদামী, Brick red, লালচে, ফিকে গোলাপী, Salmon এই সব আছে। লিখুন, বাদামী রঙের ডিম হচ্ছে কালো তিতিরের। এদের ডিম চকোলেট রঙেরও হয়। Painted তিতির, হিন্দীতে যাকে পতীলু বলে, এদের ডিমও বাদামী। চমৎকার Bronze Brown হচ্ছে জলপিপির ডিম। ছিটছিট আছে। হুক্‌নার ডিমও Brown হয় অনেক সময়। আর Florican, যাকে হিন্দীতে লীখ বলে, তাদের ডিমও বাদামী"

"লীখ ?"

"হ্যাঁ"

ডানা দ্রুতবেগে টুকছিল। বৈজ্ঞানিক তার দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে প্রশ্ন করলেন, "হ'ল ?"

টোকা শেষ ক'রে ডানা বললে, "বলুন"

কিন্তু একটা দমকা হাওয়া এসে গোলমাল ক'রে দিলে সব।

কবি টেবিলের উপর কয়েকখানা কাগজ রেখে গিয়েছিলেন, সেইগুলো উড়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

"ধরুন, ধরুন—"

বৈজ্ঞানিক ও ডানা দুজনেই উঠে ছুটোছুটি ক'রে কুড়োলেন কাগজগুলো।

দেখা গেল, একটা কবিতা লেখা রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক বললেন, "পড়ুন তো কবিতাটা, নিশ্চয় কোনও পাখির বিষয়েই লিখেছেন। এই নীরস আলোচনার পর—আপনার নিশ্চয় নীরস লাগছে খুব ?"

"না। আমার তো বেশ লাগছে"

শিশুসুলভ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন অমরেশবাবু।

"সত্যি, এগুলো নীরস নয় মোটেই, এতে একবার যদি রস পান তা হ'লে আর—আচ্ছা, কবিতাটা পড়ুন।"

ডানা পড়তে লাগল।

একলা ঘরে দুপুরবেলায়
লিখছি চিঠি তোমায় প্রিয়,
চিড়িক চিড়িক ডাকছে চড়াই
চুমুক চুমুক ডাকছে কি ও।
স্বর্ণলতায় ফুটছে যা রং
শঙ্খচিলের কণ্ঠে সারং
এর ছবি কি আঁকতে পারি
নয়কো এ যে অঙ্কনীয়।

একলা ডালে বসন্ত-বউ
ডাকছে কারে আকুল ডাকে
দূরের বনে নিবিড় ছায়ায়
বউ-কথা-কও সাধছে কাকে
তপ্ত বায়ে কাঁদছে কি সুর
রোদের বীণায় কাঁপছে দুপুর
বাজায় পায়ে বহ্নি-নূপুর
কোন্ মোহিনী নর্তকী ও।

ফটিক জলের ব্যাকুল ডাকে
আকুল বিরাট ঔষধি যে
তীক্ষ্ণ সুরের শায়ক হেনে
চাইছে ও কোন্ দ্রৌপদীকে
পথ চেয়ে কার আকুল পাখি
'চোখ গেল' যে বলছে ডাকি
ধাপে ধাপে চড়ছে যে সুর
নয়কো তাহা বর্ণনীয়।

বর্ণনীয় নয়কো জানি
বলতে তবু চাইছি সবি
অসম্ভবের স্বপ্ন দেখি
ছন্দ-পাগল অন্ধ কবি
লুকিয়ে যাহা মর্মে বাজে
ভাষায় তাহা ফুটছে না যে
এ রূপকথার অরূপ বাণী
আন্দাজে তা বুঝেই নিও।

"অনেকগুলো পাখি লক্ষ্য করেছেন দেখছি ভদ্রলোক। চড়াই, শঙ্খচিল, বসন্ত-বউরি, বউ-কথা-কও, চোখ-গেল, ফটিকজল। চমৎকার হয়েছে কবিতাটা, নয় ?"

"হ্যাঁ"—ডানার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠেছিল। কোনক্রমে 'হ্যাঁ' কথাটা উচ্চারণ ক'রে সে কাগজ ছখানা সরিয়ে রেখে দিলে। রূপচাঁদ যে গ্রামোফোন ও রেকর্ডগুলো পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সেটার দিকেও আড়চোখে চেয়ে দেখলে একবার। তার মনে হ'ল, ছটো বিরাট গর্ত যেন মুখ ব্যাদান ক'রে আছে তার সঙ্কীর্ণ পথের ছু পাশে। একটু অন্যমনস্ক হ'লেই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

"ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের। চমৎকার ছন্দটি—"

"ব্রাউন তো হয়ে গেল। এর পর—"

"হ্যাঁ, এর পর লিখুন ফিকে লাল—উইদিন ব্র্যাকেট Pale Pink। নাইটজারের ডিম ফিকে লাল। নাইটজারের বাংলা নাম জানি না, হিন্দী নাম ডাভাক। সাদা শকুনের ডিম Pale Brick Red। সাদা শকুন দেখেছেন ? অতি কুৎসিত পাখি, ডিমগুলি কিন্তু চমৎকার। Pale Brick Red-এর উপর কালোর ছিটেফোঁটা। হ'ল ? এইবার লিখুন সাদার লিস্ট। চোর পাখি, ফিঙে, বাবুই, মুনিয়া, Tickel's Flower Pecker—ইনি পাখিদের মধ্যে ক্ষুদ্রতম, কাঠঠোকরা, ভগীরথ, বসন্ত-বউরি, কুকো, টিয়া, চন্দনার দল, নীলকণ্ঠ, বাঁশপাতি, মাছরাঙা, ধনেশ, তাল-চোঁচ, প্যাঁচা সবরকম—কেবল কালোপ্যাঁচার ডিমে একটু ক্রীমের আভাস থাকে, শকুনি—এক সাদা শকুনি ছাড়া, কিন্তু সাদা শকুনির ডিমও সাদা হয় অনেক সময়। তারপর লিখুন গরুড়, সাপমার। এদের ডিম নীলচে হয় আগেই বলেছি। কোড়ল, হরিয়াল, পায়রা, ঘুঘু, হাড়গিলে, সিল্‌হি, দীঘোচ, বুশ কোয়েল (Bush Quail), মানিকজোড়, সোনাজঙ্ঘা, ডোকহর, কালীশ্যামা। কালীশ্যামার ডিম অন্য রঙেরও হয় আগেই বলেছি। তারপর লিখুন পিট্টা। পাশে নোট ক'রে নিন যে, চোরপাখি, ফিঙে, গরুড়

এদের ডিমে সাদার উপর ছিটছিটও থাকে। আর ধনেশ, বামুন শকুনি, সিল্‌হি, এদের ডিম প্রথমে সাদা থাকে, কিন্তু তা দিতে দিতে ঠিক সাদা আর থাকে না, আর সোনাজঙ্ঘা আর ডোকহরের ডিম একটু ময়লাটে সাদা হয়। তারপর লিখুন—হ'ল আপনার ?"

ডানা লিখতে লিখতে শুধু যে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল তা নয়, কবিতাটা পড়ার পর থেকে একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক এসব লক্ষ্য করলেন না। করলে হয়তো ক্ষান্ত দিতেন।

"এইবার লিখুন, সাদার সঙ্গে অন্য যে সব রঙের আভা আছে। শ্যামাভ সাদা—ক্যারকাটা, সাতসয়ালি মানে মিনিভেট, চড়াই, সব ছিটছিট। Buzzard Eagle, যাকে দেশী ভাষায় বলে তিস্‌সা, আর খয়রার ডিম যে নীলাভও হয় তা আগেই বলেছি। তারপর আসুন। Pinky White—ফটিকজল, বুলবুল, সাধারণ চিল। ফটিকজলের সঙ্গে চিলের কি আকাশ-পাতাল তফাত! কিন্তু ডিমের রঙের ক্ষেত্রে মিলেছে এসে দুজনে। ভারি অদ্ভুত, না ? সারসের ডিমও Pinky White হয়, Pale greenও হয়। এদের প্রত্যেকের ডিমে ছিটছিট। এর পর লিখুন Reddish white—লালমাথা বাজ, দর্জিপাখি এদের ডিম নীলাভও হয়। ডাহুক, ডাহুকের ডিম ক্রীম রঙের হয় আগেই বলেছি। সকলের ডিমই ছিটছিট। তারপর লিখুন, পীতাভ সাদা—বগেরি, ভরত, তিলেবাজ, মাঠ-চিল সব blotched। গ্রেইশ হোয়াইট—শঙ্খচিল, যার স্বরে আনন্দবাবু সারং সুর শুনেছেন, আর Bustard Quail। তারপর লিখুন, কফি-সাদা—ময়ূর, এদের ডিম Pale creamও হয়। মোটামুটি এই হ'ল ফর্দ। এর থেকে কি বোঝা যায় ? একটু গবেষণা করা যাক আসুন।"

বৈজ্ঞানিক হেসে ডানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। ডানা টোকা শেষ ক'রে বললে, "একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, অধিকাংশ ডিমই ছিটছিট।"

"হ্যাঁ, অনেক ডিমই। এ বিষয়ে একটা থিয়োরি খাড়া করেছি আমি। যত গাইয়ে পাখি আছে, সকলের ডিম ছিটছিট। ফটিকজল, বুলবুল, শ্যামা, কালীশ্যামা, দোয়েল, বেনেবউ, কাজলগৌরি, পাহাড়ী-ময়না, ভরত, দুর্গা-টুনটুনি—"

"আচ্ছা, কোকিলের কথা বললেন না?"

"ওহো, বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো! কোকিলেরা তো একটা class by themselves—ওরা আলাদা একটা শ্রেণীই—parasitic —বাংলায় কি যেন ভাল একটা নাম আছে—"

"পরভৃতিক?"

"হ্যাঁ, পরভৃতিক। এরা পরের বাসায় ডিম পাড়ে। আমাদের দেশেই কোকিল সতেরো রকমের আছে। আচ্ছা, এদের কথা বলছি, একটু বিশ্রাম ক'রে নিন আপনি"

"চা ক'রে আনি?"

"আনুন"

বৈজ্ঞানিক একটা কাগজে তাড়াতাড়ি নোট লিখতে লাগলেন। ডানা উঠে চা করতে গেল।

এইবার শুরু করা যাক আসুন। কোকিলদের রঙের বৈজ্ঞানিক নাম Cuculidoe—এটা আবার দু-রকম sub-familyতে বিভক্ত—থাক্, অততে দরকার নেই—আমরা যে চার রকম কোকিল এ দেশে সাধারণত দেখতে পাই, তার কথাই লিখুন। প্রথম, যাকে আমরা কোকিল বলি, তার ইংরেজী নাম হচ্ছে কোয়েল, পাশে একটু ফাঁক রেখে দিন, বৈজ্ঞানিক নামটা আমি পরে বসিয়ে দেব। এরা কাক কিংবা দাঁড়কাকের বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমের রঙও ওদের ডিমের রঙের মতই হয়—ফিকে নীলচে সবুজ গোছের। একটু ছোট। ছিটছিট থাকে।"

আর একবার ডেকে উঠল কাঠঠোকরাটা। উৎকর্ণ হয়ে থেমে গেলেন বৈজ্ঞানিক।

“নিন নিন, শিগ্‌গির লিখুন। ওটাকে দেখতে হবে এক্ষুণি। কোকিল জাতের দ্বিতীয় নম্বর পাখি ‘চোখ গেল’ ইংরেজী নাম Brain-Fever Bird বা Hawk Cuckoo, কারণ হঠাৎ এদের দেখলে বাজ ব'লে ভ্রম হয়। এরা সাধারণত ছাতারে জাতীয় পাখিদের বাসায় ডিম পাড়ে। ছাতারেদের ডিমের মতই এদেরও ডিম নীল—ছিটছিট নয়, কিন্তু চমৎকার নীল। তৃতীয় যে কোকিল এ দেশে দেখা যায়, তাকে আমরা বলি ‘বউ কথা কও’, এর ইংরেজী নাম Indian Cuckoo। এরা সাধারণতঃ হিমালয় অঞ্চলে বাচ্চা পাড়ে, এ দেশেও হয়তো পাড়ে, ঠিক জানা নেই। যতদূর জানা গেছে, এরা হিমালয় অঞ্চলের পাখি Blue Chat অথবা Laughing Thrush এর বাসায় ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ নীল, কখনও ছিটছিট থাকে, কখনও থাকে না। তারপর চতুর্থ কোকিল যা আমরা দেখতে পাই, তা হচ্ছে চাতক—Pied Crested Cuckoo—এদের সাধারণত বর্ষাকালেই বাংলা বিহার অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশেও এরা থাকে—বিশেষ ক'রে মাদ্রাজ অঞ্চলে। সিংহলেও প্রচুর আছে। আফ্রিকাতেও এ পাখি খুব দেখা যায়। অনেকের ধারণা, এরা শীতকালটা কাটায় আফ্রিকায়, বর্ষার সময় এ দেশে আসে। এ দেশেই ডিম পাড়ে। এরাও ডিম পাড়ে ছাতারেদের বাসায় কিংবা Laughing Thrush-এর বাসায়। ডিমের রঙ নীল, কিন্তু ছিটছিট নয়।

আমি যে থিয়োরিটা খাড়া করেছি যে, গায়ক পাখিদের ডিমের গায়ে ছিটছিট থাকে, এরা তার ব্যতিক্রম বলতে পারেন। কিন্তু এদের ডিমে ছিটছিট না থাকার কারণও আছে। এরা পরের বাসায় চুরি ক'রে ডিম পাড়ে, সেইজন্য তাদের ডিমের মত ডিম পাড়তে হয় এদের। এদের কথা যদি বাদ দেন, তা

হ'লে কিন্তু এটা বেশ দেখা যায়, যেসব পাখি গায়ক অথবা শিল্পী অথবা চতুর অথচ মানুষ-ঘেঁষা তাদেরই ডিমের গায়ে ছিটছিট থাকে। গায়ক পাখিদের নাম আগেই বলেছি। এইবার শিল্পীদের কথা লিখুন। বাসা তৈরি করবার সময় যারা নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়, তাদেরই শিল্পী বলছি। চোরপাখি, ফটিকজল, বুলবুলি, শ্যামা, দোয়েল, বেনেবউ, কাজলগৌরী, ফিঙে, বাবুই, মুনিয়া, দুর্গাটুনটুনি, দর্জিপাখি—এরা অনেকে ভাল গায়কই শুধু নয়, ভাল শিল্পীও। এদের বাসা চমৎকার। তারপর যেসব পাখি খুব চতুর ব'লে বিখ্যাত, অথচ যারা মানুষ-ঘেঁষা—যেমন ধরুন কাক, দাঁড়কাক, চড়াই, হাঁড়িচাঁচা, চিল—এদের ডিমও ছিটছিট। এ সবের ব্যতিক্রম অনেক আছে, যেমন ধরুন ময়ুর, বটের, জলপিপি, কাদাখোঁচারা খুব যে মানুষ-ঘেঁষা তা নয়, কিন্তু ওদের ডিমেও চমৎকার বর্ণ-বৈচিত্র্য। তবু কিন্তু একটা কথা মনে হয়—"

বৈজ্ঞানিক চুপ ক'রে গেলেন।

"কি কথা?"

"মনে হয়, এরা শিল্পী-মানুষকে মুগ্ধ ক'রে শত্রুর হাত থেকে নিজেদের ডিমকে বাঁচাতে চাইছে। এরা মানুষের শিল্প-বোধকে কোন না কোন উপায়ে তুষ্ট করে। হয় গান গেয়ে, না হয় সুন্দর বাসা বানিয়ে, না হয় ডিমের রঙ দিয়ে এরা আমাদের মুগ্ধ ক'রে যেন নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। ওদের গুণ দেখে আমরা যেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে ওদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি মনে মনে। যাদের বাসা খুব সাধারণ কিংবা যাদের গানের গলা তেমন নেই, যাদের ডিম সাদা, যারা গর্তে বাসা বানায়, অথচ যারা মানুষের সান্নিধ্যে থেকে মানুষের প্রতাপের সহায়তা কামনা করে (কামনা করে কিনা জানি না, এটা আমার থিয়োরি), তাদের দেখবেন প্রায়ই রূপ আছে। দেখতে চমৎকার। কাঠঠোকরা, ভগীরথ, বসন্তবৌরি, হুপো, কুকো, টিয়া, চন্দনার দল,

বাঁশপাতি, মাছরাঙা, হরিয়াল, পায়রা, ঘুঘু, পিট্টা, নানারকম হাঁস। ময়ূর, বটের, জলপিপি, কাদাখোঁচাদেরও এই দলে ফেলতে পারেন। যারা চমৎকার নয়, তারা আবার অদ্ভুত—যেমন প্যাঁচা, শকুনি, হাড়গিলা, মানিকজোড়, সোনাজঙ্ঘা প্রভৃতি। এরা অদ্ভুত রস দিয়েই বোধ হয় মানুষের রসবোধকে তৃপ্ত করে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে এরা বিপদেও পড়েছে হয়তো একটু, কারণ মানুষও এদের উপর কম অত্যাচার করে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষই বোধ হয় একমাত্র জীব যারা জ্ঞাতসারে এদের রক্ষণাবেক্ষণও করে নিজেদের রসবোধের তাগিদে। এরা বোধ হয় সেটা বুঝেছে, তাই মানুষের কাছাকাছি এসে নানা ভাবে তাকে আনন্দ দিচ্ছে আর তার বদলে আদায় করছে নিজেদের রক্ষণাবেক্ষণ। অনেকটা সিম-বায়োসিস ধরনের। পাখিদের পূর্বপুরুষ সরীসৃপ। বেশির ভাগ সরীসৃপদের ডিম সাদাই হয়, তাই বোধ হয় অনেক পাখির ডিমও সাদা, আর যাদের ডিম সাদা তারা প্রায়ই ডিম পাড়ে গর্তে—লুকিয়ে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, যাদের ডিম সাদা, তাদের ডিমেও মাঝে মাঝে রঙের ছিটেফোঁটা লাগছে। ডিমের রঙ বদলাচ্ছে এমন পাখি অনেক আছে—কালীশ্যামা, হাঁড়িচাঁচা এর অতি সাধারণ উদাহরণ। নানারকম রঙের ডিম হয় এদের। দর্জিপাখি, ভরত, বাগেরি, টুনটুনি, নাইটজার, বাজ, তিলেবাজ, ময়ূর, রেন কোয়েল, জলমুরগি, কায়েম, সারস, ছকুনা, গাঙচিল, কালো তিতির প্রভৃতি অনেক পাখি আছে যারা একাধিক বর্ণের ডিম পাড়ে। মনে হয়, ডিমের রঙ নিয়ে এরা যেন পরখ করছে, কোন্‌টা মানুষের পছন্দ হবে। অর্থাৎ পাখিরা যত আধুনিক হচ্ছে, তত যেন তারা মানুষের মনোহরণ ক'রে মানুষের বন্ধুত্ব কামনা করছে। মানুষদের মধ্যেও যেমন বিশ্ব-মৈত্রীর ভাব জাগছে ক্রমশ, মানুষ ক্রমশ যেমন হিংসার পথ ত্যাগ ক'রে প্রেমের পথ আনন্দের পথ বেছে নিচ্ছে, আনন্দ দিচ্ছে, আনন্দ পাচ্ছে, পাখিদের মধ্যেও

সেইরকম কিছু একটা হচ্ছে হয়তো। তা না হ'লে এত বর্ণ-বৈচিত্র্যের কোনও মানে হয় না যেন। এসব কিন্তু আমার কল্পনা। যুক্তির নিক্তিতে ওজন ক'রে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এটাকে দাঁড় করানো শক্ত। প্রথমত, পাখিদের ডিমে পাখিরা সজ্ঞানে রঙ ফলায় না, যদিও অবশ্য ডিমের গায়ের রঙ ডিমটা ডিম্বকোষ থেকে বেরোবার পর ডিমটা যখন ডিম্বনালীতে আসে তখন লাগানো হয়, দ্বিতীয়ত—"

কাঠঠোকরাটা ডেকে উঠল আবার।

"চলুন, ওঠা যাক। বিজ্ঞানের অংশটুকু লেখা হয়ে গেছে। কল্পনার তো শেষ নেই। উঠুন। কাঠঠোকরাটাকে দেখা যাক। চলুন, আর দেরি করবেন না। আসুন—"

তড়াক ক'রে নেবে পড়লেন বৈজ্ঞানিক বারান্দা থেকে। ডানাও নাবল। পিছু ফিরে ডানার দিকে চেয়ে বৈজ্ঞানিক বললেন, "আমরা যেটার ডাক শুনলাম, সেটা হচ্ছে Golden-backed Woodpecker। এ অঞ্চলে আর একরকম আছে, সেটাকে বলে মারহাট্টা Wood-pecker। হিমালয় অঞ্চলে আরও দেখা যায় কয়েকরকম। এসব দেশেও আরও দু-একটা ছোট জাতের কাঠঠোকরা আছে। এই Golden-backed Wood-peckerই তিন রকম আছে—"

আবার ডেকে উঠল কাঠঠোকরা।

সিঁড়িটা দিয়ে তড়বড় ক'রে নেবে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তাড়াতাড়ি নাবতে গিয়ে ডানার শাড়িটা গেল জুতোর সঙ্গে আটকে। ঘাড় ফিরিয়ে তা দেখতে পেয়েই বৈজ্ঞানিক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর উঠে এলেন তাড়াতাড়ি এবং হাঁটু গেড়ে ব'সে ছাড়াতে লাগলেন সেটা।

"থাক্ থাক্, আমি নিচ্ছি ঠিক ক'রে"—ডানা প্রতিবাদ ক'রে উঠল।

"তাতে কি হয়েছে। ছটফট করবেন না। বকলশের কাঁটার সঙ্গে আটকে গেছে পাড়টা। বকলশওয়ালা জুতোগুলো শাড়ির সঙ্গে খাপ খায়না ঠিক। এই হয়েছে—"

বৈজ্ঞানিক উঠে দাঁড়ালেন। ডানার মুখের দিকে হাসিমুখে চেয়ে বললেন, "চলুন—"

ডানার গালের পাশটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল। ডানার পরনে ছিল সবুজ রঙের শাড়ি একখানা। বৈজ্ঞানিকের হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল, জাভায় একরকম সবুজ রঙের বনমুরগি আছে, তারা blush করে। মনে কোনও রকম আনন্দ বা উত্তেজনার সঞ্চার হ'লে সমস্ত মুখটা লাল হয়ে ওঠে তাদের। টার্কিদেরও হয়,··· ডানার কথা ভুলে এই কথাই ভাবতে লাগলেন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে।

ডানার মনের ভিতর অদ্ভুত একটা আলোড়ন চলছিল। হঠাৎ তার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল এই শিশুপ্রকৃতির মানুষটিকে। দুরন্ত নদের মত দুর্দম বেগে ব'য়ে চলেছে যেন। কি গভীর আর কি পবিত্র! কোন অহমিকা নেই, কোন সঙ্কোচ নেই, কোন গ্লানি নেই। হঠাৎ ভয় পেয়ে গেল সে। সেই কল্পিত গহ্বরটা ভেসে উঠল মানসপটে। রত্নপ্রভার মুখটাও।

···কবি আসছেন দেখা গেল। বৈজ্ঞানিক এগিয়ে গেলেন তাড়াতাড়ি।

"বাটান একটাও নেই। কাদাখোঁচাদেরও দেখতে পেলাম না। বকের সারি ব'সে আছে কেবল। দু-একটা সাদা-মাথা খঞ্জনও দেখলুম। ভারি আনন্দ পেলাম আজ"

"নতুন কিছু দেখলেন?"

"নতুন কিছু নয়, সবই পুরনো, কিন্তু চমৎকার। দোয়েল ডাকছে, চোখগেল ডাকছে, কোকিল ডাকছে, দুর্গাটুনটুনি ছটফট ক'রে বেড়াচ্ছে। মাঠে গম কাটা হচ্ছে, সরষে কাটা হচ্ছে। আমের

মুকুলের গন্ধে আমোদিত চারিদিক। অশ্বত্থগাছগুলো ভ'রে উঠেছে সবুজ কচি পাতায়। সজনে গাছে সজনে ঝুলছে। গাছটা যেন সহস্র আঙুল বাড়িয়ে মাটিকে ছুঁতে চাইছে আবার। অপরূপ হয়ে উঠেছে নিমগাছটা। আমড়াগাছের ডালে ডালে সবুজ শিখায় লেগেছে সোনালী রঙ, মরকতমণির মত ছোট ছোট ফল ধরেছে। আতাগাছে পরশু পর্যন্ত কিছু ছিল না, আজ ভিড় ক'রে এসেছে কিশলয়ের দল তার গাঁটে গাঁটে। ঘেঁটুফুল ধরেছে, মনে হচ্ছে, সবুজ ছোট একটি মুখ উঁকি দিচ্ছে যেন লাল ঘোমটার ভিতর থেকে। তেলাকুচো ফলগুলো পেকে টুকটুকে লাল হয়েছে…"

কবি সোৎসাহে ব'লে চলেছিলেন, আরও হয়তো বলতেন, কিন্তু বাধা দিলেন বৈজ্ঞানিক।

"কবিতা লিখেছেন নিশ্চয় ?"

"লিখেছি। একটা পাখির বিষয়ে"

"কি পাখি ? আসুন, বসা যাক এইখানটায়। এইখান থেকে চারিদিক দেখা যাবে বেশ, কাঠঠোকরাটাকে দেখবার সুবিধে হবে। কোন্ পাখির বিষয়ে কবিতা লিখলেন ? বক ছাড়া তো বিশেষ কিছু দেখেন নি বলছেন"

"না, আর একটা পাখিও লক্ষ্য করেছি। আপনি সেদিন যে একটা বই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে এর ছবি দেখেছিলাম। আমাদের দেশে পাখিটার নাম কানাকুয়া। বইয়ে লিখেছে—কুকো।"

"ও, দেখেছেন ? ক্রো-ফেজান্ট (Crow Pheasant), চমৎকার পাখি, নয় ? বেশ একটু বিশেষত্ব আছে"

"অদ্ভুত ধরনের"—ব'লে উঠলেন কবি, "বেশ একটু রহস্যময়। আমাদের আশেপাশেই থাকে, কিন্তু ওরই মধ্যে বেশ একটু দূরত্ব বাঁচিয়ে চলে। কাক বা শালিকের মত খেলো হয়ে যায় নি। ও দিকটায় ব'সে ছিলাম, হঠাৎ দেখি, ঝোপের আড়াল থেকে বেরুল,

বেশ গম্ভীরভাবে ভারিক্কি চালে ঘুরে বেড়াতে লাগল শ্যাওড়াগাছের ওপাশে যে নির্জন জায়গাটুকু আছে সেইখানে। কালো রঙের সঙ্গে ডানার বাদামী রঙটা মানিয়েছে চমৎকার। কুকো নামটা ভাল নয়, কানাকুয়ো নামটাও না। আমি ওর নাম দিয়েছি বাদামী-কালো। ভাল হয় নি ?"

"বেশ হয়েছে! ওরা কিন্তু জাতে কোকিল, তা জানেন ?"

"হ্যাঁ, আপনার বইটাতে পড়লাম তাই। দেখলে মান্য হয়, রিটায়ার্ড ডেপুটি বা মুন্সেফ গোছের, ফাজিল ফক্কোড় নয়, নিজের মতে নিজের পথে চলবার মত মনের জোর আছে ব'লে মনে হয়। নিজেই বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে, যদিও কোকিল। ডাকে প্যাঁচার মত, কিন্তু নিশাচর নয়—"

"গুপ্ গুপ্ গুপ্ গুপ্"—হঠাৎ ডেকে উঠল বাদামী-কালো।

"আপনার ডাকে সাড়া দিচ্ছে। হ্যাঁ, এক রকম প্যাঁচার ডাকও অনেকটা ওই রকম, আপনি পড়াশোনা করেছেন দেখছি"

"ওর বিষয়েই কবিতাও লিখে ফেলেছি একটা। শুনবেন ?"

"নিশ্চয় শুনব। পড়ুন।"

কবি ডানার দিকে ফিরে দেখলেন, ডানা ঘাড় ফিরিয়ে নির্নিমেষে চেয়ে আছে পরপারের দিকে। গালের পাশটা লাল হয়ে রয়েছে তখনও।

একটু গলা-খাঁকারি দিয়ে কবি পড়তে লাগলেন—

বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল ক'রে ?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।
বিদ্রোহী পিক, কোকিল অথচ কোকিল নয়,
সমাজ-বিধিকে অমান্য ক'রে থাকে।

কোকিলের মত ডাকবে না কুহু-কুহু
কিছুতেই নয়—উঁহু—

দিনের আলোয় প্যাঁচার মতন ডাকবে
কোকিলের মত কালো কালো দুটো ডানা
পছন্দ নয়—না—না—
বাদামী রঙের শাল দিয়ে তাকে ঢাকবে,
আপনার মনে বেড়িয়ে বেড়াবে আস্তে সে
বন-বাদাড়ের ফাঁকে
বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল ক'রে ?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।

পরের বাসায় ডিম সে কখনও পাড়বে না
আপনার ডিমে তা দিতে কখনও ছাড়বে না
বলুক যা খুশি লোকে,
কবি বিরহীর হৃদয় কখনও কাড়বে না।
অজানা বেদনা মনে যদি জমে এসে
হঠাৎ ফেলবে কেশে,
মনে হবে বুঝি ফেটে গেল কারো পাঁজর,
নিঝুম দুপুর চমকাবে বারে বারে
সে কাশির ঝঙ্কারে
মনে হবে বুঝি বাজল কোথাও ঝাঁঝর !
লুকিয়ে তখন চুপ ক'রে ব'সে থাকবে সে
ঘন-পল্লব-শাখে
বাদামী-কালোকে দেখেছ কখনও ভাল ক'রে ?
দেখেছ হয়তো, চেন না কিন্তু তাকে।

কবি থামতেই বৈজ্ঞানিক ব'লে উঠলেন, "বাঃ পাখিটার মোটামুটি জীবন-চরিতই লিখে ফেলেছেন দেখছি। ওর যে 'ঝন্‌ন্‌' ক'রে আর একটা ডাক আছে, সেটাও লক্ষ্য করেছেন উনি—।...এ কি হ'ল !" ডানার দিকে চেয়েই তড়াক ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক।

কবিও দাঁড়ালেন। ডানা শুয়ে পড়েছে, চোখ বোজা, হাত দুটো মুঠো করা।

"ফিট হয়েছে"—বৈজ্ঞানিক বললেন।

"তাই তো দেখছি! কি করা যায়?"—কেঁপে উঠল কবির কণ্ঠস্বর।

দুজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন ক্ষণকাল। ডানার মুষ্টিবদ্ধ হাতটা সাপের মত সঞ্চালিত হতে লাগল ধীরে ধীরে।

"একটু জল দরকার"—বৈজ্ঞানিক বললেন, "চাকরটাকে খবর দেবেন? কিংবা চলুন, আমরা দুজনে ধরাধরি ক'রে ওঁকে বাসায় নিয়ে যাই। আমি পায়ের দিকটা ধরছি, আপনি মাথার দিকটা ধরুন"

চিত্রটা কবির কল্পনায় এমন বিসদৃশ ঠেকল যে, তিনি ব'লে উঠলেন, "না না, সে কি! চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে যাবেন কি! জল আমি এনে দিচ্ছি এখুনি"

ছুটে গিয়ে নিজের চাদরটা তিনি নদীর জলে চুবিয়ে নিয়ে এলেন।

চোখে মুখে জলের ছিটে লাগাতেই উঠে বসেছিল ডানা। সবচেয়ে বিস্মিত হয়েছিল সে নিজেই। এমন ব্যাপার আর কখনও তো ঘটে নি তার জীবনে! হঠাৎ বুকের ভিতরটা তোলপাড় ক'রে উঠল, তারপর সব অন্ধকার। শুয়ে পড়েছিল সে? আশ্চর্য!

"এখন কেমন লাগছে?"—কবি জিজ্ঞাসা করলেন।

"ভালই"

"একটু জল এনে দেব কি আপনাকে? তেষ্টা-টেষ্টা পায় নি তো? রোদের তাত বেড়েছে তো আজকাল"

"না, জলের দরকার নেই"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডানা তারপর সলজ্জকণ্ঠে যা বললে, তা অপ্রত্যাশিত। বললে, "আপনি আমাকে আর 'আপনি' বলবেন না। ভারি লজ্জা করে আমার"

এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না কবি। তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর গলার কাছটা কেমন যেন ব্যথা করতে লাগল। একটু সামলে নিয়ে সহজকণ্ঠেই তিনি উত্তর দিলেন, "ও, আচ্ছা, তা বেশ!"

কিছুক্ষণ নীরবতার পর ডানা বললে, "চলুন, যাই"

"অর্ধবাবু স্ট্রেচার আনতে গেছেন। একটু ব'স"

"স্ট্রেচারের দরকার কি? আমি হেঁটেই যেতে পারব"

উঠে পড়ল ডানা এবং হাঁটতে শুরু করল। কবিও অনুগমন করলেন।

"আমার কাঁধের উপর হাতটা রাখ না হয়। দুর্বল মনে হচ্ছে না তো?"

ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে ডানা বললে, "না। এমনিই যেতে পারব"

"খুব আস্তে আস্তে চল তা হ'লে"

কবির কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম উদ্বেগ ফুটে উঠল। তিনি হয়তো ডানাকে স্ট্রেচারের জন্য অপেক্ষা করতে আর একবার অনুরোধ করতেন, কিন্তু কোথা থেকে ঝঙ্কার দিয়ে ডেকে উঠল একটা পাখি। সুরের তুবড়ি ফুটল যেন শূন্যে। কুর কুর কুর কুর কুর কুর, চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল···। ধাপে ধাপে চড়তে লাগল সুর।

"কি পাখি ওটা?"

"পাপিয়া"

"পাপিয়াই বুঝি 'চোখ গেল' পাখি?"

"হ্যাঁ"

ডানা আর কিছু জিজ্ঞাসা করলে না। কবিও চুপ ক'রে রইলেন। অন্য কোন কারণে নয়, তাঁর মনের ভিতর যা হচ্ছিল তা এত বিচিত্র এত গভীর এত কোমল যে, তাতেই তন্ময় হয়ে পড়েছিলেন তিনি, কথা বলবার প্রয়োজনই অনুভব করছিলেন না। বাসাটার কাছাকাছি এসে তাঁর চমক ভাঙল বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে। দেখা

গেল, তিনি স্ট্রেচার এবং লোকজন নিয়ে আসছেন। রত্নপ্রভাও সঙ্গে আছেন।

"ওঁকে হাঁটিয়ে আনছেন?"—বিস্মিত বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন করলেন শঙ্কিত কণ্ঠে।

"আমার আর কোনও কষ্ট নেই। কেন জানি না, হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল তখন, এখন আর কোনও কষ্ট নেই"

কথা কটি ব'লেই ডানা কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। রত্নপ্রভা গম্ভীরভাবে একবার চেয়ে দেখলেন তার মুখের দিকে। কোনও কথা বললেন না। মনে মনে ডানার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন তিনি খুব, কিন্তু মুখ দেখে তা বোঝা যাচ্ছিল না। আর একবার চাইলেন ডানার দিকে। চোখোচোখি হতেই হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর গম্ভীর মাংসল মুখটা। কোনও কথা বললেন না কিন্তু।

··বাসায় পৌঁছে বৈজ্ঞানিক স্ট্রেচার এবং স্ট্রেচার বাহকদের বিদায় ক'রে দিলেন। তারপর রত্নপ্রভার দিকে চেয়ে বললেন, "আমাদের চা খাওয়াও একটু তুমি। এখানে সব ব্যবস্থা আছে বোধ হয়, না?"

"আছে। আমিই ক'রে খাওয়াচ্ছি, উনি কষ্ট করবেন কেন?"

ডানা উঠে ভিতরে গেল। রত্নপ্রভার গম্ভীর চোখে হাসির আভাস ফুটে উঠল আবার একটা। ডানার পিছু পিছু তিনি ভিতরের দিকে চ'লে গেলেন। কবি এবং বৈজ্ঞানিক ব'সে রইলেন বারান্দায়। পাপিয়াটা সামনে ডেকে চলেছে। বৈজ্ঞানিক এই প্রসঙ্গে কিছু বলবেন ভাবছিলেন কবিকে, কিন্তু বাধা পড়ল। পিওন হাজির হ'ল একটা। বললে, সে আনন্দবাবুকে খুঁজছে, টেলিগ্রাম আছে একটা। কবি ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে পড়লেন টেলিগ্রামটা। বিনয়ের বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। তাঁদের নেবার জন্যে লোক আসছে।

কবি চায়ের জন্য আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। বাড়ি চ'লে গেলেন।

৮

বিনয়ের বিয়েতে যাবার ইচ্ছে কবির ছিল না। প্রথমত, বিয়ে-বাড়ির গোলমাল ভালই লাগে না তাঁর; দ্বিতীয়ত, ভয় হচ্ছিল, ডানাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মানস-সরোবরে যে অপরূপ পদ্মটি ফুটছে ধীরে ধীরে, তা ঝ'রে পড়বে এই সব টানা-হেঁচড়ায়। ডানার প্রেমে প'ড়ে তিনি যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তা ঠিক নয়। হাবুডুবু খাওয়ার বয়স পার হয়েছিলেন তিনি। মানসিক গঠনটাও তাঁর অন্য রকম, তবু তিনি প্রেমেই পড়েছিলেন। চন্দ্রের টানে যেমন জোয়ার আসে, ডানার সংস্পর্শে তাঁর মনে তেমনই এমন একটা ভাবাবেগ উথলে উঠেছিল যা যে কোনও কবির পক্ষে পুলকপ্রদ, অন্য কোনও কারণে নয়, তা কাব্যসৃষ্টির অনুকূল ব'লে। যা সৃষ্টির প্রেরণায় মনকে উন্মুখ ক'রে তোলে, যার স্পর্শে নিমেষে মনের মেঘে ইন্দ্রধনু ফুটে ওঠে, কল্পনা-বীণায় লক্ষ সুরের সম্ভাবনা কাঁপতে থাকে, তাকে উপেক্ষা করা কবি-মনের পক্ষে অসম্ভব, সাধারণ জীবের পক্ষে যেমন অসম্ভব খাদ্যকে উপেক্ষা করা। কাব্যই কবির জীবন, কাব্যেই তার স্ফূর্তি, কাব্যলোকই তাঁর কাছে একমাত্র আনন্দলোক। কিন্তু কাব্যের আনন্দরূপ কবি-মনেও মূর্ত হয় না সব সময়ে, সরসী থাকলেই যেমন কমল ফোটে না। উনপঞ্চাশবায়ু-বাহিত অপরূপ উপলক্ষ্য এসে হাজির হয় অকস্মাৎ কোন অজানা আকাশ থেকে। শিহরণ জাগে, পাখি ডাকে, সাড়া প'ড়ে যায় কিশলয়দের নিদ মহলে, বাঁশী বেজে ওঠে বনে বনে, কাব্য-সুরধনী মর্ত্যে অবতরণ করেন স্বর্গলোক থেকে। আনন্দবাবুর কবি-মন অবসন্ন হয়েছিল যেন এতদিন। ছন্দ মিলিয়ে কবিতা লিখতেন বটে মাঝে মাঝে, কিন্তু তাতে প্রাণ ছিল না। ডানার অভ্যাগমে মরা-খাতে বান এসেছে হঠাৎ, মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছে শুষ্ক তরু। তাঁর সমস্ত সত্তা যেন নূতন ক'রে বিকশিত হয়েছে এই নূতন বৃন্তটির উপর। ডানার প্রেমেই তিনি পড়েছিলেন,

কিন্তু সাধারণত প্রেমে পড়া বলতে যে ধরনের জৈবলীলা বোঝায় এ ঠিক তা নয়। এ তার চেয়ে ঢের বেশি তীব্র। হঠাৎ কোন বাঁশীতে কোনও বংশীবাদক যদি নিজের মনের সুরটি প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়ে যান, তা হ'লে সেই বাঁশীর প্রতি তাঁর যে ধরনের টান হয়, ডানার প্রতি কবির টানটাও সেই ধরনের। যে বস্তুকে অবলম্বন ক'রে মন অবাস্তব কল্পলোকে উড়ে যেতে পারে, ডানা যেন সেই অপরূপ বস্তু, সেই নিখুঁত দেহ-শিল্প, যার মধ্যে দেহাতীতের সন্ধান পাওয়া যায় অপ্রত্যাশিতভাবে। তাই ডানাকে ছেড়ে এখন কোথাও যাবার চিন্তা অসহ্য তাঁর কাছে। কিন্তু মন্দাকিনীকে কি যে বলবেন, তাও তিনি ভেবে পাচ্ছিলেন না। সত্য কথা বলা অসম্ভব। অনর্থকও। মন্দাকিনী তার ঠিক মর্মটি বুঝবেন না। রীতিমত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েই কবি বাড়ি পৌঁছলেন টেলিগ্রামটি নিয়ে। খবরটা শোনামাত্র উল্লসিত হয়ে উঠলেন মন্দাকিনী।

"যাক, শেষ পর্যন্ত খবর একটা পাওয়া গেল তবু। আমার ভয় হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত ভেস্তে গেল বুঝি আবার সব। কালই লোক আসছে ? তা হ'লে তো রাজু ধোপার কাছে এখনই লোক পাঠাতে হয়, একটি গাদা কাপড় তার কাছে। ঠাকুরটাকেই পাঠাই না হয়—"

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। মাত্র একটি দিন হাতে, অনেক কিছু ব্যবস্থা ক'রে যেতে হবে তাঁকে। গিয়েই তো ফিরে আসা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে। অন্তত মাস দুই থাকতে হবে সেখানে। অনেকদিন বাপের বাড়ি যাওয়া হয় নি, ছাড়বে কি তারা সহজে ? তা ছাড়া, খোকনের গ্রীষ্মের ছুটি সামনে। মামাদের আমবাগান ছেড়ে সে কি আর আসতে চাইবে ? এখানকার ব্যবস্থা যতদূর সম্ভব ক'রেই যেতে হবে। এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে কিন্তু মন্দাকিনী এক গুরুতর সমস্যায় প'ড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কবির সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল।

আনন্দমোহন মন্দাকিনীকে খবরটি শুনিয়ে নিজের তেতলার

ঘরটিতে গিয়ে ব'সে ছিলেন চুপ ক'রে। পালে হাওয়া লেগেছে, নৌকাটিকে স্রোতের মুখে ছেড়ে দিয়েছেন, এমন সময় এ কি সর্বনেশে মেঘ দেখা দিলে ঈশান কোণে! বিনয়ের বিয়েতে তাঁর যাবার ইচ্ছে নেই—এর আভাস মাত্র তো প্রকাশ করা যাবে না মন্দাকিনীর কাছে! অসুখের ভান করবেন?

মন্দাকিনী এসে প্রবেশ করলেন।

"ওগো, শুনছ, সুন্দরীকে নিয়ে কি করা যায় বল তো? পোয়াতি গাই, এমনভাবে ফেলে যাওয়া কি উচিত ঠাকুর-চাকরের হাতে? সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া যায় না? সেখানে আমাদের বেশ বড় গোয়াল-ঘর আছে"

"গেল নাকি! গাড়ি পাবে কোথায়? এখন কি আর সেদিন আছে, মানুষই গাড়িতে জায়গা পাচ্ছে না এখন, তা গরু—"

"তা হ'লে উপায়? ও কি, কোমরে হাত বুলোচ্ছ কেন?"

"কোমরটায় ব্যথা হয়েছে"

"তা হ'লে তুমি থেকে যাও না হয়। ওখানে গিয়ে অত্যাচারে আবার বেড়ে যায় যদি। অত্যাচার হবেই, ভিড়ের বাড়ি তো। সেই ভাল। ঠাকুর তো রইল, লোকটা রাঁধে ভাল, মসলার হাতটা কম। তুমি থাকলে সুন্দরীর সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারব। সেই ভাল"

কোমরে হাত বুলোতে বুলোতে কবি বললেন, "ওঁরা আবার মনে করবেন না তো কিছু? বিনয় হয়তো ভাববে—"

"কি আবার ভাববে? কোমরে ব্যথা নিয়ে যেতে হবে তা ব'লে?"

কবি চুপ ক'রে রইলেন। মন্দাকিনী তাঁর দিকে এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, যার অর্থ—বুড়ো বয়সে এমন হুজুকে হওয়ার কোন মানে হয় না।

কবি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন। আকাশে ধপধপে সাদা স্তূপ-মেঘ জ'মে রয়েছে খানিকটা, আর সেই পটভূমিকায়

বিরাট একটা পাখি ডানা মেলেছে। সাদার মাঝখানে কালো। চমৎকার দেখাচ্ছে। দূরবীনটা তুলে নিয়ে দেখলেন। দেখে কিন্তু হতাশ হয়ে গেলেন একটু। শকুনি। তখনই আবার মনে হ'ল, এতে দুঃখ করবার কি আছে? শকুনিও পাখি। সৃষ্টির মহাকাব্যে ওর স্থান দোয়েল-কোকিলের চেয়ে কিছু কম নয়। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা কথাও মনে হ'ল। যুক্তি দিয়ে আমরা যা মানি, কার্যকালে তা মানি কি? নিরপেক্ষতার পোষাকী মুখোশটা দার্শনিকতা আস্ফালন করবার সময়ই ব্যবহার করি আমরা। প্রতি মুহূর্তের কাজে কিন্তু উৎসাহ পাই নিজেদের অতি-সঙ্কীর্ণ ভাল-লাগার প্রেরণায়। পাপিয়া দোয়েলই আমাদের আনন্দ দেয়, শকুনি নয়। শকুনি অতি উপকারী পাখি জেনেও আমরা তাদের আমন্ত্রণ দিতে চাই না ভাল-লাগার ক্ষেত্রে। অথচ উপকারী পাখির উপকারিতাকে আমরা যে তুচ্ছ করি তাও নয়। এই চিন্তাটা অনেকক্ষণ আবিষ্ট ক'রে রাখল কবির মনকে। প্রাচীন গ্রীকদের কথা মনে পড়ল। তাঁরা তাঁদের সমাজব্যবস্থায় মোহিনী এবং কল্যাণী উভয়েরই গৌরব-ময় স্থান নির্দেশ ক'রে দিয়েছিলেন। বিবাহ করতেন স্বাস্থ্যবতী নারী দেখে, যাঁরা সন্তানের জননী হয়ে গৃহলক্ষ্মীর বেদী অলঙ্কৃত করতেন, যাঁরা ছিলেন গার্হস্থ্যধর্মের প্রাণস্বরূপ, জাতির জন্য বীর সন্তান মানুষ হ'ত যাঁদের কোলে। মোহিনী হওয়ার দায়িত্ব তাঁদের ছিল না। মোহিনীদের ক্ষেত্র ছিল স্বতন্ত্র মাধুর্যে বিশিষ্ট। তাঁদের কাজ ছিল মুগ্ধ করা। দার্শনিক বৈজ্ঞানিক শিল্পী কবি রাজা সেনাপতি ছাত্র অধ্যাপক সকলকেই প্রেরণা যোগাত ওই মোহিনীর দল। তাদের মুঞ্জরিত যৌবনশ্রী স্পর্শমণির মত সকল স্বপ্নকেই সোনার স্বপ্ন ক'রে তুলতে পারত। অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন কবি। তারপর হঠাৎ লক্ষ্য করলেন যে, ডানা আর মন্দাকিনীকে অবলম্বন ক'রে মন তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ করেছে। সেই স্বপ্নলোকে সুন্দর হয়ে উঠেছে দুজনেই। ছন্দাবিষ্ট মন বন্দনা করছে দুজনকেই।

স্নিগ্ধ শ্যামল ছোট গ্রামখানি
বাঁধিছে শতেক বন্ধনে
দূর দিগন্তে কার হাতছানি
ডাকিছে অচেনা নন্দনে
চেনা-অচেনার আলো-আঁধারিতে
দোলে অপরূপ হিন্দোলা
পুরাতন মন বলে বারে বারে
নব সুর নব ছন্দ নে।

কত নিঃসাড় হ'ল যে উতলা
অশান্ত হ'ল শান্ত যে
কত লৌহের শান্তি অচলা
নাশিল অয়স্কান্ত যে
দোলে হিন্দোলা সীমা-অসীমায়
শুষ্ক তরুও মুঞ্জরে
পরিচিত পথে পথ ভুলে যায়
অতীব প্রাচীন পান্থ যে।

কবিত াটা লিখে শান্তি পেলেন তিনি। ডানার প্রতি তাঁর মন যে আকৃষ্ট হয়ে ছে—এর একটা সঙ্গত ওজুহাত আবিষ্কার ক'রে ফেললেন যেন। তাঁ র মনে হ'ল, জীবনের এবং জাগতিক ব্যাপারের কোনও কিছুর উপ রই তো হাত নেই তাঁর। বয়স দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে—এ যেমন ি তনি রোধ করতে পারেন না, ডানার প্রতি এই আকর্ষণও তেমনই অ নিবার্য। এও রোধ করার সাধ্য তাঁর নেই। সে চেষ্টা না ক'রে ব রং আত্মসমর্পণ করাই ভাল। শুধু তাই নয়, নিয়তিনির্দিষ্ট এই বিধানে ক মেনে নিয়ে সেটা উপভোগ করাই উচিত। অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এব চটা বিবেকের মোহে প'ড়ে আত্মনির্যাতন করার কোনও

অর্থ হয় না। নিঃসাড়কে যে শক্তি উতলা করে, চক্রবালরেখায় যে অজানার আহ্বান উন্মুখ ক'রে তুলছে সমস্ত চিত্তকে, জড় লৌহকে চঞ্চল ক'রে তুলছে যে অচেনা চুম্বকের মায়া, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ক্ষত বিক্ষত হওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ নেই। কিন্তু আত্মসমর্পণ করলে আনন্দ আছে। জীবনে আনন্দই তো কাম্য। হঠাৎ পুলকিত হয়ে উঠলেন তিনি। শিস দিতে দিতে উঠে দাঁড়ালেন।

…অকস্মাৎ একটা তীক্ষ্ণ সুরে ছন্দিত হয়ে উঠল চারিদিক। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, পুরুষ টুনটুনিটা কল্‌কে ফুলের ডালে ব'সে মুখ উঁচু ক'রে ডেকে চলেছে। কুচকুচে কালো পোষাক প'রে বরবেশে সেজেছে। কাঁঠালগাছে গিয়ে বসল আবার। দুরন্ত দামাল একটা কালো প্রজাপতি যেন। কিংবা এক টুকরো কালো মেঘ। অন্তর্নিহিত বিদ্যুতের দ্যুতি ঠিকরে পড়ছে সর্বাঙ্গ থেকে। আবার ডাকল। মনে হ'ল, মূলতানের আলাপ যেন। হুইট টু হুইট টু হুইট—গুলতানি করতে করতে আবার ছুটে গেল আমগাছের দিকে। ওই যে টুনটুনি-বউ ব'সে আছে আমের মুকুলের আড়ালে। উড়ে গেল অন্য গাছে। আবার নূতন একটা সুরের ফোয়ারা ছড়িয়ে পুরুষ পাখিটা ছুটল তার পিছু পিছু। দুপুরের রোদ তপ্ত হয়ে উঠেছে। এলোমেলো বাতাস বইছে একটু। মাঠে মাঠে গম যবের পক্ক স্বর্ণকান্তিতেও যেন যৌবনের আভাস ফুটেছে। হাওয়ায় দুলে দুলে তারা যেন উপভোগ করছে দামাল টুনটুনি-দম্পতীর প্রণয়লীলা। সমানে ডেকে চলেছে পুরুষ টুনটুনিটা। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎপ্রবাহ উতলা ক'রে তুলেছে প্রকৃতিকে। এক ঝাঁক প্রজাপতির মত উড়ে এল এক ঝাঁক উপমা কবির মনে আকাশে কোন অদৃশ্য স্বপ্নলোক থেকে। ছন্দের আবেগে কাঁপতে লাগল মন। টেবিলে গিয়ে বসলেন। টুনটুনির উদ্দেশে কবিতা লিখতে শুরু করলেন।

কুচকুচে রঙ ছোট্ট পাখি
গাইল কি সুর মূলতানই ?
বুকফাটা এ কান্না নাকি
কিংবা কেবল গুলতানই !
নাইক মুকুট নাই জড়োয়া
নাই তবু তার কুছ পরোয়া
তম্বি ক'রে বেড়ায় যেন
হাবশীদেশের সুলতানই ।

আলোর বানে দিচ্ছে পাড়ি
আঁধার নায়ের মাল্লা নাকি
কাশিম মিঞার খুঁজছে বাড়ি
মরজিনার আবদাল্লা নাকি

টুনটুনি-বউ কোথায় ওগো
বসলে গিয়ে কার ডালে
রোদ-বাহারি গান শোন গো
তাল দাও না তার তালে ।
কান্না ও কি লক্ষ হিয়ার
মেঘদূত কি যক্ষ-প্রিয়ার
চোখের তারা কোন্ তন্বীর
জীবন্ত তিল কার গালে ?

সূ[illegible] হাপর থেকে
ছিটকে এল কয়লা নাকি
কিংবা এল দ্বাপর থেকে
সেই কেষ্ট গয়লা নাকি !

৬

আলোক-ধোয়া কয়লা ও যে
আগুন জ্বলে ওর বুকে
রাজার ছেলে গয়লা ও যে
রাধার বাঁশী ওর মুখে
চিরন্তনের ওই নমুনা
গঙ্গাবুকে ওই যমুনা
বইছে সুখে তোয়াক্কা নেই
আজ কাল বা পরশুকে।

মহাকালের শুভ্র ভালে
মহাকালীর টিপটি যেন
সমুদ্রেরি ঊর্মিজালে
মাটির ছোট দ্বীপটি যেন

৭

সেদিন সহসা অজ্ঞান হয়ে পড়ার পর থেকে ডানা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে আছে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার সঙ্গত একটা কারণ খুঁজে বার করবার জন্যে আকুল হয়ে উঠেছে সে মনে মনে। হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে দুজন স্বল্পপরিচিত পুরুষের সামনে এমনভাবে নিজের শালীনতাকে ক্ষুণ্ণ করলে কেন সে? কোনও উঁচু জায়গা থেকে হঠাৎ পদস্খলিত হয়ে প'ড়ে গেলে অনেক সময় লোক যেমন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তারও কি সেই ধরনের কিছু হয়েছিল? সেও কি নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও [illegible] সঞ্চরণ ক'রে বেড়াচ্ছিল মনে মনে? কোথায়? ভাবাবেগের আতিশয্যে লোকে সংজ্ঞা হারায়

শোনা গেছে। তারও কি তাই হয়েছিল? সেও কি কোনও অন্তর্নিরুদ্ধ ভাবাবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছিল? কি ধরনের ভাবাবেগ? মনে তো পড়ে না কিছু! কিছুই নির্ণয় করতে পারছিল না সে। কিন্তু এ কথাও সে ভুলতে পারছিল না যে, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। এমন একটা কিছু যা উপেক্ষণীয় নয়, যা হয়তো ইঙ্গিতে এমন একটা সত্য প্রকাশ করতে চেয়েছে যার নিগূঢ় মর্ম তার মর্মবাণীরই অভ্যাস। বীজকে বিদীর্ণ করে যেমন অঙ্কুরের আগ্রহ, ঝড়ের প্রাবল্যে সূচিত হয় যেমন বায়ু-চাপের অসাম্য, তেমনই প্রবল অমোঘ কোনও শক্তি সেদিন ঘোষণা ক'রে গেছে তার অন্তর্নিহিত অস্তিত্ব, জানিয়ে গেছে তার জাগরণের বার্তা।...

নিজের ঘরের বারান্দায় চুপ ক'রে ব'সেছিল সে একটা ক্যাম্প-চেয়ারে। ফিট হওয়ার পর থেকে কেমন যেন দুর্বল বোধ করছে সে। মনে হচ্ছে, যেন কতকাল অনাহারে আছে। হঠাৎ নদীর ধারের শিমুলগাছটা চোখে পড়ল। বিশাল বলিষ্ঠ গাছটা লাল লাল ফুলে ভ'রে রয়েছে। ফুল নয়, ওর বলিষ্ঠতাটাই বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল। চোখে পড়ল ওর দুর্দম পৌরুষটা। মনে হ'ল, কত শীতাতপ, কত বর্ষা, কত ঝঞ্ঝা, কত বজ্রপাত সহ্য ক'রে যুগযুগান্ত দাঁড়িয়ে আছে ও মাথা উঁচু ক'রে। কি একটা পাখি যেন বাসা বাঁধছে ওর ডালে। অমরবাবু বই দিয়েছিলেন একটা পড়বার জন্যে, কোলের উপর ছিল সেটা এতক্ষণ, উলটে পালটে দেখতে লাগল সেটা। মন কিন্তু বসল না। চোখ বার বার ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল ওই বলিষ্ঠ শিমুলগাছটাকে, আর মন উৎসুক হয়ে উঠল পাখির বাসাটা দেখবার জন্যে। বইটা রেখে উঠে পড়ল সে। নদীর ধারে শিমুলগাছটার দিকে এগিয়ে গেল। কাছেই সজনেগাছের উঁচু ডালে ব'সে ছিল একটা নীলকণ্ঠ পাখি। আস্তে আস্তে ল্যাজ দুলিয়ে দুলিয়ে ড্যা ড্যা ড্যা ধরনের শব্দ করছিল কিছুক্ষণ থেমে থেমে। ডানাকে দেখে হঠাৎ সেটা উড়ল পাখা

মেলে উচ্ছ্বসিত কলরবে চতুর্দিক সচকিত ক'রে। ডানার মনে হ'ল, তাকে দেখে অট্টহাস্য ক'রে ব'লে উঠল যেন—এসেছে, এসেছে, ও-ও এসেছে এবার। ডানা শিমুলগাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াল, নূতন ক'রে বিস্মিত হ'ল সে আবার শিমুলগাছের শিকড়গুলো দেখে, কেবল বিস্মিত নয় রোমাঞ্চিত হ'ল। বলিষ্ঠ শিকড়গুলো কি প্রবল শক্তিতে আঁকড়ে আছে মাটিকে, কি দুর্বার আগ্রহে ঢুকে গেছে মাটির ভিতর! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে কিছুক্ষণ তারপর একটু ঝুঁকে হাত দিয়ে স্পর্শ করলে সেগুলোকে। স্পর্শ ক'রে কেমন যেন আনন্দ হ'ল একটু। তারপর বসল তার উপরে বর্ষাকালে নদীর স্রোতে মাটি ধুয়ে গেছে, বেরিয়ে গেছে শিকড়গুলো নিশ্চল একটা অক্টোপাস যেন। নিশ্চল, কিন্তু সজাগ, সজাগ এবং সক্রিয়। প্রতি মুহূর্তে শোষণ করছে রস। প্রাণরস একটু দূরে একটা গোদা চিল এসে বসল মাঠের উপর। নখে ক'রে কি যেন এনেছে। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল। ডানা চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল মুগ্ধ বিস্ময়ে। ওই হিংস্র পাখিটার হিংস্রতার মধ্যে একটা বিরাট সত্যকে প্রত্যক্ষ করলে লাগল যেন সে। প্রত্যক্ষ করতে লাগল, কি বিচিত্র প্রেরণায় বিকশিত হচ্ছে জীবনের নব নব রূপ অভিব্যক্তিতে! চরাচরের সমস্ত কিছুই বাঁচতে চাইছে, উপভোগ করতে চাইছে নিজের অস্তিত্বকে নানাভাবে এবং তার জন্যে না করছে এমন জিনিস নেই। ভাল-মন্দ, শ্লীল-অশ্লীল, সভ্য-অসভ্য, হিংস্র-অহিংস্র সব কিছুই হচ্ছে সে জীবনকে সার্থক করবার প্রেরণায়। সে বাঁচতে চায়, অমৃত চায় এবং সেই জন্যেই চায় এমন একটা আশ্রয়, যাকে অবলম্বন ক'রে সে হাত বাড়াতে পারে আকাঙ্ক্ষিত অমৃতের দিকে। পায়ের তলায় মাটির আশ্রয় না থাকলে আকাশের দিকে তাকানো যায় না, সাগরের রহস্য জানতে হ'লে তরণী চাই। আনন্দসুধা পান করতে হ'লে চাই একটা পাত্র। ডানার মনে হ'ল, তার তো কিছু নেই। তার···হঠাৎ সে যেন

সেদিনের ফিটের কারণটা আবিষ্কার ক'রে ফেললে। মনে হ'ল, অন্তরের গহনলোকে তার গোপন সত্তা স্বপ্ন-প্রাসাদের শিখরে উঠে বোধ হয় উন্মুখ হয়ে উঠেছিল অমৃতের পিপাসায়, হঠাৎ পদস্খলন হয়েছিল তার সেখান থেকে। অলীক স্বপ্ন-প্রাসাদ স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল, কিন্তু শূন্য-লোক থেকে তার আকস্মিক পতনটা মূর্ত হয়ে রইল তার মূর্ছায়। সমস্ত চেতনাই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল তার সে দিন। অন্ধকার হয়ে গেল যেন চতুর্দিক।

...অবলম্বন? শূন্য দৃষ্টিতে সে নদীর দিকে চেয়ে ব'সে রইল। চিলটা উড়ে গেল। দূরে দেখা গেল একটা মাছরাঙাকে, দেখতে দেখতে কাছে চ'লে এল। সাদা রঙে কালোর ডোরা কাটা। জলের দিকে একাগ্র দৃষ্টি রেখে উড়ে আসছিল। সহসা স্থির হয়ে গেল শূন্যে, পাখা দুটো নড়তে লাগল কেবল, তারপর হঠাৎ জলের উপর ছোঁ মেরে উড়ে চ'লে গেল আবার। পদশব্দ শুনে ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, অমরেশবাবু আসছেন হনহন ক'রে।

"আপনি এখানে? স্যাণ্ড পাইপার (Sand Piper) দুটোকে দেখছেন বুঝি? এই বোধ হয় লাস্ট ব্যাচ, এইবার ওরা এ দেশ ছেড়ে চ'লে যাবে। স্যাণ্ড পাইপারগুলো অবশ্য সবচেয়ে শেষে যায়, এপ্রিল মে পর্যন্ত থাকে"

"কোন্‌গুলো স্যাণ্ড পাইপার? আমি দেখতে পাই নি তো!"

"ওই যে ওপারে জলের ধারে ধারে ঘুরছে। এইটে নিয়ে দেখুন"

গলায় ঝোলানো বাইনাকুলারটা খুলে ডানাকে দিলেন তিনি। ডানা দেখতে লাগল।

"দেখতে পেয়েছেন?"

"পেয়েছি। কিন্তু ওগুলো স্নাইপ নয়?"

"না। স্নাইপের মত, কিন্তু স্নাইপ নয়। স্নাইপের লক্ষণগুলো সেদিন বলেছিলাম, মনে আছে নিশ্চয়?"

বাইনাকুলারটা বৈজ্ঞানিককে দিয়ে ডানা হেসে উত্তর দিলে, "সব মনে নেই। ফ্যানটেল আর পিনটেল—এই হুটো কথা মনে আছে খালি"

বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টিও হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

"আচ্ছা, আর একদিন বলব এখন। আমাদেরই মনে থাকে না, আপনি তো মাত্র একদিন শুনলেন। এখন শুনুন যে জন্যে এসেছিলাম। হুটো রেডস্টার্ট ডিসেক্‌ট্‌ করেছিলাম, তাদের ওভারিগুলোর সেক্‌শন ক'রে স্টেন ক'রে মাউণ্ট ক'রে ফোটো তুলেছি, এগুলো আমার ওই মাইগ্রেশনের (Migration) প্রবন্ধের সঙ্গে রেখে দিতে হবে। প্রবন্ধটা তো আপনার কাছে আছে?"

"হাঁ, টাইপ করা হয়ে গেছে"

"ওর সঙ্গেই গেঁথে রাখতে হবে ফোটোগুলো"

"আর কটা রেডস্টার্ট আছে? সবগুলোকেই ডিসেক্‌ট্‌ করবেন নাকি?"

"না, বাকিগুলোকে ছেড়ে দিলাম আজ। রিং পরিয়ে দিয়েছি প্রত্যেকটার পায়ে। অনর্থক কষ্ট পাচ্ছিল বেচারারা"

"বেশ করেছেন"

আনন্দিত হয়ে উঠল ডানা খবরটা শুনে। এতদিন সে অনুভব করছিল, রেডস্টার্টগুলোর অবস্থার সঙ্গে তার নিজের অবস্থার কোথায় যেন মিল আছে একটা।

"এবার আর একটা নতুন এক্সপেরিমেণ্ট করব"

"কি?"

"এই তো ফেব্রুআরি মাস শেষ হচ্ছে, এইবার পাখিরা বাসা বানাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে। আমি নানা জায়গায় কয়েকটা বাসা বানিয়ে দেব ভাবছি, দেখা যাক, তার কোনটাতে কেউ আসে কি না! আপনার এখানেও দেব কয়েকটা, আপনিও লক্ষ্য রাখতে পারবেন"

"পাখির বাসা আপনি কি ক'রে বানাবেন ? যন্ত্র অ নাকি কোন রকম ?"

না না, পাখির বাসা বানাব না ঠিক। আমি কাঠ দিয়ে এমন কয়েকটা আশ্রয় ক'রে দেব যার ভিতর ওরা বাসা বাঁধতে প্রলুব্ধ হবে, অবশ্য হবে কি না সন্দেহ, কারণ ওরা ভারি চালাক। বিশেষত যারা গাছের ডালে কিংবা ঝোপে বাসা করে, তারা কেউ আসবে না। বুলবুলি, ওরিওল (আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন কনকসখি), রা কেউ আসবে না। তবে কতকগুলো মানুষ-ঘেঁষা পাখি আছে, শালিক, চড়াই—এরা আসতে পারে। গাইয়ে পাখিদের মধ্যে দোয়েল, সিপাহী বুলবুল অনেকটা মানুষ-ঘেঁষা, কিন্তু ওরা আসবে না। আর আসতে পারে যারা স্বভাবত গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে, যেমন ধরুন বসন্ত-বউ, ভগীরথ, কাঠঠোকরা, ময়নারা, নীলকণ্ঠ, হুপো (আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন মোহনচূড়া), প্যাঁচা—ওহো, একটা জিনিস ভুলে গেছি তো, এইখানে গেল বছর হুতোম প্যাঁচা দেখেছিলাম ওই দিকটায়। ওরা নদীর ধারেই সাধারণত থাকে। এই সময়েই ওরা ডিম পাড়ে, আসুন তো, এখনই খোঁজ করা যাক"

বৈজ্ঞানিক সহসা ঘুরে খানা-খন্দ বনবাদাড় ভেঙে নদীর তীরে তীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। ডানাও অনুসরণ করতে লাগল। এবড়ো-খেবড়ো নদীর পাড়, মাঝে মাঝে গর্ত, কাঁকর আর পাথরের টুকরো ছড়ানো চারিদিকে। এসবের দিকে দৃক্‌পাত মাত্র না ক'রে বৈজ্ঞানিক এগিয়ে যাচ্ছিলেন। ডানার যেতে বেশ অসুবিধা হচ্ছিল, তবু যাচ্ছিল সে। বৈজ্ঞানিক ডানার দিকে একবারও ফিরে তাকান নি, কিন্তু একটা বড় গর্ত লাফ দিয়ে পার হবার পর সহসা তাঁর খেয়াল হ'ল যে, ডানা বোধ হয় এটা লাফিয়ে পার হতে পারবে না। পিছন ফিরে তাকালেন তিনি। দেখলেন, ডানা অনেক দূর পিছিয়ে পড়েছে। দাঁড়িয়ে রইলেন। গর্তটার ওপারে ডানা এসে হাজির হ'ল একটু পরে।

"ওটা লাফিয়ে পার হতে পারবেন ?"

"না"

"তা হ'লে এক কাজ করুন, আপনি গর্তটার ভিতর নে এদিকে চ'লে আসুন। আমি হাত ধ'রে আপনাকে তুলে নি এদিক থেকে"

তাই হ'ল। গর্তটার ভিতর ডানা কোন রকমে ছেঁচড়-মেচড়ে নেবে পড়ল, তারপর এগিয়ে গেল অমরবাবুর দিকে। অমরবা ঝুঁকে হাত বাড়ালেন। অমরবাবুর হাত ধরতে ক্ষণিকের জন্য দ্বিধ এল ডানার মনে, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যই। বৈজ্ঞানিকের বলিষ্ঠ আকর্ষণে পরমুহূর্তেই সে উপরে উঠে পড়ল।

"চলুন, আর বেশি দূর নেই। ওই উঁচু পাড়টার উপর যে গাছটা ঝুঁকে রয়েছে—"

দূরবীন দিয়ে দেখলেন একবার গাছটাকে।

"হ্যাঁ, গাছের গুঁড়িতে গর্তটা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। খুব সম্ভব বাসা আছে ওখানে, চলুন, যাওয়া যাক"

আবার অগ্রসর হতে লাগলেন বৈজ্ঞানিক। এদিকটার প আরও খারাপ। কেবল উঁচু-নীচু। বড় বড় পাথর প'ড়ে আ চারিদিকে। পুরোনো বাড়ির ভাঙা দেওয়াল একটা হুমড়ি খে প'ড়ে রয়েছে এক দিকে। কারও বাড়ি ছিল বোধ হয় এখানে কোন কালে। ডানার চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তবু যাচ্ছিল সে। বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তার সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক—এই সত্যটাকে ফাঁপিয়ে ফেনিয়ে এই কষ্টটাকে ডানা তীব্রতর ক'রে তুলতে পারত, কিন্তু সে কথা তার মনেই হ'ল না। তার এসব কিছুই মনে হচ্ছিল না। অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল তার একটা। অতীত জীবনে ফিরে গিয়েছিল সে হঠাৎ। খুব ছেলেবেলায় সে তার বাবার সঙ্গে একবার একটা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। রাত কাটাতে হয়েছিল সেই পাহাড়ে একটা ডাকবাংলায়। মাঝরাত্রে

ৎ ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার। সেই অচেনা জায়গায় নিশীথরাত্রে মনে যে অদ্ভুত অবর্ণনীয় ভাব জেগেছিল, সেইটে যেন ফিরে ল হঠাৎ আবার এই রৌদ্রালোকিত প্রখর মধ্যাহ্নে এতদিনের র। তা ভয় নয়, দুর্ভাবনাও নয়। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে একা ছানায় শুয়ে তার সমস্ত চিত্ত যেন একাগ্র হয়ে উঠেছিল, কিসের ত্যাশায় তা সে জানে না। কিন্তু উৎসুক উৎকর্ণ হয়ে সে একটা কছু আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছিল। কিসের, তা সে তখনও জানত া, জানে না। কিন্তু প্রতীক্ষা করছিল। তার কেবলই হচ্ছিল, একটা অভূতপূর্ব কিছু ঘটবে বুঝি এখনই। গভীর াত্রির নৈঃশব্দ্যকে আরও নীরব বা সহসা সচকিত ক'রে দেখা দেবে স। হয়তো সে রূপকথার রাজপুত্র, কিংবা আরব্য-উপন্যাসের দৈত্য, ানস সরোবরের শ্বেতকমল বা কাব্যলোকের ওমার-খৈয়াম···ধীরে ীরে মর্মরধ্বনি উঠেছিল সূচীভেদ্য তমসার মর্ম ভেদ ক'রে, নিস্তব্ধতা ন্দ পাচ্ছিল ধীরে ধীরে, সে চুপ ক'রে শুয়েছিল বিনিদ্র নয়নে·

"একটা মুশকিল হ'ল কিন্তু। ওঠা যাবে কি ক'রে?"

বৈজ্ঞানিকের কণ্ঠস্বরে ডানা আত্মস্থ হ'ল। দেখলে, বৈজ্ঞানিক ধ্বর্মুখ হয়ে হেলানো গাছের গুঁড়িটার দিকে চেয়ে আছেন। উঁচু াড়ের উপর হেলে আছে বিরাট বটগাছটা।

"ওই গর্তটা দেখতে পাচ্ছেন—ওই যে চওড়া কালো দাগটা যখানে রয়েছে? ওখানটা হুতোম প্যাঁচার পক্ষে আইডিয়াল বাসা ওয়া উচিত"

দূরবীন লাগিয়ে দেখতে লাগলেন। ডানা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে াইল। তার মনে হচ্ছিল, সে যেন একটা বিরাট বাঘের পাশে াড়িয়ে আছে নির্ভয়ে। বাঘটা এখন নির্নিমেষে চেয়ে আছে হুতোম প্যাঁচার বাসার দিকে, তার সমস্ত আগ্রহ এখন ওই দিকেই নিবদ্ধ য়ে আছে, কিন্তু হঠাৎ যদি সে তার দিকে ওই আগ্রহ নিয়ে দৃষ্টি ফরায়—একটা শিহরণ ব'য়ে গেল তার সর্বাঙ্গে।

"ওটা প্যাঁচারই বাসা, বুঝলেন—ও, এই যে—"

হঠাৎ বৈজ্ঞানিক লাফিয়ে এগিয়ে গেলেন, মাটিতে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন কি যেন।

"এই যে পালক রয়েছে এখানে, মাছের আঁশও রয়েছে। ও কেটুপার পালকও রয়েছে দু-একটা। আর সন্দেহ নেই, ঠিক ওইটেই ওর বাসা। বাসার ভিতরটা একবার দেখা দরকার। কিন্তু মুশকিল, অত উঁচুতে ওঠা যায় কি ক'রে, বলুন তো? একটা মই আনতে হবে আর কি"

হঠাৎ তাঁর চোখের দৃষ্টি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

"এক কাজ করবেন? এখনই তা হ'লে ডেফিনিট্‌লি বোঝা যায়"

"কি বলুন?"

"আমার পিঠের উপর দাঁড়াতে পারবেন? আমি সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছি এই পাথরটায় ভর দিয়ে। আপনি ওই শিকড়টা ধ'রে ওই খাঁজটায় পা দিয়ে আমার পিঠের উপর চড়ে দেখুন তো ঠিক নাগাল পেয়ে যাবেন"

এই প্রস্তাবে ডানা এত বিস্মিত হয়ে গেল যে, তার নির্বাক হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নির্বাক হতে পারলে না সে। বরং তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"ছি ছি, কি যে ছেলেমানুষি করেন আপনি! আপনার পিঠের উপর দাঁড়াব কি?"

"ও, আচ্ছা, থাক্ তা হ'লে"

অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন বৈজ্ঞানিক। তিনি একজন মহিলার কাছে অসঙ্গত প্রস্তাব ক'রে ফেলেছেন—এ বোধটা সহসা জাগ্রত হ'ল তাঁর মনে। কিন্তু তাঁর মুখের ভাব দেখে ডানার মনে হ'ল, যেন কোনও ক্রীড়নক-লুব্ধ শিশুর হাত থেকে খেলনা কেড়ে নিয়েছে কেউ। মায়া হ'ল তার।

"আপনার পিঠের উপর দাঁড়ালে আপনার লাগবে না?"

সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল বৈজ্ঞানিকের চোখের দৃষ্টি।

"কিছুমাত্র না। আপনি আর কত ভারী হবেন!"

"খুব হালকাও নই, মাস ছয়েক আগে আট স্টোন ছিলাম"

"মোটে? ওতে কিছু হবে না আমার। রত্না পাক্কা দশ স্টোন। পরেশনাথ পাহাড়ে গিয়েছিলাম আমরা একবার। হেঁটে উঠেছিলাম। কিছুদূর গিয়ে রত্না হাঁপিয়ে পড়ল। তখন কিছুদূর তাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু কষ্ট হয়নি তো"

ডানা অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলে। তার ভয় হচ্ছিল, চোখোচোখি হ'লে সে হেসে ফেলবে এবং তা হ'লে পরদাটা উড়ে হঠাৎ। কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল তার একটু।

বৈজ্ঞানিক বলতে লাগলেন, "আর কষ্ট হ'লেই বা কি! ওদেশের বৈজ্ঞানিকেরা পাখিদের বিষয় জানবার জন্যে কি কষ্টই যে করেছেন, তা যদি পড়েন, অবাক হয়ে যাবেন। হিউম সাহেব, রিপ্‌লে সাহেবের বইগুলো দেব আপনাকে, প'ড়ে দেখবেন। পড়লে অবাক হয়ে যাবেন। বনে জঙ্গলে, পর্বতে মরুভূমিতে, উত্তরমেরু দক্ষিণ-মেরুতে, কোথায় না গেছে ওরা পাখিদের খবর জানবার জন্যে! আর আপনি এইটুকু কষ্টের কথা ভাবছেন? তা ছাড়া কষ্ট হবে না আমার, বিলিভ মি, আসুন"

বৈজ্ঞানিক ঝুঁকে সামনের পাথরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। চতুষ্পদ জন্তুর মত দেখতে হ'ল অনেকটা।

"আসুন, উঠে পড়ুন। ওই খাঁজটায় পা দিয়ে ওই শিকড়টা ধরুন। তারপর পিঠে পা দিন আমার"

ডানার মনে হ'ল, খরস্রোতে প'ড়ে গেছে সে। স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই আর। তবু সে শেষ চেষ্টা করলে একবার এবং করতে গিয়ে ব্যাপারটাকে আরও জটিল ক'রে ফেললে।

"দেখুন, গুরুজনের গায়ে পা দেওয়াটা কি উচিত হবে?"

"গুরুজন! মানে? কে গুরুজন?"

"বিদ্যায় বুদ্ধিতে বয়সে সব বিষয়েই তো আপনি বড়"

"গড্!"

বৈজ্ঞানিক উঠে ঘুরে দাঁড়ালেন।

"তার চেয়ে সোজা ভাষায় বলুন না, আমি উঠব না। রত্না থাকলে উঠত কিন্তু। রত্নার আসবারও কথা আছে এখনই। মিস্ত্রি আর কাঠের বাক্স-টাক্স নিয়ে আসতে বলেছি তাকে"—তারপর হাতঘড়িটা দেখে বললেন, "এসেও গেছে হয়তো এতক্ষণ। আপনি যদি না উঠতে চান, তা হ'লে অবশ্য জোর করতে চাই না। আপনি পিঠ পেতে দিলে আমি উঠতে রাজী আছি। কিন্তু না, আমি চোদ্দ স্টোন, আমার ভার সহ্য করতে পারবেন না আপনি। চলুন, যাওয়া যাক তা হ'লে। উঠে দেখলেই পারতেন কিন্তু। প্যাঁচাটা আছে কি না এইটুকু জানলেই যথেষ্ট হ'ত আপাতত। রীতিমত আয়োজন ক'রে ডিমের খোঁজ পরে করতাম তা হ'লে"

"আপনি যখন ছাড়বেন না, উঠছি"

"হ্যাঁ, আসুন"

সোৎসাহে আবার পিঠ পেতে দাঁড়ালেন বৈজ্ঞানিক। খাঁজে পা দিয়ে এবং শিকড় ধ'রে তাঁর পিঠের উপর উঠে পড়ল ডানা।

"দেখতে পাচ্ছেন গর্তটা?"

"হ্যাঁ"

"হাত ঢোকাবেন না যেন, ঠুকরে দিতে পারে। এক কাজ করুন, ডাল-টাল ভেঙ্গে নিন একটা, আর সেইটে ভিতরে ঢুকিয়ে দেখুন।"

ডাল ভাঙবার দরকার হ'ল না আর। গর্তের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই 'হিস্‌স্' ক'রে তর্জন ক'রে উঠল কি যেন গর্তের ভিতর থেকে।

"গর্তের ভিতর হিসহিস করছে কি যেন। সাপ হতে পারে"

"হিসহিস করছে? তা হ'লে পেঁচা আছে ঠিক। দেখতে পাচ্ছেন কিছু?"

"না"

গর্ত থেকে মুখ সরিয়ে ঘাড় ফেরাতেই আর একটা জিনিস চোখে পড়ল ডানার। তারা যেখানে ছিল, সেখানে নদীর পাড়টা খুব উঁচু। আর কিছুদূর গিয়ে পাড়টা খাড়া নেবে গেছে। নীচে গভীর খাদ একটা। তাতে জল ঢুকেছে এসে। জলের এক ধারে চওড়া পাথর একটা এগিয়ে এসেছে ছোট বারান্দার মত। ডানা দেখতে পেলে, তার উপর ব'সে আছেন রূপচাঁদ আর সনাতন মল্লিক। সনাতন মল্লিক ফাতনায় নিবদ্ধদৃষ্টি। রূপচাঁদ দূরবীন দিয়ে তাদেরই দেখছেন বোধ হয়।

"নেবে পড়ুন তা হ'লে"

ডানা নেবে পড়ল। নেবে প্রণাম করলে বৈজ্ঞানিককে।

"আরে, ছি ছি, ও কি, এটা কি হ'ল ?"

ডানা কোনও উত্তর দিলে না। বৈজ্ঞানিক অপ্রস্তুত মুখে ক্ষণকাল থেকে সোৎসাহে যা বলতে লাগলেন, তা প্রণাম-বিষয়ক কিছু নয়।

"দেখলেন ? বললাম, পেঁচা ঠিক আছে। এগুলো খুব সম্ভবত হুতোম প্যাঁচা—কেটুপা জেলোনেন্‌সিস (Ketupa Zeylonensis), খুব বড় দেখতে। মুখটা বেরালের মুখের মত। দেখি যদি ধরতে পারি এটাকে। চলুন, যাওয়া যাক এবার। রত্না বোধ হয় ব'সে আছে এতক্ষণ আমাদের অপেক্ষায়।"

হঠাৎ ঘুরে চলতে শুরু ক'রে দিলেন তিনি। ডানাও অনুসরণ করতে লাগল। শিমুলগাছটার কাছাকাছি একটা বড় গাম্‌হার-গাছ ছিল। দেখা গেল, তার উঁচু ডালে কাক বাসা বাঁধছে। বৈজ্ঞানিকই দেখতে পেলেন আগে।

"ওই দেখুন, কাক বাসা বাঁধছে। ওটাতে লক্ষ্য রাখবেন। কোকিল এসে ঠিক ডিম পেড়ে যাবে ওতে"

"কি ক'রে বুঝব তা ?"

"কাক যখন ডিম পাড়বে, তখন দেখবেন, পুরুষ-কোকিলটা

কাকের বাসার কাছাকাছি এসে খুব ডাকাডাকি করছে। কোকিলের ডাক কাকেরা মোটেই সহ্য করতে পারে না। ডাক শুনলেই বাসা ছেড়ে তাড়া করে কোকিলটাকে। স্ত্রী-কোকিল লুকিয়ে থাকে আশেপাশে। সে তখন শূন্য বাসায় এসে ডিম পেড়ে চ'লে যায়। অনেক সময় কাকের ডিম ফেলে দিয়ে নিজের ডিমটি রেখে যায়"

"ভারি আশ্চর্য তো! কাকেরা নিজের ডিম চিনতে পারে না?"

"অনেক পাখিই পারে না। বেশি দূর যেতে হবে না, মুরগিরাই অপরের ডিমে বিনা আপত্তিতে তা দেয়। ডিউয়ারের (Dewar) 'বার্ডস্ অ্যাট দি নেস্ট্' (Birds at the nest) বইটা প'ড়ে দেখবেন। বইটা আছে আমার কাছে"

কথা বলতে বলতে অগ্রসর হতে লাগলেন দুজনে। ডানা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে লাগল।

দূরবীনে নিবদ্ধদৃষ্টি রূপচাঁদের মুখটা মাঝে মাঝে ভেসে উঠতে লাগল তার মনে।···

বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই দেখা গেল, রত্নপ্রভাও আসছেন, সঙ্গে জন চারেক লোক রয়েছে। একজনের কাঁধে একটা মই, দুজন দুটো কাঠের বাক্স ব'য়ে আনছে। যন্ত্রপাতি নিয়ে আসছে একজন ছুতোরমিস্ত্রি। রত্নপ্রভাকে দেখে বৈজ্ঞানিক বালকের মত ছুটে চ'লে গেলেন তাঁর দিকে।

"জান, হুতোম প্যাঁচার সন্ধান পেয়েছি আজ আমরা। ও দিকের ওই বিরাট বটগাছটায় আছে, আমি বলি নি তোমাকে? ডিম পেড়েছে সম্ভবত। মইটা এনেছ, ভালই হয়েছে। যাবে এখনই?"

"এগুলো আগে টাঙানো হোক"—গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন রত্নপ্রভা।

"ও হ্যাঁ। বাঃ, কাঠের গুঁড়িটা কেটে এটা বেশ চমৎকার হয়েছে তো।"

"তোমার বইয়ে যেমন ছবি আছে, ঠিক তেমনই করিয়েছি। কোথায় টাঙাবে ব'লে দাও"

খেলনা পেলে শিশু যেমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বাক্স দুটো পেয়ে বৈজ্ঞানিক তেমনি হয়ে উঠলেন। ডানার দিকে ফিরে বললেন, "দেখছেন? এই গুঁড়ির টুকরোটা মাঝামাঝি লম্বালম্বি, মানে—Longitudinally চিরে তার ভিতর থেকে কিছু কাঠ কুরে বার ক'রে নেওয়া হয়েছে। তারপর টুকরো কাঠ দুটো স্ক্রু দিয়ে জুড়ে বাইরে থেকে উপরের দিকে এই গর্তটা ক'রে দেওয়া হয়েছে পাখি ঢোকবার জন্যে। গাছের গুঁড়িতে গর্ত আর সুড়ঙ্গ ক'রে যে সব পাখি বাসা বানায়, যেমন—কাঠঠোকরা, বসন্ত-বউ, ভগীরথ, তারা হয়তো এতে এসে বাসা বানাতে পারে। এই বাক্সটাও ওই প্ল্যানেই তৈরি, তবে এটা তক্তা দিয়ে তৈরি। এইটে ওই তেঁতুলগাছটায় টাঙিয়ে দেওয়া যাক, আর এইটে, মানে—গুঁড়ি দিয়ে তৈরি যেটা, সেটা ওই আমগাছটায় দাও। এই শোন, এদিকে এস"

শিশুর মত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বৈজ্ঞানিক। রত্নপ্রভার চোখের দৃষ্টিতে স্নেহস্নিগ্ধ কৌতুক-হাস্য চিকমিক করতে লাগল। ডানার দিকে এক নজর চেয়ে ঈষৎ মুখ টিপে হাসলেন তিনি।

১০

ডানার কাছ থেকে তেমন কোনও সাড়া না পেয়ে রূপচাঁদ হতাশ হন নি, বিস্মিতও হন নি, বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চিন্তা করবার চেষ্টা করছিলেন। তিনি ভাবছিলেন, এ ধরনের মেয়েরা যে ধরনের সাড়া দেয়, তা প্রায়ই এত মৃদু, এত প্রচ্ছন্ন হয় যে, অনেক সময় বোঝাই যায় না। তা বোঝবার জন্যে শুধু সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকলেই যথেষ্ট হয় না, ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও প্রয়োজন। ওর কাছে অমরবাবু আর আনন্দমোহন যে জাতীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, তা ভেদ ক'রে

কিংবা অবলুপ্ত ক'রে নূতন রকম একটা কিছু করার মানসিক ক্ষমতা রূপচাঁদের যে নেই তা নয়। কল্পনা তাঁর প্রচুর আছে, কিন্তু সে কল্পনাকে রূপ দেওয়ার মত অর্থ নেই। ওকে নিয়ে এখন কলকাতা-বম্বে-দিল্লী-দার্জিলিং-পুরী-ওয়ালটেয়ারে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে পারলে অনেকটা কাজ হ'ত। ওরই হিতার্থে এই ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে, সে ভানটা করতে হ'ত অবশ্য—রূপচাঁদ সে ভান করতেও পারতেন—কিন্তু টাকা কই? তা ছাড়া চাকরি, এবং তৃতীয় বাধা বকুলবালা। এখানেই কিছু একটা করতে হবে। কিন্তু কি সেটা? আপিসে কাজ করতে করতে, পথ চল্'তে চলতে, রাত্রে বকুলবালার পাশে শুয়ে শুয়ে প্রায়ই কথাটা ভাবেন রূপচাঁদ।

…চমৎকার জরির পাড় দেওয়া একখানা নীলাম্বরী শাড়ি নিয়ে সকালে সেদিন হাজির হলেন রূপচাঁদ ডানার কাছে। ডানা পড়ছিল।

"এই নাও"

"কি ওটা?"

"তোমার জন্মদিসের উপহার"

"আজ পঁচিশে ফাল্গুন নাকি?"

"হ্যাঁ"

"আমার জন্ম-তারিখ আপনি জানলেন কি ক'রে?"—একটু বিব্রত-ভাবে উঠে দাঁড়াল ডানা।

"তুমি আমাকে যে 'বলাকা'টা পড়তে দিয়েছিলে, তাতেই লেখা ছিল। তোমার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন কে একজন সতুদা"

"ও বইটা আপনার কাছে আছে বুঝি? আমি খুঁজছিলাম কাল"

"কাল দিয়ে যাব। শাড়িটা দেখ দিকি, পছন্দ হয় কি না?"

"কেন কিনতে গেলেন মিছিমিছি? ওসব শাড়ি-টাড়ি ভাল লাগে না আমার"

রূপচাঁদ স্মিতমুখে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, "তুমি এ কথা বলবে তা জানতাম। তবু না কিনে পারলাম না। ময়ুরের পেখম না হ'লে চলে না যে!"

"কিন্তু পেখম ধরে তো পুরুষ-ময়ুর, সেদিন পড়লাম"

"ঠিকই পড়েছ"

আবার চুপ ক'রে গেলেন রূপচাঁদ, কিন্তু ভাষাময় হয়ে উঠল তাঁর চোখের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি যেন বলতে লাগল—হ্যাঁ, আমারই পেখম ওটা। দেখ, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, আনন্দিত হও।

পেখমের নিগূঢ় অর্থটা উপলব্ধি করবামাত্র ডানা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল হঠাৎ। রূপচাঁদ ব'সে রইলেন চুপ ক'রে। মৎস্যশিকারী তিনি, ধৈর্যের তাঁর অভাব নেই। মিনিট দুই পরেই কিন্তু ফিরে এল ডানা। মনে হ'ল, যেন একটা মুখোশ প'রে ফিরেছে। ভাবলেশহীন মুখ। ডানার মুখের দিকে এক নজর চেয়ে একটু আশ্বস্তই হলেন যেন রূপচাঁদ। আপাত-ঔদাসীন্যের যবনিকা মানেই যবনিকার ওপারে এমন একটা-কিছু ঘটছে যা অনাবৃত রাখতে লজ্জা করে। এইটেই তো চান রূপচাঁদ। কিন্তু সেই একটা-কিছুর স্বরূপটা কি?

"বড্ড গম্ভীর হয়ে গেলে যে হঠাৎ?"

হাসবার চেষ্টা করলে ডানা। কিন্তু কোনও কথা বেরুল না তার মুখ দিয়ে।

রূপচাঁদ খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "দেখ, জীবনকে সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারাটাই আনন্দ। ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রলোকেই আমাদের অমরাবতী প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। যারা রসিক, তারা সেটা খুঁজে বার করতে পারে। যারা বেরসিক, তাদের সে সামর্থ্যই নেই মোটে। কিন্তু রসিকরা যখন নীতি বা ধর্মের প্যাঁচে প'ড়ে কৃচ্ছ্রসাধনের কসরৎ করে, তখন ব্যাপারটা শুধু হাস্যকরই হয় না, করুণও হয়ে পড়ে। তোমার মত মেয়ের

কাছে যে রসের দাবি নিয়ে আসি, সে দাবি নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়, তা বিশ্বপ্রকৃতির দাবি—এটুকু অন্তত মনে রেখো”

স্থূল কথাটার মর্মটুকু ডানার কাছে এক নিশ্বাসে ব’লে ফেলে রূপচাঁদ যেন ঈষৎ হালকা বোধ করতে লাগলেন। প্রকাণ্ড একটা বোঝা নির্দিষ্ট স্থানে নামিয়ে দিয়ে কুলী যেমন আরাম বোধ করে, তেমনই যেন আরাম বোধ করলেন তিনি একটা। তিনি আশা করেছিলেন, ডানা এরও কোন উত্তর দেবে না। কিন্তু ডানা ঈষৎ হেসে সংযতকণ্ঠে যা বললে, তাতে বিস্মিত হলেন তিনি। ডানার হাসিটা অতি মধুর লাগল তাঁর।

“তা কি আর জানি না!”—ডানা বললে,—“কিন্তু আপনি জিনিসটার একটা দিকই দেখছেন কেন? দুই আর দুই যোগ ক’রে চার হয় এটা যেমন সত্যি, এক আর তিন যোগ ক’রে চার হয় সেটাও তেমনই সত্যি। পাঁচ থেকে এক বাদ দিলেও চার হয়। চার সংখ্যায় অসংখ্য রকম উপায়ে পৌঁছনো যায়।”

“ঠিক বলেছ। বাঃ!”—হঠাৎ উল্লসিত হবার ভান করলেন রূপচাঁদ।

“আপনি এখন বসবেন কি? চা ক’রে আনব?”

“তুমি এখন কি করবে?”

“আমাকে অমরবাবুর একটা লেখা টাইপ করতে হবে। বিকেলেই চেয়েছেন”

“ও, তা হ’লে আমি উঠি। আচ্ছা, অমরবাবুর কাজটা ভাল লাগছে তোমার তো?”

“খুব ভাল লাগছে”

“ভাল লাগলেই ভাল। আচ্ছা, উঠি তবে এখন। কাল ‘বলাকা’টা দিয়ে যাব”

রূপচাঁদ উঠে পড়লেন।

পরদিন ডানার বাড়ি থেকে ফেরবার পথে সনাতন মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ। সনাতন মল্লিকের সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখে বিস্মিত হলেন রূপচাঁদ। এদের নিয়ে কোথায় চলেছেন ভদ্রলোক? জনকয়েক সাঁওতাল, প্রত্যেকের হাতে তীর-ধনুক। বন্দুকধারীও আছে জন দুই।

"কোথা চলেছেন মল্লিক মশাই এই দুপুরে? শিকারে নাকি?"

"কাক মারতে"

"হঠাৎ এ খেয়াল?"

"খেয়াল নয়, চাকরি। শ-খানেক কাক মেরে আনতে হবে—হুকুম হয়েছে"

"কি হবে?"

"রিসার্চ, রিসার্চ—"

"কাক নিয়ে?"

"কাক বক শালিক চিল শকুন কেউ বাদ যাবে না। আপনি যান নি নাকি এদানিং?

"না, একটু ব্যস্ত ছিলাম"

"গিয়ে দেখে আসুন! বার-বাড়িটা কশাইখানা ক'রে তুলেছে একেবারে। মরা পাখিদের ডানা ঠোঁট পালক মাপা হচ্ছে। পেট চিরে চিরে চামড়া ছাড়িয়ে দিনরাত রিসার্চ চলছে পরশু থেকে। আর বউটাও কি জুটেছে তেমনই মশাই! পাগল স্বামীকে তুই কোথায় সামলে-সুমলে রাখবি, না, তুইও সামনে উবু হয়ে ব'সে ব'সে পাখির পালক মাপছিস ওর সঙ্গে!"

"তাই নাকি?"

"যাচ্ছেতাই কাণ্ড। দেখে আসুন না গিয়ে।"

মুচকি হেসে রূপচাঁদ বললেন, "রিসার্চ করবার মত দামী একটা চিড়িয়া তো পেয়েছেন। কাক বক নিয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন ভদ্রলোক?"

চোখ মটকে সনাতন মল্লিক বললেন, "সে রিসার্চও চলছে, সেদিন তো দেখলেনই স্বচক্ষে। তা চলুক না, তুই বড়লোকের ছেলে, বদখেয়ালে দু-দশ হাজার ওড়া না, পাখির পেছনে এমন ক'রে লেগেছিস কেন?"

দুম ক'রে আওয়াজ হ'ল একটা। কলরব ক'রে এক দল কাক উড়ল একটা গাছ থেকে। যে লোকটি বন্দুক ছুঁড়েছিল, সে অপ্রস্তুত মুখে বললে, "লাগল না"

"আরে, কাক মারা কি সহজ কথা!"—মল্লিক মশাই ব'লে উঠলেন, "ওপারে যাওয়া যাক চল। এপারে আর পাওয়া যাবে না, সব ভড়কে গেছে, একটু থিতুক। ও অঞ্চলটা ঘুরে আসি ততক্ষণ আচ্ছা, আমরা চলি তা হ'লে। উঃ, রোদের তাত দেখেছেন এরই মধ্যে?"

সদলবলে চ'লে গেলেন মল্লিক মশাই। রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। ডানাকে 'বলাকা'টা ফিরিয়ে দিতে এসেছিলেন তিনি। ডানার সঙ্গে দেখা হয় নি। কপাট বন্ধ ছিল। বন্ধ দ্বারে অনেকক্ষণ করাঘাত করাতে চাকরটা বেরিয়ে এসে খবর দিলে যে, মাইজীর শরীর খারাপ, তিনি এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

বৈজ্ঞানিকের পৃষ্ঠারূঢ়া ডানার ছবিটা চোখের সামনে ফুটে উঠল হঠাৎ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়ালেন আবার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটি সিগারেট বার ক'রে ধরালেন সেটি নিপুণভাবে। তারপর আবার চলতে লাগলেন।

নিজের তেতলার ঘরটিতে ব'সে কবি কবিতা লিখছিলেন। মন্দাকিনী চ'লে গেছেন। মন্দাকিনীর চ'লে যাওয়াটাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর মনে কত কি যে হচ্ছে, তার ঠিক নেই। মন্দাকিনীই যেন বার বার নানাভাবে ঘুরে ফিরে আসা যাওয়া করছে মনে। মন্দাকিনী না থাকলে যে ডানাকে নিয়ে তাঁর সমস্ত কল্পনা মেতে উঠবে তিনি মনে করেছিলেন, সে ডানার কাছে যেতেই ইচ্ছে করছে না যেন তাঁর। স্টেশনে ট্রেনের জানলায় মন্দাকিনীর মুখটা বার বার মনে পড়ছে। তাঁর কথাগুলোও—'সাবধানে থেকো, আমি যত শিগ্‌গির পারি চ'লে আসব।' মন্দাকিনীর চিন্তার সঙ্গে ডানার কথাও মিশছিল এসে তাঁর অজ্ঞাতসারে। শব্দের ঝঙ্কারে আর ছন্দের মিলে যে অর্থটা কবিতায় পরিস্ফুট হচ্ছিল, তা হয়তো ঠিক তাঁর মনের কথা নয়, তবু তিনি তন্ময় হয়ে লিখে যাচ্ছিলেন।—

নানা সুরে তারা ব'লে যায়
পুনরায় ফিরে আসব তো
ব'লে যায় তবু চ'লে যায়
জীবনের লীলা শাশ্বত।

হাসি করে রোজ অশ্রু-স্নান
হয় হিমাংশু অংশুমান
সূর্য-হিমানী-প্রণয়-গান
রঙিন মেঘের বাষ্প তো।

এসেছ কে তুমি নন্দিতে
অপরাজিতার স্বপ্ন কি
আলো-আঁধারির সন্ধিতে
গোধূলি-বেলার লগ্ন কি

জন্ম-মৃত্যু দুঃখ সুখ
কাঁপায় প্রাণ ভরায় বুক
নবীন ফুল সে উৎসুক
বলে আমি ভালবাসব তো।

১২

তিন-চার দিন থেকে ঝোড়ো হাওয়া বইছে একটা। ধুলো বালি ঝরা-পাতা উড়িয়ে একটা দুর্দান্ত পাগল যেন নেচে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। দুপুরে ঘরের কপাট জানলা বন্ধ ক'রে ডানা একা ব'সেছিল চুপ ক'রে। এ কদিন কেউ আসে নি। বৈজ্ঞানিক নানা রকম পাখির বাসা বানিয়ে গাছে গাছে টাঙিয়ে বেড়াচ্ছেন বোধ হয়। অনেকগুলো পাখি-ওলা লাগিয়েছেন নাকি পাখি ধরবার জন্যে, এখানে চিড়িয়াখানা বানাবেন নাকি একটা। কাক মারবার জন্যে শিকারী বেরিয়েছে নাকি। প্রবন্ধ তৈরি হচ্ছে বোধ হয় আর একটা। হুতো পাঁ্যাচাটাকে ধরবার কি হ'ল? হঠাৎ মনে হল, আনন্দবাবুও আসেন নি। এই বিশ্রী হাওয়ার জন্যেই বেরুতে পারছেন না বোধ হয় ভদ্রলোক। তাঁর সেই কবিতাটা এখনও ডানার কাছে প'ড়ে আছে। ডানা উঠে গিয়ে কবিতাটা বার ক'রে আর একবার পড়লে। কাকে উদ্দেশে কবিতাটা লিখেছেন ভদ্রলোক? রূপকথার অরূপ বাণীর অর্থ কাকে বোঝাতে চাইছেন উনি? উইম্‌পোল স্ট্রীটের ব্যারেটের কথা মনে পড়ল, মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের মানসীর কথা। অন্যমনস্ক হয়ে রইল অনেকক্ষণ। বাইরের এলোমেলো হাওয়ার মত মনের ভিতরও এলোমেলো চিন্তার হাওয়া উঠল যেন একটা। একটা অতৃপ্ত ক্ষুধার অস্পষ্ট রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের প্রচ্ছন্ন লোকে। মনে হ'ল কে যেন কোথায় তার জন্যে প্রতীক্ষা ক'রে আছে। যেতে হবে। হঠাৎ সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তিনি কয়েকদিন আগে এই রব

একটা বলেছিলেন যেন। তিনি আছেন কি ? কয়েকদিন খোঁজ
ওয়া হয় নি। হঠাৎ কপাট খুলে বেরিয়ে পড়ল সে তুপুররোদে।
াগিয়ে গেল নদীর ধারের সেই ঘরটার দিকে। ঘরটার পাশে যে
বীগাছ আছে একটা, তা নজরেই পড়ে নি এতদিন। গোছা
া ফুল ধরেছে। এলোমেলো হাওয়ায় অস্থির হয়ে উঠেছে গাছটা।
সেই অস্থিরতার মধ্যেও একটা ছন্দ আছে যেন। মনে হচ্ছে,
কোনও শ্যামাঙ্গিনী তরুণী নৃত্য করছে, নৃত্য করতে করতে
গুনের ফুলকি ছড়াচ্ছে অঞ্জলি ভ'রে ডাইনে বামে উর্ধ্বে নিম্নে।
রবীফুলগুলো ঠিক যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের মত। সে দিকে চেয়ে সেই
পুর-রোদে দাঁড়িয়ে রইল ডানা। এলোমেলো হাওয়াটা হু-হু ক'রে
টে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল, উড়ে গেল মাথার কাপড়টা, চুলগুলো
ড়তে লাগল। একটা অদৃশ্য ঘূর্ণাবর্ত যেন মেতে উঠল তাকে ঘিরে।
সই ঘূর্ণাবর্তে কতকগুলো ছেঁড়া কাগজ আর শুকনো পাতা নাচতে
াচতে চ'লে গেল পাশ দিয়ে। চু-কির-কির-কির-কির—তীক্ষ্ণ সুরের
ফায়ারা ছুটিয়ে উড়ে গেল বরবেশে সজ্জিত কালো টুনটুনিটা। সমস্ত
কৃতি অদ্ভুত এক আনন্দে ভরপুর যেন। ডানারও দেহের অণু-
রমাণুতে স্পন্দিত হয়ে উঠতে লাগল নাচের ছন্দ। হঠাৎ নজরে
ড়ল, বালির চড়া ভেঙে সন্ন্যাসী আসছেন। পরিধানে মলিন
গরিক, হাতে কমণ্ডলু। নগ্ন পদ, নগ্ন শির। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ
নই। মনে হয় না, প্রকৃতির এই রুদ্র তাণ্ডব তাঁর মনকে একটুও
পর্শ করছে। নির্বিকার চিত্তে ঋজুদেহে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে
াসছেন। সম্রাট যেন। ডানাও এগিয়ে গেল।

"আপনি এই রোদে কোথায় বেরিয়েছিলেন ?"—ডানাই প্রশ্ন
রলে।

"ভিক্ষে করতে।"—মৃদু হেসে উত্তর দিলেন সন্ন্যাসী।—"তুমি ?"
চুপ ক'রে রইল ডানা। সন্ন্যাসী যে ভিখারী এই বোধটা আঘাত

করল সজোরে তাকে। ভিক্ষা করা যে অতিশয় হীন বৃত্তি! ভিক্ষুক ইনি? হোঁচট খেলে মনের অবস্থা যেমন হয়, তারও যেন তেমনই হ'ল। ইংরেজী পড়া সংস্কারের পাথরে খুব জোরেই হোঁচট খেল সে। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে।

"এই রোদে কোথায়?"—হেসে জিজ্ঞাসা করলেন সন্ন্যাসী।

"আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম"

"আমার কাছে? কেন?"

"এমনিই"

সন্ন্যাসী ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। ডানাও ঢুকল গিয়ে তাঁর পিছু পিছু। সন্ন্যাসীর ঘরে ডানা ইতিপূর্বে একদিনও ঢোকে নি। ঘরটা ভাঙা, সে শুনেছিল। কিন্তু কত ভাঙা, তার তা ধারণা ছিল না। ঢুকে অবাক হয়ে গেল। ঘরের ভিতরে ব'সেই আকাশ দেখা যায়। চালে খাপরা খুব কম আছে। যা আছে, তাও ঠিক স্থানে নেই। মেঝেটা এককালে পাকা ছিল, এখন কিন্তু সিমেণ্ট উঠে গেছে। মাঝখানে একটা চৌ-কোণা পাথর বসানো হয়েছিল কোন কালে, সেইটেই অক্ষত আছে এখনও। সেই মেঝেরই এক ধারে একটি কম্বল পাতা, তারই এক পাশে আর একটি কম্বল পাট-করা রয়েছে, আর রয়েছে একটি ঝোলা। সেইটেই বোধ হয় যুগপৎ বাক্স এবং বালিশের কাজ করে। ঘরের আর এক ধারে কয়েকটি ইট পেতে উনুন করা রয়েছে। আর এক ধারে মাটির ছোট কলসী একটি, তাতে খাবার জল থাকে বোধ হয়, পাশে একটি মাজা-ঘষা পিতলের ঘটি চকচক করছে।

সন্ন্যাসী ডানার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "এস, ব'স। ওই কম্বলটার উপরই ব'স। কোনও দরকার আছে নাকি?"

ডানা কম্বলটার এক পাশে গিয়ে বসল। সন্ন্যাসী কমণ্ডলু টাঙিয়ে রাখলেন দেওয়ালের একটা পেরেকে।

"তেমন কোনও দরকার নেই। কয়েকদিন আপনাকে দেখি নি,

তাই ভাবলাম, খোঁজটা নিয়ে আসি, একা ব'সে ব'সে ভাল লাগছিল না। আচ্ছা, আপনি ভিক্ষা করেন কেন ?"

সন্ন্যাসী কলসী থেকে জল গড়িয়ে হাত-মুখ ধুয়ে হাসি-ভরা চোখে চাইলেন ডানার দিকে। তারপর বললেন, "আমি যে পথের পথিক, সে পথে এই নিয়ম"

"আপনি যে বলেছিলেন, পোস্ট-অফিসে আপনার কিছু টাকা আছে ?"

"তা আছে। তার থেকে টাকা বার করি মাঝে মাঝে, কিন্তু ভিক্ষা করি ঠিক গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে নয়, নিয়ম ব'লে"

"নিয়ম ? বুঝতে পারলাম না ঠিক"

"মিলিটারিদের যেমন ড্রিল করা নিয়ম, ডাক্তারি পড়তে গেলে যেমন মড়া-কাটা নিয়ম—এও তেমনই"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ডানা বললে, "ভিক্ষা করলে কি আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হয় না ? মাপ করবেন, আমার যা শিক্ষা সেই অনুসারেই বলছি"

"তোমরা আত্মসম্মান জিনিসটাকে বড় খাটো ক'রে দেখ, তাই পদে পদে সেটা ক্ষুণ্ণ হয়"

"খাটো ক'রে দেখি মানে ? বুঝতে পারছি না ঠিক।"

"আজ তোমার ডান হাত যদি প্রতিজ্ঞা ক'রে বসে যে, বাঁ হাতের কাছে কিছু নিলেই তার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে, তা হ'লে যে রকম বিপদ উপস্থিত হয়, তোমাদেরও তাই হয়েছে। তোমার আত্মার সঙ্গে আমার আত্মার প্রকাণ্ড একটা তফাত আছে, এ কথা মেনে নিলেই মুশকিল হবে। যদি মেনে নিতে পার যে, তুমি আমি একই জিনিসের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র, তা হ'লে আর সঙ্কোচের কারণ থাকে না"

"সত্যিই কি সেটা মেনে নেওয়া যায় ?"

"প্রত্যক্ষ করলেই মেনে নেওয়া যায়। অণুবীক্ষণ দিয়ে

বৈজ্ঞানিকেরা যেদিন জীবাণু প্রত্যক্ষ করলেন, সেই দিনই তাদের মেনে নিলেন। যেদিন তুমি প্রত্যক্ষ করতে পারবে যে, তুমি আর তোমার বাইরের বিশ্ব অভিন্ন, সেদিন তোমারও সংশয় থাকবে না”

“কিন্তু সত্যিই কি সেটা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ?”

“সম্ভব বইকি। অনেকে পেরেছেন এবং সবাইকে পারতে হবে এক দিন”

খোলা দ্বারটা দিয়ে সন্ন্যাসী বাইরের দিকে চাইলেন। ডানার মনে হ'ল, তাঁর দৃষ্টি দিগন্তরেখা ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে গিয়ে নিমেষে কি যেন দেখে এল একবার। তারপর নিজের কমণ্ডলু থেকে দুটি ছোট কলা বার ক'রে একটি ডানার হাতে দিয়ে বললেন, “নাও এটি তুমি খাও। তুমি আসবে ব'লেই বোধ হয় একটি কলা বেশি পেয়েছি আজ”

“আমি এখনই খেয়েছি। আপনিই দুটো খান”

“তুমি অতিথি, তোমাকে না দিয়ে কি আমি খেতে পারি ? ক্ষিধে না থাকে তো পরে খেও, নিয়ে যাও”

“আপনি আর কিছু খাবেন না ?”

“না”

“ওই একটিমাত্র কলা খেয়ে থাকতে পারবেন ?”

“তা পারব”

“আমি না এলে দুটো কলাই তো খেতেন ?”

সন্ন্যাসী হেসে উত্তর দিলেন, “তা খেতাম। তুমি খেলেও আমারই খাওয়া হ'ল”

কলসী থেকে জল গড়িয়ে সন্ন্যাসী আবার হাত পা মুখ ধুতে লাগলেন। ডানা চুপ ক'রে ব'সে রইল। সন্ন্যাসীর কথাগুলো কে যেন তার কানের কাছে চুপিচুপি ব'লে গেল আবার—‘সম্ভব বইকি। অনেকে পেরেছেন এবং সবাইকে পারতে হবে একদিন।’

“আচ্ছা, আপনি কি পেরেছেন ?”—ডানা জিজ্ঞাসা করলে হঠাৎ।

"কি ?"

ঝুলি থেকে একটি গামছা বার ক'রে হাত-মুখ মুছতে মুছতে প্রশ্ন করলেন।

"আপনি আর বাইরের বিশ্ব যে অভিন্ন, এই সত্য কি প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন ?"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, "নিজের কথা নিজের মুখে বলতে নেই। তা ছাড়া আমি কি পেরেছি বা পারি নি—এ প্রশ্ন অবান্তর। আমি হিমালয়-চূড়ায় উঠতে পারি নি, তা প্রত্যক্ষও করি নি, তবু তা যে আছে এ কথা তোমাকে মানতে হবে"

"কিন্তু যাঁরা হিমালয়-চূড়ায় উঠেছেন বা হিমালয়-চূড়া দেখেছেন এ রকম লোক আছেন, তাই সেটা নিঃসংশয়ে মানা যায়"

"সর্বভূতে সেই এক অদ্বিতীয়কে প্রত্যক্ষ করেছেন এ রকম লোকও কম নেই—এ কথাও যেদিন বুঝবে, সেদিন এ সম্বন্ধেও সন্দেহ থাকবে না"

"সে রকম লোক কোথায় আছেন ?"

"খুঁজে বার করতে হবে। তোমার সত্যকার জিজ্ঞাসা যেদিন জাগবে, সেদিন খোঁজবার পথও পাবে"

ডানা চুপ ক'রে রইল। ডানার মুখের দিকে চেয়ে সন্ন্যাসী বললেন, "মনে হচ্ছে, কোনও একটা মতলবে তুমি এসেছিলে, কি বল তো সেটা ?"

ডানা আর একটু চুপ ক'রে থেকে ইতস্তত ক'রে বললে, "আমার সব কথা শোনেন নি বোধ হয় আপনি ?"

"না"

ডানা নিজের জীবন-কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা ক'রে শেষে বললে, "এখন পৃথিবীতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে আশ্রয় পেয়েছি একটা। এঁরা খুবই ভদ্রতা

করছেন আমার সঙ্গে। অমরবাবু, আনন্দবাবু, রূপচাঁদবাবু সবাই—”

রূপচাঁদবাবুর কথাটা ব'লে সে থেমে গেল নিমেষের জন্যে।

“অমরবাবু একটা চাকরিই দিয়েছেন আমাকে। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়ে আছি। তবু কিন্তু শান্তি পাচ্ছি না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি ভোগ করছি সর্বদা। কোথায় একটা ক্ষুধা যেন অতৃপ্ত রয়েছে। মনে হচ্ছে, কি যেন একটা কর্তব্য আছে, যা করা হয় নি। সেই ক্ষুধাটা যে কিসের, কর্তব্যটা যে কোথায়, তা ঠিক করতে পারছি না। তাই মনে করলাম, আপনার কাছে আসি। কেন যে আপনার কথা মনে হ'ল, তা বলতে পারি না, কিন্তু মনে হ'ল যে আপনি হয়তো কিছু উপদেশ দিতে পারবেন।”

সন্ন্যাসী গম্ভীর হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, “দেখ উপদেশ দেওয়ার মত অভিজ্ঞতা আমার নেই। এইটুকু শুধু জানি যে, সবাইকে একদিন না একদিন সচেতন হতে হবে। তুমি, আমি, এই নিখিল বিশ্ব যাঁর অনন্ত লীলার প্রকাশ, তাঁকে জানবার আগ্রহ অভিনব ক্ষুধারূপে অনুভব করতে হবে সবাইকে একদিন। অনিত্য মোহের কষ্টিতে ঘ'ষে ঘ'ষে নিত্যকে চেনবার আকুলতাই নিয়ত ব্যক্ত হচ্ছে রূপে রূপে জীবনে মরণে জন্মজন্মান্তরে। তুমিও হয়তো সেই ক্ষুধাই অনুভব করছ, কে জানে?”

“ভগবানকে জানবার ক্ষুধা বলছেন?”—ডানা প্রশ্ন করলে।

“সেটা তুমিই ঠিক করবে, কিসের ক্ষুধা তোমাকে আকুল করছে। তোমার ক্ষুধাই তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে”

“আপনার কথা বুঝতে পারছি না ঠিক। আমার ক্ষুধা আমাকে বিপথেও তো নিয়ে যেতে পারে?”

“কোনও পথই বিপথ নয়। একমাত্র যে পথ, যে পথ সবাইকে ধরতে হবে একদিন, তার বহু গলি, গলির গলি আছে। ক্ষুধাকে অনুসরণ ক'রে চলতে থাক, ঠিক পথে পৌঁছে যাবেই একদিন না

একদিন। ক্ষুধাটা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তার আগুনে অখাদ্যও হজম হয়ে যাবে"

"কোন কিছুই পাপ নয় তা হ'লে আপনি বলছেন ?"

সন্ন্যাসী ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে একটু হেসে বললেন, "আমি কিছুই বলছি না। কোনও একটা কাজ পাপ কি না তা নির্ভর করে তোমার নিজের পাপ-পুণ্যবোধের উপর। মা-কালীর কাছে পাঁঠাকে বলিদান দেওয়া কারও কাছে পুণ্য, কারও কাছে পাপ। যাঁরা দিব্যদৃষ্টি লাভ ক'রে যোগী হয়েছেন, তাঁদের কাছে আবার পাপ-পুণ্যের প্রশ্নই অবান্তর। তাঁরা অনাসক্ত। পদ্মপত্রে যেমন জল লেগে থাকতে পারে না, তাদের মনেও তেমনই পাপ-পুণ্য লাভ-ক্ষতি এসব স্থান পায় না।

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মানি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

—গীতার এই শ্লোকটিতে মনের যে অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, তাতে কোনও ক্ষুধা নেই। কিন্তু এই সর্বসংকল্প সন্ন্যাস লাভ করবার আগে ক্ষুধার নির্দেশেই অনেক দুর্গম পথ চলতে হবে। সেই পথে যেটা তোমার বিবেকের কাছে পাপ ব'লে মনে হবে, সেইটেই ত্যাগ করবে তুমি।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আবার হেসে বললেন, "পুরাতন বিবেকের কাছে পুণ্য ব'লে যা মনে হয়েছে সেটাও কিছুদিন পরে হয়তো আবার ত্যাগ করতে হবে নূতন বিবেকের নির্দেশে। পুরাতন ক্ষুধা নূতন খাবার দাবি করবে। পুরাতন খাবারে তৃপ্তি হবে না তার তখন"

"ক্ষুধাটা যে কিসের, তাইতো বুঝতে পারছি না ?"—একটু অধীর কণ্ঠেই বললে ডানা।

"পারবে। চিন্তা কর, বুঝতে পারবে বইকি। বুঝতে হবেই। নিজেকেই বুঝতে হবে, আর কেউ বুঝিয়ে দিতে পারবে না। তোমার

মধ্যে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শিষ্য, তিনিই গুরু। তিনি নিজেকেই নিজে নূতন ক'রে উপলব্ধি করবেন তোমার মধ্যে আবার। তুমিই কর্তা, তুমিই কর্ম, তুমিই কার্য, তুমিই কারণ।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

কিন্তু এ উপলব্ধি হবার আগে ভোগের পথে মোহের পথে হয়তো ঘুরতে হবে কিছুদিন। ঘোরাটা প্রয়োজনও হয়তো। তামসিক জীবনের পর রাজসিক জীবনই স্বাভাবিক পরিণতি। তারপর আসবে আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং মোহটা তুচ্ছ নয়। কিছুই তুচ্ছ নয়।"

সন্ন্যাসীর চোখের দৃষ্টি কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে এল। ডানা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, "মোহ সম্বন্ধে কি যেন বললেন, বুঝতে পারলাম না"

"মোহটা হচ্ছে তাঁকে চেনবার কষ্টিপাথর। কষ্টিপাথর সোনা নয়, কিন্তু সোনার পরিচয় ওর থেকেই পাওয়া যায়। যে কোনও জিনিসেই আমরা মুগ্ধ হই না কেন, কিছুদিন পরেই তার নেশাটা কেটে যায়। কারণ মোহ নকল আলো, আসলে ওটা অন্ধকারই। ওই মোহই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, আমরা ভুল পথে গেছি। মন ব'লে ওঠে, হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনওখানে—"

"তা হ'লে মোহটাও দরকারী জিনিস ?"

"এক হিসেবে দরকারী বইকি। মুক্তির স্বাদ পেতে হ'লে খানিকটা বন্ধন-ভোগ দরকার। মোহ মানে আসক্তি, বন্ধন, যুক্তিহীন অনুরক্তি। যে কোন রকম আসক্তিই খারাপ। উপনিষদ বলছেন, যাঁরা অসম্ভূতি অর্থাৎ প্রকৃতির উপাসক, তাঁরা অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যাঁরা কেবল সম্ভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মে অনুরক্ত, তাঁরা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ কেবল ব্রহ্ম সম্বন্ধেও তোমার যদি অনুরক্তি হয়, তা হ'লেও অন্ধকার। অনুরক্তি জিনিসটাই খারাপ। সত্যদর্শন হওয়ামাত্র অনুরাগ বিরাগ সব লুপ্ত হয়ে যায়।

সত্যের সঙ্গে তখন একাকার হয়ে যায় দ্রষ্টা। হারিয়ে ফেলার ভয় থেকেই তো অনুরাগের জন্ম,—কিছুক্ষণ পরে হারিয়ে ফেলব, এই বোধ থেকেই দু হাত দিয়ে প্রিয়বস্তুকে আঁকড়ে ধরতে চায় সবাই। সত্যকে উপলব্ধি করলে সে ভয় আর থাকে না। কারণ তখন উপলব্ধি হয়, সবার মধ্যেই আমি এবং আমার মধ্যেই সব।"

বাইরের হাওয়াটা উদ্দামতর হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে একটা কোকিল ডেকে উঠল, কিক্, কিক্, কিক্। একরাশি ধূলোবালি হু-হু ক'রে উড়ে এল খোলা দ্বার দিয়ে, আর তার সঙ্গে বহুদূর থেকে ভেসে এল ঘুঘুর কণ্ঠস্বর। ঘুঘুঘু—ঘু, ঘুঘুঘু—ঘু, ঘুঘুঘু—ঘু। ভীষণা প্রকৃতির রুদ্র মূর্তিকে তুচ্ছ ক'রে প্রণয়ীর মোহ কোমল সুরে আবেদন জানিয়ে চলেছে প্রণয়ীকে। ডানা উন্মনা হয়ে আরও কিছুক্ষণ ব'সে রইল। ছন্নছাড়া পাগলের মত তার মনটা ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল ঝড়ো হাওয়াটার সঙ্গে।

"আচ্ছা, আপনারও মোহ আছে?"—তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে সে।

"আছে বইকি। মায়াবিনী প্রকৃতির ছলাকলার কি অন্ত আছে? প্রতি পদক্ষেপেই যে তার একটা না একটা রঙিন ফাঁদ পাতা রয়েছে! তা কি এড়ানো সহজ?"

"আপনার তো কিছুই নেই, তবু কিসের মোহ আপনার?"

"আপাতত এই স্থানটার মোহ কাটাতে পারছি না দেখছি"—মলিন হেসে বললেন সন্ন্যাসী।

"এর আগে এখানে ছিলেন কখনও আপনি?"

"ছিলাম বইকি। সে অনেক কথা"—ব'লে একটু চুপ ক'রে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, "সেসব কথা না-ই বা শুনলে। থাক্। এটা মোহ, না কর্তব্য, তা-ও ঠিক করতে পারছি না।"

সন্ন্যাসী চুপ করলেন।

ডানাও চুপ ক'রে রইল। তার মনে হতে লাগল, কি যেন একটা

রহস্য আবৃত ক'রে রেখেছে এই লোকটিকে। হয়তো সে আবার প্রশ্ন করত, কিন্তু বাধা পড়ল। চাকরটা এসে উঁকি দিলে দ্বার-প্রান্তে।

"আনন্দবাবু এসেছেন, খুঁজছেন আপনাকে"

ডানার কানের পাশটা লাল হয়ে উঠল একটু। তারপর সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে বললে, "আপনি আসবেন আমার ওখানে? চলুন না"

"পরে আসব কোন সময়ে।"

একটু ইতস্তত ক'রে ডানা চ'লে গেল একাই। গিয়ে যা দেখলে, তা একেবারে অপ্রত্যাশিত। কবির সর্বাঙ্গে রঙ, মুখে আবীর।

ডানাকে দেখে তিনি বললেন, "আজ বসন্তোৎসব। সমস্ত প্রকৃতি রঙে রসে রূপে মেতে উঠেছে! এস, তোমাকেও একটু রঙ মাখিয়ে দিই। আপত্তি আছে কি?"

কি যে বলবে ডানা ভেবে পেল না। মাথা হেঁট ক'রে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে রইল এক পাশে। তার কানে গালে ফুটে উঠল লজ্জারুণ ভাতি। তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল শুধু যে ভয়ে তা নয়, আনন্দেও। চিরন্তনী নারী পুলকিত হয়ে উঠল চিরন্তন পুরুষের আহ্বানে।

"দিই একটু?"

"দিন, ছাড়বেন না যখন"

কবি ডানার মুখে চুলে আবীর মাখিয়ে দিয়ে পকেট থেকে বার করলেন রঙের শিশি। বালকের মত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মন্দাকিনী চ'লে যাওয়ার পর তাঁর মনে যে ঔদাসীন্য এসেছিল, তা হঠাৎ কেটে গেল যেন। সমস্ত দিন আজ রঙ খেলে বেড়িয়েছেন। ডানার কাপড়ে বেশ ক'রে রঙ দিয়ে একটু দূরে স'রে দাঁড়ালেন।

"বাঃ, চমৎকার দেখাচ্ছে!"

ডানা লজ্জায় ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল। রঙে তার কাপড় জামা ভিজে গিয়েছিল একেবারে। কাপড়-জামা বদলে বাইরে এসে দেখে,

কবি চ'লে গেছেন। বারান্দার টেবিলের উপর রঙের শিশিটা রয়েছে আর তার তলায় চাপা রয়েছে একখানা কাগজ। কাগজটা খুলে দেখলে, একটা কবিতা রয়েছে।

গৈরিক হরিতে পীতে
পুষ্পে ফলে ছন্দে গীতে
বহু বর্ণ বহু শিখা জ্বালি
বসন্ত আরতি করে যার,

যার লাগি সাজিয়াছে
মাঠে মাঠে গাছে গাছে
কিশলয় মঞ্জরীর ডালি
রচিয়া বিচিত্র উপহার,

তারই মূর্তি রক্তরাগে
সন্ধ্যার মেঘেতে জাগে
আগুনের প্রদীপ্ত আলোকে
কোকিলের জ্বলন্ত নয়নে,

রঙ্গনে পলাশে ফোটে
টিয়া চন্দনার ঠোঁটে
সহেলীর পালকে পালকে
তন্ময় সে কি স্বপ্ন চয়নে,

সে যে সিন্দূরের শোভা
পদ্মরাগ মনোলোভা
শোণিতের বরণে চর্চিত
শিবানীর রক্তজবা সে যে,

সেই বর্ণে জগদ্ধাত্রী
বালার্ক-অরুণ-গাত্রী
যুগে যুগে হতেছে অর্চিত
মানবের মনোমন্দিরে যে,

তারি ছন্দে তারি সুরে
নিকট যেতেছে দূরে
সুদূর যে নিকটেতে আসে,
পুরাতন হয় যে নবীন,

অতীত ও বর্তমান
গাহে ভবিষ্যের গান,
বক্ষে ধরি তাহারি সুবাসে
শুষ্ক বীজ তপস্যায় লীন,

এস, সখি, সমারোহে
বসন্ত-উৎসবে দোঁহে
পূজা করি কুঙ্কুমে আবীরে
সে চির-যৌবন দেবতার,

ওগো, সখি, নীলাঞ্জনা
হও আজি অবন্ধনা
অশঙ্কিত কঙ্কণে মঞ্জীরে
ঝন্‌ঝনিয়া তোল ঝনৎকার,

জড়তা ফাটিয়া যাক
অচঞ্চল শিহরাক,
ভাষা দাও স্থাবরে জঙ্গমে
অকুণ্ঠিত হও সুলোচনা,

হও সখি, আত্মহারা
বন্ধহীন রসধারা
উদ্বেলিত অধর-সঙ্গমে
নবতীর্থ করুক রচনা।

ডানা দু-তিনবার পড়লে কবিতাটা। এলোমেলো হাওয়াটা থেমে গেল হঠাৎ। মেকি কি, মেকি কি, মেকি কি—। ডানা ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে, রিক্তপত্র একটা অশ্বত্থগাছের শাখায় ব'সে পুচ্ছ আস্ফালন ক'রে একটা ফিঙে ডাকছে। পাশে ব'সে আছে আর একটা ফিঙে। তারই সহচরী বোধ হয়।

১৩

রূপচাঁদ আপিসে গিয়েছেন। দুপুরের রোদ খাঁ-খাঁ করছে চতুর্দিকে। বকুলবালা উঠোনে গুলি খেলছেন চণ্ডীর সঙ্গে। চণ্ডী ছেলেটি স্কুল পালিয়ে প্রায়ই আসে তাঁর কাছে। তার জন্যে নানারকম খাবার তৈরি ক'রে র'খেন বকুলবালা। যেদিন চণ্ডী আসে না, সেদিন কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েন তিনি। চণ্ডী যে পরের ছেলে, তার যে নিজের বাপ-মা আছে—এ কথা বকুলবালা যে জানেন না তা নয়, কিন্তু মানেন না। চণ্ডীকে আসতেই হবে রোজ। নানাভাবে প্রলুব্ধ হয়ে চণ্ডী আসেও। শুধু খাবার নয়, অন্য প্রলোভনও আছে; বকুলবালা মাঝে মাঝে তাকে পয়সা দেন। সেই পয়সায় চণ্ডী তার সেই সব শখ মেটায় যা মা-বাপের পয়সায় মেটে না সহজে। ছুরি, ঘুড়ি, লাট্টু এসব তো কিনেইছে, মাঝে মাঝে সিগারেটও কেনে। একটা টিয়াপাখিও কিনে দিয়েছেন তাকে বকুলবালা খাঁচাসুদ্ধ।

"এই, বেইমানি করছিস ফের। ভাল ক'রে মাপ আবার। থাম্, আমি

নিজেই হেঁট হয়ে মাপতে লাগলেন বকুলবালা গাব্‌বু থেকে তাঁর গুলিটা কতদূরে আছে। গাছকোমর বাঁধা, মাথার চুলগুলোও চুড়ো ক'রে বেঁধেছেন তিনি, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে দুপুরের তপ্ত হাওয়ায়।

কৃষ্ট প্রিয়।

দুজনেই সোৎসুকে মুখ তুলে চাইলেন আমগাছটার দিকে

"বুলবুলিটা এসেছে বোধ হয়"

"হ্যাঁ, ওই যে"

"কই ?"

"ওই যে সরু ডালটায় ব'সে আছে"

এইবার দেখতে পেলেন বকুলবালা।

"চমৎকার দেখতে তো! গালের কাছে কি টুকটুকে রঙ—ওমা, কি সুন্দর!"

"পাখি-ওয়ালাটা বলছিল, এর নাম নাকি সিপাহী বুলবুল"

"সিপাহীর মতই তো দেখতে। ঘোড়সোয়ার সিপাহীদের মাথায় টুপি তো ঠিক ওই রকমই। সেবার এসেছিল দেখিস নি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত ?"

চণ্ডী ঘাড় উঁচু ক'রে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল পাখিটার দিকে। পাখি কিন্তু বেশিক্ষণ সে সুযোগ দিলে না তাকে। উড়ে গেল। পাতার আড়াল থেকে আর একটা পাখিও উড়ল।

"ও মা, দুটো ছিল!"

"কিছুতেই বেশিক্ষণ এক জায়গায় বসে না ওরা। জাফরের কাছে এই পাখি যদি দেখি কোনদিন, আনতে বলব মাসীমা ?"

"বলিস। কিন্তু হলদে পাখিটা ম'রে গিয়ে থেকে আর পাখি কিনতে ইচ্ছে করে না। কিচ্ছু খেলে না একেবারে। আয়,—আচ্ছা, তুইই আগে টিপ কর"

আবার সুরু হ'ল গুলিখেলা।

"বাচ্চাবেলা থেকে পুষতে হয়। ধাড়ি পাখি পোষ মানে না"—টিপ করতে করতে চণ্ডী বললে।

"হলদে পাখির বাচ্চা কোথায় পাব বল্ ?"

"গণশা বলছিল যে, গেল বছর হলদে পাখির বাসা দেখছিল সে এক জায়গায়"

একটু থেমে চণ্ডী বললে, "নদীর ধারে অমরবাবুদের যে আম-বাগান আছে সেই বাগানে। সে গাছে ফিঙেরও বাসা ছিল নাকি"

"ফিঙে পাখির দরকার নেই। গণশাকে বলিস, হলদে পাখির বাচ্চা যদি পায় এনে দেয় যেন আমাকে"

চণ্ডীর টিপ ব্যর্থ হ'ল। বকুলবালা টিপ করতে লাগলেন।

"বলব। কিন্তু অন্য পাখি যদি পেয়ে যায় ? নীলকণ্ঠের বাচ্চা রেছিল একবার গণশা"

"না, অন্য পাখি চাই না"

টকাস্ ক'রে চণ্ডীর গুলিটা মেরে গর্বোৎফুল্ল মুখে চাইলেন বকুল-বালা চণ্ডীর দিকে।

"তুমি আর একবার হলদে পাখি কিনেছিলে, না মাসীমা ?"

"সেবারও বাঁচে নি। ঠাণ্ডা লাগল, না কি হ'ল, সকালে দেখি, ম'রে প'ড়ে আছে খাঁচায়"

"বার বার ম'রে যাচ্ছে, কি দরকার তা হ'লে ও পাখি পুষে ? তার চেয়ে নীলকণ্ঠ পোষ এবার একটা। চমৎকার দেখতে"

চোখ-মুখ কুঁচকে আবার টিপ করছিলেন বকুলবালা। চণ্ডীর কথায় আগুনের ঝলক ছুটে বেরুল তাঁর চোখ থেকে।

"না, আমি হলদে পাখি পুষব। নীলকণ্ঠ আবার মানুষে পোষে ! ক্যারকেরে গলার আওয়াজ, তেমনই ঝগড়ুটি"

চণ্ডী চুপ ক'রে রইল। বকুলবালার গুলি এবার লাগল না। চণ্ডী টিপ করতে লাগল। টিপ করতে করতে হঠাৎ থেমে সে জিজ্ঞেস করলে, "হলদে পাখি খুব ভাল গান গায়, না ?"

"নিশ্চয়। কি মিষ্টি গলার স্বর! শুনিস নি তুই?"

"শুনেছি, কিন্তু দোয়েলের গলা ওর চেয়েও মিষ্টি"

"দোয়েল ওর মতন 'খোকা হোক' বলতে পারে?"

"হলদে পাখি 'খোকা হোক' বলে বুঝি?"

"হ্যাঁ, কি মিষ্টি ক'রে যে বলে!"

হঠাৎ বকুলবালার লজ্জা হ'ল এবং সেই লজ্জাটা ঢাকবার জন্যে তিনি ধমকে উঠলেন।

"মার্ না, কি বাজে বকবক করছিস!"

চণ্ডী টিপ করতে লাগল। টিপ করতে করতে হঠাৎ আর একটা কথা মনে প'ড়ে গেল তার।

"অমরবাবু কি কাণ্ড করছেন জানেন মাসীমা? কাক বক শালিক টিয়া মারছেন ক্রমাগত। অনে—ক মেরেছেন"

"কেন? ওসব পাখি তো খায় না শুনেছি"

"খাবেন না। ওদের পালক, পা, ঠোঁট মাপছেন। এখানে মিউজিয়ম হবে নাকি। জ্যান্ত পাখিও ধরেছেন অনেক। অনেক পাখিওলা এসেছে, তারা নানা রকম ফাঁস নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাগানে বাগানে"

"তাই নাকি?"

উৎসাহে বকুলবালার চোখ দুটো জ্বলজ্বল ক'রে উঠল।

"যাবি একদিন? চ না"

"কোথায়?"

"অমরবাবুর বাড়ি। দুপুরবেলা উনি যখন আপিসে থাকবেন আমরা দুজনে লুকিয়ে লুকিয়ে চল্ না, গিয়ে দেখে আসি কি হচ্ছে।"

রূপচাঁদের শিক্ষা সত্ত্বেও বকুলবালার কৌতূহলী মন বেড়া ডিঙিয়ে বাইরে যাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল।

"যদি কেউ দেখে ফেলে?"

"কে আবার দেখবে? পাশের গলিটা দিয়ে টুক ক'রে চ'লে গেলে কেউ দেখতে পাবে না। আর পেলেই বা কি, বড় জোর বকবে একটু"

ঠোঁট উলটে বুড়ো আঙুলটা তুলে ধরলেন বকুলবালা। চণ্ডী হেসে ফেললে। তার মুখের হাসি কিন্তু বেশিক্ষণ রইল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। রূপচাঁদের গলাও।

"মেসোমশাই এলেন নাকি। আমি পালাই"

খিড়কি-দরজাটা দিয়ে চণ্ডী এক ছুটে বেরিয়ে গেল। রূপচাঁদকে বড় ভয় করে তার।

বকুলবালা খিড়কি-দরজায় খিলটা দিয়ে সদর-দরজাটা খুললেন। রূপচাঁদই এসেছিলেন।

"এমন অসময়ে ফিরলে যে আজ?"

"আপিসের কাগজ ফেলে গিয়েছিলাম, তাই নিতে এসেছি। ও কি, মুখ অত লাল কেন? রোদে রোদে ঘুরছিলে নাকি?"

"গুলি খেলছিলাম উঠোনে"

"একা একা?"

"চণ্ডী এসেছিল, তোমার সাড়া পেয়েই পালাল। কি ভীতু ছেলে বাবা!"

রূপচাঁদ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করে ঘরে ঢুকলেন এবং একটা বড় খাম নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আপিসের কাগজ নিতে তিনি আসেন নি, এসেছিলেন 'বলাকা' বইখানা নিতে। বইখানা একটা বড় খামের মধ্যে রেখেছিলেন তিনি। আপিসে একটা কথা মনে হওয়াতে নিজেই বইটা নিতে এসেছেন এই দুপুরের রোদ মাথায় ক'রে। একটা [illegible] পাঠাতে পারতেন, কিন্তু এসব ব্যাপারে চাকর-নাকরের উপর বিশ্বাস করা সমীচীন মনে করেন না তিনি। তা ছাড়া কনস্টেব্‌ল পাঠিয়ে লাভও হ'ত না। নিরক্ষরা বকুলবালা 'বলাকা' খুঁজে বার করতে পারত না।

যাবার সময় তিনি ব'লে গেলেন, "আমাকে হয়তো সায়েবের সঙ্গে টুরে বেরুতে হবে"

"কবে ?"

"তারিখ ঠিক হয় নি এখনও"

রূপচাঁদ চ'লে গেলেন। বকুলবালা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলেন হঠাৎ। তাঁর মনে হ'ল, অমরবাবুর বাড়িতে গিয়ে পাখি দেখবার পথটা সুগম হ'ল তা হ'লে

আপিসের শেষ ফাইলটি ক্লিয়ার ক'রে রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ দোয়াতদানিটার দিকে চেয়ে। তারপর ঘণ্টাটি টিপলেন। একজন কন্‌স্টেব্‌ল সেলাম ক'রে এসে দাঁড়াল

"সতুবাবুর দোকান থেকে এক কাপ চা আনাও দেখি মিশ্রি"

"বহুৎ খুব"

একটু পরেই চা এসে পড়ল। চা পান শেষ ক'রে রূপচাঁদ মিশিরজীকে বললেন, "আমি একটা বই আর একখানা চিঠি দিচ্ছি তোমাকে, সবজিবাগে নদীর ধারে যে মাইজী থাকেন তাঁকে দিয়ে এস। তুমি বাইরে একটু অপেক্ষা কর, চিঠিটা লিখে ফেলি আমি"

"বহুৎ খুব"

কন্‌স্টেব্‌ল চ'লে গেল।

রূপচাঁদ চিঠি লিখতে লাগলেন।

ডানা,

সেদিন সকালে তোমার 'বলাকা'টা দিতে গিয়েছিলাম। তোমার দেখা পাই নি। তোমার চাকরের মুখে শুনলাম, তোমার শরীর ভাল নেই। ঠাণ্ডা লেগেছে সম্ভবত। আনন্দমোহন তোমাকে রঙে চুবিয়ে দিয়ে গিয়েছিল শুনলাম। সকলকেই সেদিন রঙে চুবিয়েছে ও। জলে ভিজেই শরীরটা বেভাব হয়েছে বোধ হয় তোমার। জলের সঙ্গে রঙ মেশানো থাকলে আরও বেশি বেভাব

হওয়ার সম্ভাবনা। ঘাবড়ালে চলবে না। তোমাদের ওপর দিয়েই তো এখন নানা রঙের খেলা চলবে। বিশ্বনাট্যমঞ্চে তোমরাই যে রঙ্গিণী। সেদিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে সহসা যে সুরটা বেজে উঠেছিল আমার কণ্ঠে, সেটা সত্যিই আমার মনের সুর, এবং একেবারে বিশুদ্ধ সুর। বিশুদ্ধ মানে স্বাভাবিক, পবিত্রও বলতে পার। কিন্তু সমাজ নামক এমন একটি আজব জিনিস তৈরি করেছি আমরা যে, প্রকাশ্যে বিশুদ্ধ সুর আলাপ করবার সাহস নেই অনেকেরই। বিশুদ্ধ সুরের কালোয়াতি করতে গিয়ে চার্বাক, স্পাইনোজা প্রভৃতি বড় বড় ঋষিকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে, আজও হচ্ছে। স্বাভাবিক মনোবৃত্তিকে নিষ্পেষিত ক'রে নিশ্চিহ্ন করাটাই এখনও ভদ্রসমাজে সভ্যতা ব'লে গণ্য। কিন্তু অসাধারণ মানব-মানবী পৃথিবীতে ছিল, আছে এবং থাকবেও বরাবর। তোমাকে অসাধারণের দলে ফেলেছি ব'লেই তোমার কাছে এ-ধরনের কথা বলতে সাহস পাচ্ছি। আমাকে ভুল বুঝো না। সমর্থ পুরুষের নিতান্ত স্বাভাবিক প্রেরণার সত্য মূল্য তোমার মত নারীই দিতে পারে ব'লে বিশ্বাস করি। তবে এটাও বিশ্বাস করি যে, তোমার পছন্দ-অপছন্দর একটা মাপকাঠি আছে নিশ্চয়ই, (সেদিন তোমার চার-এর উপমাটা বেশ লেগেছিল) এবং তা দিয়ে তোমার অজ্ঞাতসারেই হয়তো তুমি মাপছ অনেককেই। আমি সেই সৌভাগ্যবানদের দলে পড়েছি কি না অর্থাৎ আমাকেও তুমি মেপেছ কি না জানি না, কিন্তু সেটা জানবার স্বাভাবিক কৌতূহল একটা আছে।

তোমার সম্বন্ধে আমার যা ধারণা তা গদ্যে বলা যাবে না। আনন্দমোহনের মত বাংলা কবিতা লেখবার ক্ষমতা আমার নেই। কলেজ-জীবনে ইংরেজীতে কবিতা লেখার শখ ছিল। মাঝে মাঝে লিখেওছি। অনেক দিন পরে আজ আবার চেষ্টা করলাম। তোমার সম্বন্ধে যা আমার মনে হয়েছে, তা ইংরেজী কবিতায় লিখে পাঠাচ্ছি।

ভাল যদি না লাগে, ছিঁড়ে ফেলে দিও। আর একটি কথা মনে রাখতে অনুরোধ করি। আমি বিবাহিত লোক, সে কথাটা মনে রেখো। তুমি কি করবে বা করবে না, তা তুমিই ঠিক ক'রো। একটি অনুরোধ শুধু করছি অর্থাৎ একটি জিনিস করতে মানা করছি। হৈ-চৈ ক'রো না। তা যদি কর, তা হ'লে আমাকেও হয়তো আত্মরক্ষার জন্যে এমন সব অবাঞ্ছনীয় কাজ করতে হবে, যা আমি এখন করবার কল্পনাও করি না। কবিতাটি এই—

Evening speaks in golden clouds
 Morning speaks in light
Flowers speak in scented petals
 Lightening speaks in flight

The manner in which they express
 Is simple plain and sweet
But what we do, we human beings ?
 We know not how to do it.

When the heart is full and feelings melting
 We try to hide and alter
When the eyes speak the tongue denies
 Words fail or falter.

I know not how to word my feelings
 How to call my Muse
I wish I had the knack of Nature
 To sing in Light and Hues.

হয়তো এর ছন্দে গোলমাল আছে, কিন্তু বক্তব্যটা আশা করি সুস্পষ্ট হয়েছে। এর বেশি কিছু আর বলবার নেই। ইতি—আর. সি.

চিঠি লেখা শেষ ক'রে রূপচাঁদ চিঠিটি খামে পুরে খামটি বেশ ভাল ক'রে জুড়ে দিলেন। তারপর ডাকলেন কনস্টেবলকে।

"মিশিরজী, এই চিঠিটি এবং বইটি মাইজীকে দিয়ে এস। মাইজীর হাতে দেবে, আর কারও হাতে দিও না যেন। মাইজী যদি না থাকেন, ফিরিয়ে নিয়ে এস। সাইকেলটা নিয়েই যাও। আমি এইখানেই আছি"

কন্‌স্টেব্‌ল চ'লে গেল এবং খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে খবর দিলে যে, মাইজীর হাতেই সে চিঠি এবং বই দিয়ে এসেছে।

"সেখানে আর কেউ ছিল নাকি ?"

"জী, না"

রূপচাঁদ আরও কিছুক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলেন। বাড়ির কাছে এসে দেখেন, বিস্রস্তবাসা বকুলবালা একটা লোম-ওঠা কুকুরের পিছনে ঢিল নিয়ে ছুটছেন। যে ঢিলটা তিনি ছুঁড়েছিলেন, আর একটু হ'লেই সেটা রূপচাঁদকেই লাগত।

"কি, ব্যাপার কি ?"

"মেরেই ফেলব মুখপোড়াকে আজ"—বকুলবালার মুখ লাল, চোখের দৃষ্টিতে ধক্‌ধক্ ক'রে আগুন জ্বলছে।

"হ'ল কি ?"

"তোমার জন্যে হালুয়াটি ক'রে পেয়ারাগাছে উঠেছিলাম কয়েকটা পেয়ারা পাড়বার জন্যে, মুখপোড়া কখন সুট ক'রে ঢুকে সমস্ত হালুয়াটি খেয়ে গেছে !"

ক্ষুধার্ত রূপচাঁদ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্ষণকাল। তারপর বললেন, "যাক, চল, মুড়ি-টুড়ি আছে তো তাই খাওয়া যাবে"

"মুড়ি আবার কখন কিনলাম !"

রূপচাঁদের ইচ্ছে করতে লাগল, তার চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে বলেন কখন কিনেছ তা জানতে চাইছি না, আছে কি না জানতে চাইছি।১২ শেষ"

কিন্তু সে ইচ্ছে দমন ক'রে হাসিমুখে বললেন, "চল, ঘরে যা আছে তাই খাওয়া যাবে"

"শুধু পরোটা কি খেতে পারবে ?"

"তরকারি নেই কোনও ?"

"তরকারি ওবেলা সব ফুরিয়ে গেছে। এবেলা আবার আনতে হবে। তরকারি নেই ব'লেই তো হালুয়া করতে গেলুম"

"দু-একটা আলু-পটলও নেই ?"

"কচু আছে আধখানা"

"বেশ, তাই পুড়িয়ে দাও"

এই শুনে শিশুর মত খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন বকুলবালা।

"ধ্যেৎ, তার চেয়ে চল, গুড় দিয়ে খাবে"

"বেশ, চল"

১৪

রত্নপ্রভার কাণ্ড দেখে ডানা সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিল। অমরবাবুও হয়েছিলেন। তিনি আশা করেন নি যে, রত্নপ্রভা নিজে মরা কাকের ডানা, পা, লেজ, ঠোঁট মাপতে বসবেন। রত্নপ্রভা কিন্তু বেশ উৎসাহ সহকারেই মাপতে বসেছিলেন। যদিও এতে অমরবাবুর সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি হচ্ছিল, কারণ রত্নপ্রভা সব সময়ে ঠিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাপতে পারছিলেন না, ব'লে দেওয়া সত্ত্বেও গোলমাল ক'রে ফেলছিলেন মাঝে মাঝে, তবু অমরবাবুর বেশ লাগছিল। ডানা একধারে কাগজ পেন্সিল নিয়ে মাপের অঙ্কগুলো টুকে নেবার জন্যে বসেছিল। তার কেমন যেন গা ঘিনঘিন করছিল; শুধু তাই নয়, তার মনে হচ্ছিল, এতগুলো প্রাণী হত্যা ক'রে কি লাভ হবে শেষ পর্য— অমরবাবু সত্যিই

যদি এ অঞ্চলের কাকেদের (Corvus Spendens) আর একটা উপ-শ্রেণী (Sub-species) বার করতে পারেন, তাতেই বা কি? হয়তো বিজ্ঞানজগতে ওঁর একটু নাম হবে; কিন্তু তখনই আবার মনে হ'ল, না, ঠিক নামের জন্যে উনি এত করছেন না, উনি করছেন নিজের একটা কৌতূহল মেটাবার জন্যে। একটা অদম্য শিশুসুলভ কৌতূহল মাতিয়ে রেখেছে ভদ্রলোককে। ছোট ছেলের মত ছটফট করে বেড়াচ্ছেন সর্বদা। একটা কাকের পেটে কয়েকটা ডিম পাওয়া গেছে, আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন যেন উনি। ডিমসুদ্ধ গোটা কাকটাকেই উনি একটা কাচের জারে রেখে দিচ্ছেন একটা ওষুধে ডুবিয়ে। এমন বিশ্রী গন্ধ ওষুধটার! জারে লেবেল লাগিয়ে অমরবাবু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন একবার রত্নপ্রভার দিকে। শেষ কাকটির মাপ নিচ্ছিলেন তিনি।

"না না, ভুল হচ্ছে, ল্যাজের মাপটা ক্যালিপার্স দিয়ে নাও। ছড়িয়ে নাও বেশ ক'রে আগে। হ্যাঁ। তারপর ওই মাঝখানের পালক দুটোর মাঝখানে একটা পয়েণ্ট নাও, তারপর সবচেয়ে লম্বা পালকটার টিপ পর্যন্ত মাপ। হ্যাঁ, হয়েছে। ঠোঁটটা ঠিক ক'রে মেপেছ তো বেস অভ দি স্কাল (Base of the skull) থেকে সোজা লাইনে? দাঁড়াও, দেখে নিচ্ছি আমি।"

নিজের ভুলের জন্যে রত্নপ্রভা খুব বেশি অপ্রস্তুত হয়েছেন, তা মনে হ'ল না। তাঁর মুখে একটু হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ল শুধু। ক্যালিপার্স্ দিয়ে কাকের লেজটা মেপে পাশের কাগজে টুকে রাখলেন। অমরবাবু সেগুলো ঠিক হয়েছে কি না দেখে তবে ডানাকে টুকতে দেবেন।

হাত ধুয়ে এসে অমরবাবু নিজে হাতে আবার মাপতে লাগলেন।

"আর নেই তো?"—রত্নপ্রভা বললেন।

"না, এইটেই শেষ"

"তা হ'লে আমি চায়ের চেষ্টা দেখি একটু"

"এইখান থেকেই ব'লে দাওনা কাউকে। ভিখারী করুক না"

"ভিখারী পারবে না। এত খাটুনির পর ভাল করে চা খেতে হবে একটু। কড়া করে। কি বলেন ?"

ডানার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে চলে গেলেন রত্নপ্রভা। বৈজ্ঞানিক মাপজোপ শেষ করে ডানার দিকে ফিরে বললেন, "ঠিকই আছে। আপনি টুকে নিন এ ফিগারগুলো"

"পুরুষ-কাক—ডানা ২৬৬ মিলিমিটার ; ঠোঁট ৫০'৫ মিলিমিটার ; ল্যাজ ১৬৪ মিলিমিটার, নখ—মানে টারসাস্ ৪৮ মিলিমিটার। সব-সুদ্ধ কটা হ'ল দেখুন তো"

ডানা গুণে বললে, "পুরুষ-কাক কড়িটা, স্ত্রী-কাক ষোলটা"

সনাতন মল্লিক উঁকি দিলেন দ্বারপ্রান্তে।

"আরও কাক কি মারতে হবে ?"

"না। কোনও পাখিই মারবার দরকার নাই আর। এটা যে ব্রীডিং সিজ্ন্ তা খেয়াল ছিল না আমার। আসছে বছর আবার দেখা যাবে। মরা কাকগুলো কি করলেন ?"

"পুঁতিয়ে দিয়েছি"

"যে পাখিওলাগুলো এসেছে, তারা কিছু ধরতে পেরেছে কি ?"

"ফেরে নি তারা এখনও। তবে সেদিন যে পেঁচাটা দেখে এসেছিলেন, সেটা ধরা পড়েছে ডিম সুদ্ধ"

"অ্যাঁ, তাই নাকি ! কোথায় সেটা ?"

"বার-বাড়িতে। আনতে বলব ?"

"নিশ্চয় !"

কিন্তু অমরবাবুর আর তর সইল না। নিজেই তিনি বেরিয়ে গেলেন হুড়মুড় ক'রে।

ডানা বসে রইল। তার আগেকার চিন্তার সূত্র ধ'রেই ভাবতে লাগল, বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পেও কি জীবহত্যার সমর্থন করা চলে ?

সে জানত না যে, এ নিয়ে বিদ্বৎসমাজে তুমুল তর্ক হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছুই না জেনেও স্বাধীনভাবে ডানা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল যে, মনুষ্যত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হ'লে প্রত্যেক মানুষকে যথাসম্ভব অহিংস হতে হবে। হিংস্র হবার চরম ক্ষমতা আছে ব'লেই হতে হবে। সে শক্তিশালী ব'লেই সংযমী হতে হবে তাকে। যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল প্রাণীহত্যার কারণ, সে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল সম্বরণ করাটাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক হওয়া চাই অন্য কোনও কারণে নয়, আত্মরক্ষার জন্যই। সে কোথায় যেন পড়েছিল—কোন পাঠ্য পুস্তকেই সম্ভব—যে, জীবজগতের জন্মমৃত্যুর হার এমন একটা কঠোর নিয়মে নিয়ন্ত্রিত যে, তার বেশি রকম ওলট-পালট করতে গেলে সমগ্র জীবজগতেরই সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। মানুষের জ্ঞান যতই বাড়ছে, ততই দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে অদরকারী ব'লে কিছু নেই। সুতরাং অস্বাভাবিক উপায়ে কোনও কিছু ধ্বংস করা মানেই প্রকৃতির নিয়মে বাধা দেওয়া এবং তার পরিণাম শুভ নয়, অশুভ। যে 'ফাংগাস' (চলতি ভাষায় যাকে আমরা 'ছাতা' বলি) এতদিন নানা রকম ঘৃণ্য রোগের হেতু ব'লে গণ্য হচ্ছিল, দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে রোগ সারাবারও উপাদান আছে। মানুষ যদি ইতিপূর্বে কোনও উপায়ে এই 'ফাংগাস'দের নির্মূল ক'রে দিতে পারত, তা হ'লে 'পেনিসিলিন' বা ফাংগাস-জাত অন্যান্য মূল্যবান ওষুধগুলি মানবসমাজ পেত না। মানুষের নিজের প্রয়োজনের জন্যই হয়তো পৃথিবীর প্রত্যেকটি প্রাণীর বেঁচে থাকা দরকার। সব কথা আজ জানা যায় নি ব'লেই অনেক জীবকে আমরা অদরকারী বা অনিষ্টকারী মনে করি, পরে হয়তো জানা যাবে যে, তারা উপকারীও। এই জন্যেই, এই আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তাই সভ্য মানুষ স্বভাবত অহিংস। প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুর একটা স্বাভাবিক হার প্রকৃতির প্রয়োজনবশতই ঠিক হয়ে আছে। অস্বাভাবিক উপায়ে সে হার নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে তথাকথিত সভ্য

মানুষ হয়তো নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনছে। হঠাৎ রূপচাঁদের চিঠিটার কথা মনে পড়ল তার। চিঠিটা নিয়ে খুব বেশী মাথা ঘামায় নি সে। এ ধরনের চিঠি ইতিপূর্বে পেয়েছে সে আরও দু-একবার, বর্মায় থাকতে। সে জানে, এর একমাত্র প্রতিষেধক ঔদাসীন্য। যেন কিছুই হয় নি, এ রকম তো হয়েই থাকে--এই গোছের একটা ভাব দেখানো। রূপচাঁদের সঙ্গে দেখা হ'লে খুব সহজভাবেই সে কথা কইবে ভেবে রেখেছে। রূপচাঁদ প্রশ্ন না করলে চিঠিটার উল্লেখও সে করবে না। প্রশ্ন যদি করেন, তখন যা হোক একটা উত্তর দিলেই হবে। চিঠিটা পেয়ে সে যে বিব্রত বা বিচলিত হয়েছে, এটা সে কিছুতে প্রকাশ করবে না। চিঠিটার কথা এখন মনে প'ড়ে গেল, কারণ রূপচাঁদবাবু চিঠিতে স্বাভাবিক কথাটার উপর খুব জোর দিয়েছেন। ব্যাপারটা যেন বেশ জট পাকিয়ে গেল ডানার মনে। জীবনে স্বাভাবিক হতে চাওয়াটাই যদি কাম্য হয়, তা হ'লে রূপচাঁদবাবুর প্রস্তাব অসঙ্গত নয়। আর অস্বাভাবিকতাই যদি সভ্যতা হয়, তা হ'লে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে মেনে নিতে হবে। অমরবাবুর পক্ষী-নিধনে আপত্তি করা চলবে না। তার মন পরস্পরবিরোধী দুটো ধর্মকেই প্রত্যাখ্যান করতে চাইছে কেন—স্বাভাবিকতা এবং অস্বাভাবিকতা দুটোই বিস্বাদ লাগছে কেন? তৃতীয় একটা কিছু আছে না কি, যা স্বাভাবিকও নয় অস্বাভাবিকও নয়, যা শুধু মনুষ্যোচিত। কি সেটা?···সন্ন্যাসীর কথা মনে পড়ল। তাঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে।···

সোরগোল করতে করতে বৈজ্ঞানিক ঢুকলেন দুজন লোককে নিয়ে। দুজনের মাথায় দুটো প্রকাণ্ড খাঁচা। মুরগি-ব্যবসায়ীরা বাঁশের তৈরি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যে সব খাঁচায় মুরগি রাখে, সেই রকম দুটো খাঁচায় বেশ বড় দুটো পেঁচা রয়েছে।

"বুঝলেন, একটা নয়, দুটো পাওয়া গেছে। আর আমি যা আন্দাজ করেছিলাম, কেটুপাই ঠিক। লক্ষ্য ক'রে দেখুন—পা পালক

দিয়ে ঢাকা নয়। আর ওই ডিমটাও দেখুন—একটি মাত্রই ছিল, এরা একটার বেশি পাড়েও না সাধারণত, বড় জোর দুটি। ডিমের রঙ কেমন চমৎকার দেখেছেন ? সাদার উপর একটু ক্রীমের আভাস। প্রায় দু ইঞ্চি হবে, নয় ? একেই বলে ব্রড ওভাল (Broad Oval), এটাকে রেখে দিতে হবে ভাল ক'রে।"

কোণের আলমারি থেকে কার্ড-বোর্ডের বাক্স বার করলেন একটা। তার ভিতর তুলো দেওয়া ছিল। তুলোর উপর ডিমটি সন্তর্পণে রেখে আরও খানিকটা তুলো দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর ফিরে এসে ঝুঁকে দেখতে লাগলেন পেঁচা দুটোকে। ডানাও দেখতে লাগল। এমন ঘনিষ্ঠভাবে পেঁচা সে দেখে নি কখনও।

"কেটুপারা হচ্ছে ফিশ আউল, বুঝলেন। কয়েক রকম কেটুপা আছে। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এদের চেহারা, রঙ আর পা। টারসাসগুলো উলঙ্গ, মানে পালকহীন। বাইরে থেকে কোন্‌টা স্ত্রী কোন্‌টা পুরুষ বোঝবার উপায় নেই। এদের বাসা থেকে বার করলে কি সেই চামড়ার দস্তানাটা প'রে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—সনাতন মল্লিক বললেন,—"ভাগ্যে দস্তানাগুলো দিয়েছিলেন, তা না হ'লে বার করাই যেত না"

"আমি জানি কিনা"

রত্নপ্রভা প্রবেশ করলেন চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে। অমরবাবু সনাতন মল্লিকের দিকে চেয়ে বললেন, "মল্লিক মশাই, আপনিও একটু চা খেয়ে যাবেন তো ?"

"আজ্ঞে না, আমার এখনও আহ্নিক হয় নি"

"ও, তাই নাকি, তা হ'লে আপনি বাড়ি যান, বাড়ি যান। এতক্ষণ কষ্ট ক'রে আপনার থাকবার কোনও দরকার ছিলো না তো"

সত্যিই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন অমরবাবু।

সনাতন একটু হেসে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "আজ্ঞে না, কষ্ট কি ?"

"যান আপনি। আজ আনন্দবাবু আসেন নি দেখছি। তিনি বলেছিলেন, পেঁচাটা যদি ধরা পড়ে, তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। আপনি তো ওই দিকেই যাচ্ছেন—না, আপনার আবার দেরি হয়ে যাবে, একটা চাকর পাঠিয়ে দিন বরং"

"আমিই যাবার পথে খবর দিয়ে যাচ্ছি। আমার রাস্তাতেই তো পড়বে"

সনাতন মল্লিক চ'লে গেলেন।

রত্নপ্রভা চায়ের আসর পেতে ব'সে প্রথমেই এমটি সুখবর দিলেন।

"আমাদের আস্তাবলের আলসেতে একটা শালিক বাসা বাঁধছে বোধ হয়। খড় মুখে ক'রে ক'রে নিয়ে আসছে দেখলাম"

"তাই নাকি ?"

বৈজ্ঞানিক উৎসাহিত হয়ে উঠে পড়লেন।

কবি বাড়িতে ছিলেন না।

তিনি একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন শহরের বাইরে একটা বাগানে। বসন্ত শেষ হচ্ছে, তারই শোভা দেখছিলেন তিনি। সবাই যেন এবার ফুল ফোটাতে ব্যস্ত। অনেক আমগাছ এখনও মুকুলে ভরা, আমও ধরেছে অনেক গাছে। সজনে গাছে কচি কচি ডাঁটা ঝুলছে, ফুলের স্তবকও রয়েছে এখনও। দূরে রাংচিত্তিরের বেড়া, তাতেও ফুল। ঘনশ্যাম সোজা ডাঁটাগুলোর গাঁটে গাঁটে ছোট ছোট আগুনের শিখা উঁকি দিচ্ছে যেন। কৃষ্ণচূড়া লালে লাল। কর্ণিকার গাছে পাতা দেখা যায় না, আপাদমস্তক সোনার ফুল। কত রকম পাখিই যে ডাকছে! দোয়েলের গিটকিরি-ভরা গান আকুল ক'রে তুলেছে রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতকে। যে রিক্তাভরণা বসন্তশ্রী চ'লে যাবার আগে ফুলে ফলে কিশলয়ে সালঙ্কয়া হয়ে উঠেছে, সহসা দোয়েলের উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত যেন মাদকতার সঞ্চার

করেছে তাতে। কোকিলও ডাকছে। ক্রমাগত ডাকছে, বিরাম নেই। তার অবিরাম আহ্বানকে ব্যঙ্গ ক'রে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়ে উঠছে তীক্ষ্ণকণ্ঠী কোকিলার ভৎর্সনা—কিক্ কিক্ কিক্। পাপিয়ার সুরলহরী আকাশ স্পর্শ করছে যেন। মনে হচ্ছে, মর্তের আকুতি অমর্তলোকে গিয়ে পৌঁছল বুঝি। ট্রু, টুরু টুরু—কয়েকটা বুলবুলি উড়ে গেল। ছোট্ট একটু জলতরঙ্গ বেজে উঠল যেন একবার। একটু দূরের একটা গাছে ভারি চমৎকার একটা সুর শুনে উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন কবি। কাছে গিয়ে দেখেন, ফিঙে এবং ফিঙে-গিন্নী প্রেমালাপ করছেন। মিষ্টি সুরের মাঝে মাঝে কেররর-গোছের মিষ্টি ঝনৎকারও আছে একটু। দূর থেকে শুনলে মনে হয়, দু রকম পাখি ডাকছে বুঝি। ছাতারেগুলো কচবচ করছে একটা গাছের নীচে শুকনো পাতার ভিতর। লাফিয়ে লাফিয়ে পোকা খুঁজে বেড়াচ্ছে আর বকর-বকর করছে ক্রমাগত। শালিক-দম্পতী খড় কুটো মুখে তুলে বাসা বানাতে ব্যস্ত। দূরের একটা প'ড়ো বাড়ির কার্নিসে বার বার উড়ে উড়ে যাচ্ছে খড় মুখে নিয়ে। ছোট্ট ভগীরথও একটা গাছের ডালে ঠোঁট দিয়ে দিয়ে গর্ত করছে কুরে কুরে। বাসা তৈরি করছে। দূরের আমগাছটায় টিয়া বসল এসে এক ঝাঁক।

হঠাৎ কবির ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে গেল। একটা লোক গুঁড়ি মেরে একটা ঝোপের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে। মানুষ নয়, মার্জার যেন একটা। হঠাৎ জালটা ঘুরিয়ে ফেললে সে একটা ঝোপে। সমস্ত পাখি উড়ে গেল আশপাশের গাছগুলো থেকে।

"কে তুমি হে, কি করছ এখানে ?"

এগিয়ে গেলেন কবি। লোকটা জাল গুটিয়ে নিচ্ছিল, কোনও জবাব দিলে না প্রথমে।

"কি করছ, জাল ফেলছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, পাখি ধরব"

"কেন ?"

"অমরবাবুর চাই। পাখি পিছু এক টাকা ক'রে দেবেন বলেছেন"

"ও!"

পাখি-ওলা জাল কাঁধে ফেলে অন্য দিকে চ'লে গেল। কবি খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন তার প্রস্থান-পথের দিকে। জাল দিয়ে পাখি ধরার কথা ইতিপূর্বে অনেকবার শুনেছেন তিনি, খাঁচার ভিতর বন্দী পাখিও দেখেছেন, তবু কেমন যেন অবাক হয়ে গেলেন তিনি। বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ আবার কিক্ কিক্ ক'রে উঠল কোকিলা সুন্দরী। খিক খিক ক'রে হেসে উঠল যেন। টুররর ক'রে সাড়া দিলে বুলবুলি। এক ঝাঁক গো-শালিক কলরব ক'রে উঠল। কবির মনে হ'ল, ওই পাখি-ওলাকে উদ্দেশ্য ক'রে ওরা নিজেদের ভাষায় কিছু বলছে যেন প্রত্যেকেই। খানিকক্ষণ কান পেতে থেকে ওদের বক্তব্যটা যেন নিগূঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন তিনি। একটা গাছের তলা একটু পরিষ্কার ছিল, সেইখানে বসলেন আবার। পকেট থেকে খাতা কলম বেরুল। পাখিদের বক্তব্যটা কবিতায় প্রকাশ করতে হবে। তাঁর মনে হ'ল, পাখিরা যেন বলছে—

১

তোমাকে চিনি···
আমাদের তুমি চিনিতে চাও কি ও পাখি-ওলা ?
দূর হ'তে তুমি কারও শোন গান,
কারও দেখ রঙ, কাহারও দোলা,
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি
মোদের সুনীল উদার আকাশটি ?
আকাশ খোলা ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

রঙ বা সুরের তুফান তুলিয়া
কেউবা টিয়া,
বাহার দিয়া,
কেউ বা কোয়েল, কেউবা দোয়েল, কেউ পাপিয়া
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৩

সুরের নেশায় কেউবা হারায়ে ফেলেছি দিশা,
কাহারও ফটিক-জলের তৃষা,
কেহবা জাগিয়া কাটাই নিশা—
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৪

কাহারও পালকে ইন্দ্রধনুর বরণ-ঘটা
কাহারও রূপালী, কাহারও আবার
সোনার ছটা
সরল জটিল অনেক ধরন
বিবিধ বরণ চঞ্চু চরণ
লাল, নীল, শাদা, কালো বা কটা
সবারই কিন্তু মাথার উপরে আকাশ খোলা
ভাল ক'রে তুমি দেখেছ কখনো কি ?
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

৫

হয়তো একদা প'ড়ে যাব ধরা ফাঁদেতে তোমার,
খাঁচাটি তোমার জানি না কেমন
হয়তো লোহার, হয়তো সোনার
হয়তো একদা ভুলাব তোমারে পেখম তুলি
হয়তো শিখিব তোমারি বুলি
খাইব তোমারি ছাতু বা ছোলা
তোমারি দাঁড়েতে দুলিব দোলা
দয়া ক'রে শুধু যেও না ভুলি
ছিল আমাদের আকাশ খোলা,
ও পাখি-ওলা,
তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি, তোমাকে চিনি।

কবিতাটা লিখে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন কবি। ডানার কথা মনে পড়ল। সেদিন রঙ মাখিয়ে দিয়ে আসার পর থেকে আর তিনি ডানার কাছে যান নি। রঙ দিতে দিতে মনে হচ্ছিল, ডানা যেন নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে নিরুপায় হয়ে রঙ দেওয়াটা সহ্য করছে। উৎসবটা উপভোগ করে নি। তাঁরও উৎসব তাই জমে নি সেদিন। এটাও তিনি মনে মনে অনুভব করেছেন যে, জোর ক'রে উৎসব জমানো যায় না। আনন্দটা স্বতোৎসারিত না হ'লে তা নিরানন্দের চেয়েও পীড়াদায়ক। ডানা কেন অমন ক'রে আছে? পাখিগুলো পাখিওলাটাকে যে চক্ষে দেখছে, ডানাও হয়তো ঠিক সেই চক্ষেই দেখছে আমাকে। ভাবছে, আমি কবি নই, আমি একটা ফাঁদ। তার ভুল যেদিন ভাঙবে সেদিন সে উৎসবে যোগ দেবে হয়তো। প্রতীক্ষা ক'রে থাকতে হবে। প্রতীক্ষাতেও আনন্দ আছে। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলেন তিনি। তারপর হঠাৎ মনে হ'ল, সত্যিকার উৎসব কবে জমবে? কবে ডানা বুঝতে পারবে যে, অপরকে বঞ্চিত

করলে নিজেকেও বঞ্চিত হতে হয়? প্রকৃতির প্রাঙ্গণে নিত্য নব উৎসবের যে ইঙ্গিত ছড়িয়ে পড়ছে অহরহ, ঘরের দ্বার বন্ধ ক'রে রেখে কতকাল তাকে প্রতিরোধ করতে পারবে সে? দ্বার একদিন খুলতেই হবে। কিন্তু কবে?...

"চিঠ্‌ঠি হ্যয়"

চমকে উঠলেন কবি। ফিরে দেখলেন, চন্দনচর্চিত তাঁর মৈথিল ঠাকুরটি একটি চিঠি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি যে এখানে থাকবেন, তা ঠাকুরটিকে ব'লে এসেছিলেন। চিঠিটি সনাতন মল্লিকের।—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

আনন্দবাবু, আপনাকে এক জোড়া হুতোম পেঁচা দেখাইবেন বলিয়া শ্রীযুক্ত অমরেশবাবু বাড়িতে অপেক্ষা করিতেছেন। আমি আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছিলাম। আপনার দেখা না পাইয়া এই চিঠিটি লিখিয়া যাইতেছি। নিবেদন ইতি।

ভবদীয়

শ্রীসনাতন মল্লিক

চিঠিটির দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কবি উঠে পড়লেন। হয়তো সোজা অমরবাবুর বাড়িই যেতেন, কিন্তু ঠাকুরটি অদ্ভুত ভাষায় আর একটি খবর দিলে।

"রেন্না হোইয়ে গিয়েসে"

"কটা বেজেছে?"

"বারহ্‌ বজ্‌ গিয়া"

"তবে চল, বাড়িই যাই"

গত কয়েকদিন থেকে রূপচাঁদ মনে মনে একটি ব'ড়ে হাতে করে কোথায় সেটি বসাবেন ভাবছিলেন। সনাতন মল্লিকের আগমনে তাঁর সে সমস্যাটির সমাধান হয়ে গেল। রূপচাঁদ যুক্তিপন্থী জড়বাদী লোক, দৈব-টৈবের ধার বিশেষ ধারেন না, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় ক্ষণিকের জন্য তিনি বিচলিত হলেন একটু। ক্ষণিকের জন্য তাঁর মনে হ'ল এর মধ্যে দৈবের কোন ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন আছে নাকি! মনে হওয়াতে কিন্তু আনন্দিতই হলেন। সমস্ত যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর মন কোন এক অজানা দেবতার আনুকূল্য লাভের আশায় লোলুপ হয়ে উঠল। এ ভাবে লোলুপ হয়ে ওঠাটা যে অযৌক্তিক, তা তাঁর মনেই হ'ল না।

শ্রীযুক্ত সনাতন মল্লিক অবশ্য রূপচাঁদকে সাহায্য করতে আসেন নি, এসেছিলেন নিজের কাছে। তিনি যদিও অমরবাবুর একটা কাছারির ম্যানেজার ব'লেই বিখ্যাত, তবু তাঁর নিজেরও বিষয় সম্পত্তি আছে কিছু। যদিও যৎসামান্য, তবু সেটাকে কেন্দ্র ক'রেই একটা ফৌজদারী মামলায় প'ড়ে গেলেন তিনি। সিংহেশ্বর দারোগা যদি ঠিক ঠিক রিপোর্ট দেয়, তা হ'লে খুনের দায়ে পড়তে হবে তাঁকে। বিপদে পড়লে সনাতন মল্লিকের বুদ্ধি প্রখরতর হয়ে উঠে সিংহেশ্বর দারোগার কাছে না গিয়ে তিনি সোজা চ'লে গেলে রূপচাঁদবাবুর আপিসে। তাঁর মনে হ'ল, রূপচাঁদ যখন পুলিস অফিসের বড়বাবু, তখন তিনি দারোগারও দারোগা।

রূপচাঁদ হাসিমুখে মল্লিক মশায়ের কথা শুনলেন এবং আশ্বাস দিলেন যে, তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। নিশ্চয় করবেন মল্লিকের মুখের দিকে হাসিমুখে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তারপর বললেন, "আপনি অমরকে দিয়েও যদি একটু চেষ্টা করেন তা হ'লেও তো হয়ে যায়। অমরকে খুবই খাতির করে সিংহেশ্বর দারোগা"

"তা জানি"—মৃদু হেসে বললেন মল্লিক মশাই—"কিন্তু পাখি নিয়ে উনি এমন উন্মত্ত যে, এ সব কথা ওঁর কাছে পাড়াই মুশকিল"

এইবার ব'ড়েটি চাললেন রূপচাঁদ।

মুচকি হেসে বললেন, "বিশেষ ক'রে পাখির ডানা নিয়ে বলুন। সেদিন স্বচক্ষেই তো দেখলেন"

এর উত্তরে মল্লিক কোন কথা বললেন না, তাঁর মুচকি হাসিটি আকর্ণবিস্তৃত হয়ে গেল শুধু।

"না না, হাসির কথা নয়"—রূপচাঁদের কণ্ঠস্বরে একটা ব্যাকুলতাই প্রকাশ পেলে এবার—"বন্ধু হিসেবে এর প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত আমাদের"

"কি প্রতিকার করবেন? আপনি আমি কি প্রতিকার করতে পারি বলুন? যার হাতে অত টাকা—"

কথাটা শুনে রূপচাঁদ দ'মে গেলেন একটু মনে মনে। বস্তুতান্ত্রিক লোক তিনি, টাকার ক্ষমতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে অনেক টাকা আছে—এ সংবাদটা মোটেই আনন্দজনক নয় তাঁর কাছে। তাঁর ধারণা, টাকা দিয়ে প্রত্যেক স্ত্রীলোককেই কেনা যায়। কাকে কিনতে কত সময় এবং কি পরিমাণ অর্থ লাগে, সেইটে কেবল নির্ভর করে প্রতি স্ত্রীলোকের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদাবোধের উপর। আর কোন তফাত নেই। অমরেশ যে বড়লোক তা রূপচাঁদ জানতেন, কিন্তু তার ঠিক কত টাকা আছে এ খবরটা ঠিক তিনি জানতেন না। ঈষৎ কৌতূহল হ'ল।

"অনেক টাকা আছে নাকি ওঁর?"

"নেই? বাংলা বিহার উড়িষ্যা সব জায়গাতেই কিছু না কিছু জমিদারি আছে যে। নগদ টাকাও আছে বেশ। বাপের, শ্বশুরের, মামার—তিন জায়গারই বিষয় পেয়েছেন কিনা। ত্রিবেণী-সঙ্গম। অগাধ জলের মাছ উনি"

রূপচাঁদ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে নীরব হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর

বললেন, "এ ক্ষেত্রে একটিমাত্র লোক অবশ্য রাশ টেনে ধরতে পারেন—ওঁর পরিবার"

মল্লিক মশাইও কথাটা স্বীকার করলেন।

"তা পারেন বইকি. একশো বার পারেন। কিন্তু করছেন না তো কিছু বরং ওঁর গোড়েই গোড় মিলিয়ে—"

"আমরা সেদিন যেটা দেখলাম, সে খবরটা উনি জানেন না বোধ হয়। আমাদের উচিত খবরটা ওঁর কানে তুলে দেওয়া। আমার দ্বারা অবশ্য অসম্ভব সেটা, কোন কৌশলে আপনি যদি পারেন"

"আমি ? ও বাবা ! কে পড়তে যাবে ওই বাঘিনীর পাল্লায় !"

"বাঘিনী নাকি ? মনে তো হয় না দেখে ?"

"আপনার মনে হবে কেন, হবার কথাও নয়, যার ঘাড়টি মটকায় সে-ই জানতে পারে"

"ঘাড় মটকায় নাকি ?"

"খুব মটকায়। এখানকার জমিদারি তো ওঁরই বাপের, উনিই সব দেখাশোনা করেন, পান থেকে চুনটি খসবার জো নেই কারও। লেখাপড়া তেমন জানেন না বটে, কিন্তু সমস্ত জমিদারির হিসাবপত্র একবারে নখাগ্রে"

"সেইজন্যেই তো আমার আরও আশা হচ্ছে যে, নিজের স্বামীর পান থেকে চুন খসার খবরটা পেলে উনি ছেড়ে কথা কইবেন না। খবরটা আপনি পৌঁছে দিন কোন রকমে, বুঝলেন ? আপনি ইচ্ছে করলে সব পারেন"

কথাটা ব'লে রূপচাঁদ এমনভাবে চাইলেন মল্লিক মশাইয়ের দিকে যে, মল্লিক পুলকিত না হয়ে পারলেন না।

"নবুর মাকে দিয়ে খবরটা বলাতে পারি অবশ্য। এমনভাবে বলবে, যেন গুজব শুনেছে একটা। সেটা কিছু অসম্ভব নয়"

"নবুর মা-টি কে ?"

"ওঁর ঝি"

ক্ষণকাল নীরব থেকে রূপচাঁদ বললেন, "উপকারটি করুন তা হ'লে। অমরেশ আমাদের বন্ধুলোক, কিন্তু এসব ব্যাপার সামনাসামনি তো বলা যায় না কিছু। অথচ—"

রূপচাঁদ এমন একটা ভাব করলেন যে, মল্লিক মশাই যদি নবুর মাকে দিয়ে রত্নপ্রভার কানে খবরটা তোলেন তা হ'লে তিনি, মানে রূপচাঁদই, যেন ব্যক্তিগতভাবে বাধিত হবেন। মল্লিক মশাই রূপচাঁদের কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে এসেছেন, রত্নপ্রভার উপর তাঁর নিজেরও একটা আক্রোশ আছে, তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

"বেশ, নবুর মাকে বলব আমি। দু-চার দিনের মধ্যে চ'লেও যাচ্ছেন ওঁরা"

"কারা ?"

"অমরবাবুরা"

"কোথায় ?"

"ওঁদের জমিদারি দেখতে। নানান জায়গায় সম্পত্তি আছে তো। একটা জরুরি তারও এসেছে নাকি কোথা থেকে"

"ডানাও সঙ্গে যাচ্ছে নাকি ?"

"প্রাইভেট সেক্রেটারি যখন, যাওয়া তো উচিত"

রূপচাঁদের মনটা ঝম্পনোন্মুখ বিড়ালের মত একাগ্র হয়ে উঠল সহসা।

"সিংহেশ্বর দারোগাকে আজই খবর পাঠাব আমি। আপনিও নবুর মাকে লাগান আজই, দেরি করবেন না। দেরি করবেন না, বুঝলেন ?"

"আচ্ছা"

"মল্লিক মশাইয়ের কেমন যেন অস্পষ্টভাবে মনে হ'ল যে, সিংহেশ্বর দারোগাকে সপক্ষে আনার মূল্য হিসাবেই যেন তাঁকে এ কাজটি করতে হবে"

"উঠি তবে"

"নবুর মায়ের কথাটা ভুলবেন না"

"না"

মল্লিক মশাই চ'লে গেলেন। চুপ ক'রে ব'সে রইলেন রূপচাঁদ। একটা অদ্ভুত ধরনের অনুভূতি হতে লাগল তাঁর। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে সিন্দবাদ নাবিকের গল্প পড়েছিলেন। তারই একটা ঘটনা, মনে প'ড়ে গেল। একটা সর্পসঙ্কুল গুহার মধ্যে ঢুকে প'ড়ে সিন্দবাদের মানসিক অবস্থা যে রকম হয়েছিল, তাঁরও যেন সেই রকম হ'ল। চতুর্দিকে কিলবিল করছে অসংখ্য সাপ। প্রত্যেকটা মনোহর, প্রত্যেকটা বিষধর। প্রত্যেকের ফণার দু পাশে জ্বলজ্বল করছে চোখ, না, মণি? রূপচাঁদের শরীরের শিরায় উপশিরায় অগ্নিস্রোত বইতে লাগল যেন। পর-মূহূর্তেই সামলে নিলেন নিজেকে। না, আত্মহারা হ'লে চলবে না। স্থির মস্তিষ্কে অগ্রসর হতে হবে। আপিসের কাজে মন দিলেন আবার।

১৬

দ্বিপ্রহরটা ভারি অদ্ভুত মনে হ'ল কবির কাছে। মনে হ'ল দ্বিপ্রহরের রূপটা চোখেই পড়ে নি এতদিন। দিবসের পূর্ণ যৌবন যেন অনাড়ম্বর সৌন্দর্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোথাও কোনও সাজসজ্জা নেই, কোনও কলরব নেই। মানুষ, গাছ পশুপক্ষী সকলেই যেন সংযত হয়ে আছে, একটা আত্মসম্বরণের সুর যেন ফুটে উঠেছে চারিদিকে। আত্মসম্বরণ, না, আত্মবিস্মৃতি?—সহসা মনে হ'ল তাঁর পূর্ণ যৌবন তো আত্মবিস্মৃত। নিজের মহিমার সম্পূর্ণ খবর সে নিজেও জানে না, অপরকে জ্ঞাতসারে জানাবার চেষ্টাও করে না তাই সকালে অমরেশবাবুর বাড়ি গিয়ে প্যাঁচা দুটো দেখেও এই কথা মনে হচ্ছিল তাঁর। ওদের অটল গাম্ভীর্য, প্রচ্ছন্ন প্রতাপ, ওদের শ্বাপদসুলভ

স্থূলতার সঙ্গে পক্ষীসুলভ লঘুতার সমন্বয়—এ সমস্তর সম্বন্ধেই ওরা উদাসীন। আমাদের মনে যে ভাব ওরা উদ্রেক করেছে, তার খবর ওরা নিজেরাই জানে না। ডানার কথা মনে হ'ল। সকালে যখন গিয়েছিলেন, ডানা তখন ছিল না সেখানে। না থাকাতে একটু আরামই পেয়েছিলেন মনে মনে। সেদিন অমন জোর ক'রে রঙ দেওয়ার পর থেকে নিজেই যেন অপরাধী হয়ে আছেন নিজের কাছে। হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, এই সঙ্কোচটাকে তিনি যদি প্রশ্রয় দেন, তা হ'লেই পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে। তিনি তো অন্যায় কিছু করেন নি, তাঁর মনে কোন পাপ নেই, সেদিন নিছক আনন্দের প্রেরণায় রঙে রসে মেতে উঠেছিলেন তিনি, তার মধ্যে স্থূল কিছু ছিল না। উঠে পড়লেন তৎক্ষণাৎ। এ সঙ্কোচের বাধাকে সরাতে হবে, এখনই সরাতে হবে। ডানাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, তিনি রূপরসিক কবি, মাংসলোলুপ পশু নন। তার দেহে, তার যৌবন-শ্রীতে যে সৌন্দর্য ক্ষণিকের লীলায় মূর্ত হয়ে উঠেছে, তারই তিনি উপাসক।

...হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলেন তিনি। সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের আর একটা চিন্তা তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল, তাঁর এই সৌন্দর্য-পূজার ফলে ডানার মনোজগতে যদি একটা বিপ্লব ঘ'টে যায়, তা হ'লে তার পরিণাম কি হবে? এ রকম বিপ্লব ঘটতে পারে কি? না পারার কোনও হেতু নেই। বয়সের পার্থক্য প্রেমের অন্তরায় নয়। বৃদ্ধের সঙ্গে যুবতীর প্রেমের অনেক কাহিনী শোনা গেছে। আর এ কথাও সুবিদিত যে, কোনও নারী যখন কোনও পুরুষকে ভালবেসে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে, তখন দেহ সম্বন্ধে শুধু যে কোনও সঙ্কোচ থেকে না তা নয়, সমস্ত দেহ-মন দয়িতের কাছে নিবেদন করতে না পারলে তার তৃপ্তি হয় না,—আত্মসমর্পণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং—। হঠাৎ চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিলেন তিনি। ভাবলেন, আমার নিজের মনে যখন ও-ধরনের কোনও চিন্তা জাগে নি, তখন ডানার মনেও জাগবে না।

খুকু নেই, খুকু নেই, খুকু নেই—

গাছের উপর থেকে পাখি ডেকে উঠল একটা। চেয়ে দেখলেন, হাঁড়ি-চাঁচা পাখি। এই পাখি তো চ্যা-চ্যা-চ্যা ক'রে ডাকে, ওই ডাকের জন্যই ওর হাঁড়ি-চাঁচা নাম সম্ভবত। অমন মিষ্টি ক'রেও ও ডাকতে পারে নাকি ?

খুকু নেই, খুকু নেই—

কি চমৎকার ছুলে ছুলে ডাকছে। সত্যিই কি খুকু নেই বলছে ? কান পেতে শুনলেন। এবার মনে হ'ল, যেন 'কু অক্ রিং' 'কু অক্ রিং' বলছে। কবি আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলেন। পর-মুহূর্তেই পাখিটা কিন্তু উড়ে গেল। উড়তেই তার ঝোলা লেজের বাহার দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি। একটা জাপানী পাখা যেন। কালোর চারিদিকে চওড়া সাদা পাড়। অতি সাধারণ পাখি, তবু একে ভাল ক'রে দেখেন নি কোনদিন। দেখেছেন, কিন্তু চেনেন নি। তখনই আবার মনে হ'ল, চেনা সহজ কি ? যার চ্যা-চ্যা ডাক 'খুকু নেই' হয়ে যায় এবং সেই 'খুকু নেই' 'কু অক্ রিং' শোনায় পর-মুহূর্তে, তার পরিচয় কি সহজে পাওয়া যাবে ? অমরবাবু যে বইটা দিয়েছেন, সেই বইটা উলটে দেখতে হবে একটু। এই প্রসঙ্গে মনে হ'ল, একটা পাখির ব্যাপারেই যখন এত হেঁয়ালি, মানুষের ব্যাপারে সে হেঁয়ালি না জানি আরও কত জটিল ! অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে তিনি ডানার বাসার দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। যে অপ্রত্যাশিত রূপ তিনি এই সামান্য পাখিটার মধ্যে দেখলেন, ডানার মধ্যেও তেমনই একটা কিছু পাওয়া যাবে কি না এই ধরনের একটা ঔৎসুক্য তাঁর সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল, একটা শব্দ শুনে তাঁর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। তিনি দেখলেন—একটি স্ত্রীলোক এবং একটি কিশোর বালক ডানার বাড়ির পিছন দিক থেকে ছুটে পালাচ্ছে, ঝোপ-জঙ্গল ভেদ ক'রে মাঠামাঠি দৌড়চ্ছে। কবি সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। ভদ্রঘরের

বয়স্ক মেয়েকে এমনভাবে ছুটতে কখনও দেখেন নি তিনি। মাথার খোঁপা এলিয়ে পড়েছে পিঠে, পরনের শাড়ি গাছ-কোমর ক'রে বাঁধা। বকুলবালা আনন্দমোহনকে দেখেই ছুট দিয়েছিলেন, দূর থেকে আনন্দমোহন তাঁকে চিনতে পারলেন না। চণ্ডীর সঙ্গে বকুলবালা চুপিচুপি দুপুরবেলা বেরিয়েছিলেন, অমরবাবু পাখিদের জন্যে কাঠের যে সব বাসা বানিয়ে নানা গাছে টাঙিয়ে দিয়েছেন তাই দেখবার জন্যে। ডানার বাসার সামনের গাছেই টাঙানো ছিল কাঠের বাক্স একটা, চণ্ডী দূর থেকে সেইটে দেখাচ্ছিল বকুলবালাকে।

কবি গিয়ে দেখলেন, দূর থেকেই দেখতে পেলেন, ডানা নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছে। এক ফালি রোদ এসে পড়েছে তার বাঁ কাঁধের উপর। শাড়ির জরি-পাড়টা জ্বলছে রোদ লেগে, কমলা-রঙের শাড়িটা যেন আগুনের শিখা। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দেখলেন তিনি, তারপর এগিয়ে গেলেন।

"পড়া হচ্ছে নাকি ?"

ডানা ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হেসে বললে, "আসুন। অনেক দিন আসেন নি"

"কি পড়ছ ?"

"পাখির বই একটা"

"অমরবাবু দিয়েছেন বুঝি ?"

"হ্যাঁ"

কবির সঙ্কোচ কেটে গেল। সহজ স্বরেই আলাপ করতে লাগলেন তিনি।

জরুরি তার এসেছিল রত্নপ্রভার বাপের বাড়ি থেকে। পয়লা বৈশাখ সেখানে খুব উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে যেতে হবে। যেতেই যখন হচ্ছে, তখন বিষয়-সম্পত্তির কাজকর্মগুলোও মিটিয়ে আসবেন ঠিক করেছেন অমরবাবু। কিছুদিন আগেই এটা ঠিক করেছিলেন তিনি। কিন্তু পাখির ব্যাপারে সম্প্রতি এত মেতে উঠেছিলেন যে, কথাটা মনে ছিল না। মনে পড়াতে এখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এখানকার ব্যাপারগুলোর কি হবে ভেবে। এতগুলো পাখি ধরা হয়েছে, নানা গাছে পাখির বাসা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকগুলো আস্ত পাখি বম্বে পাঠান হয়েছে ট্যাক্সিডার্মিস্টের কাছে, পাখির ঘর তৈরি করবার জন্যে নানা রকম খাঁচা করতে দিয়েছেন, ইট পোড়ান হচ্ছে, তিনি না থাকলে এসব দেখবে কে? মল্লিক পারবেন না। অথচ তাঁকে যেতেই হবে। এখানকার ব্যাপারের সমস্ত ভারটা ডানার উপরেই দিয়ে যেতে চান তিনি। কোন্ পাখিকে কি খেতে দিতে হবে, তার ফর্দ এবং বই ডানাকে তিনি দিয়েছেন। পাখির যেসব বাসা বানিয়ে দিয়েছেন, তাতে কোন্ কোন্ পাখি আসা সম্ভব তারই বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এখন। হাতে বই ছিল একটা। হঠাৎ বললেন, "দেখুন, ডিউয়ারের (Dewar) এ বইখানা আমি নিয়ে যাব। আপনি বরং নোটই ক'রে নিন"

ডানা কাগজ-পেন্সিল বার ক'রে বসল।

"পাখিরা সাধারণত কোন্ কোন্ জায়গায় বাস করে, তারই একটা মোটামুটি ফর্দ আছে এতে। লিখুন, বড় হেডিং দিন—বাড়ি। তারপর সাব-হেডিং—দেওয়ালের গর্তে বা ফাটলে। লিখুন—চড়াই, হুপো (মানে মোহনচূড়া), শালিক, কুটুরে-প্যাঁচা অবশ্য পুরোনো বাড়িই আশ্রয় করে বেশি, নীলকণ্ঠ, দোয়েল, খঞ্জন (মানে Pied Wegtail)—যেগুলো এ দেশে থাকে। তারপর সাব-হেডিং—

পরলে বা কড়ি-বরগার ফাঁকে—কালিশ্যামা, পায়রা, ঘুঘুও অনেক সময়, শালিক। আবার সাব-হেডিং—উঁচু ছাদ (যেমন চার্চের ছাদ) —শকুনি, ইনি বলছেন ছাদের উপর টিট্টিভও নাকি কখনও কখনও বাসা বাঁধে, আমি কখনও দেখি নি। আমাদের নদীর ধারের বাড়িটায় লক্ষ্য রাখবেন একটু। তারপর সাব-হেডিং দিন—বাইরের দিকের দেওয়ালে, পরলের কাছে—তাল-চোঁচ, মানে Indian Swift, সোয়ালো, ক্র্যাগ মার্টিন—"

"সায়ালো কোন্‌গুলো বলুন তো, দেখেছি কি? ক্র্যাগ মার্টিন কি এদেশী পাখি?"

"সোয়ালো আপনাকে দেখিয়েছি। ল্যাজে সরু তারের মত—Wire-tailed নাম সেইজন্যে। জগদানন্দবাবু ওর বাংলা নাম দিয়েছেন 'নকুটি'। ক্র্যাগ মার্টিনের পুরো নাম হচ্ছে ডাস্কি ক্র্যাগ মার্টিন (Dusky Crag Martin), আমিও খুব বেশি দেখি নি এ অঞ্চলে। তারপর লিখুন—কড়ি বা বরগা থেকে, কিংবা কোন তার থেকে যেসব পাখি বাসা ঝুলিয়ে দেয়—টুনটুনি, বাবুই. বারান্দায় টবের গাছে যারা বাসা বাঁধে—দর্জিপাখি, বুলবুল। বাড়ি এবং বাড়ির আশপাশ হয়ে গেল। এইবার বাইরে যাওয়া যাক। নদীর তীরে যারা গর্ত ক'রে বাসা বাঁধে—গাংশালিক, বাঁশপাতি (গ্রীন ব্লুটেল্‌ড্‌ও), মাছরাঙা (কমন পায়েড, হোয়াইট-ব্রেস্টেড)। গাছে যারা গর্ত ক'রে বাসা বানায়—বসন্তবউ, ভগীরথ, কাঠঠোকরা (গোল্ডেন ব্যাক্‌ড্‌—সেদিন যেটা দেখলাম, আর পায়েড, মারহাট্টা)। এরা গাছের গুঁড়িতে বা ডালে নিজেরাই গর্ত বানায়। আর কতকগুলো পাখি থাকে, তারা গাছের গুঁড়িতে যেসব ফাটল বা গর্ত থাকে, তাতে বাসা বানায়—যেমন পাওয়াই (দু রকমই—গ্রে-হেডেড, ব্ল্যাক-হেডেড), এরা শালিক জাতীয়, সাধারণ শালিকও এসব জায়গায় বাসা বানায়, চড়াই, কালিশ্যামা, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, হুপো, প্যাঁচা, টিল, মানে ছোট ছোট হাঁস। হয়েছে?"

ডানা তাড়াতাড়ি লিখে যাচ্ছিল, চোখ তুলে একটু হেসে বললে, "টিল বললেন ?"

"হ্যাঁ, টিল। কুম্‌ব্ ডাকও লিখুন। কুম্‌ব্ ডাক বুঝলেন তো ? নাক্‌টা যাকে বলে। এইবার সাব-হেডিং হবে—ঝোপে-ঝাড়ে, গাছের নীচের দিকে"

ডানা লেখা শেষ ক'রে বলল, "হয়েছে, এইবার বলুন"

বাধা পড়ল। রত্নপ্রভা এসে ঢুকলেন। চকিতে বৈজ্ঞানিকের এবং ডানার দিকে চেয়ে নীরবে একটা চেয়ার টেনে বসলেন তিনি। মিনিট কয়েক আগে নবুর মার মুখে তিনি পল্লবিত কাহিনীটি শুনেছেন, ডানা নাকি বৈজ্ঞানিকের পিঠে উঠে নদীর ধারে একটা গাছ থেকে ফুল পাড়ছিল। কাহিনীটি সালঙ্কারে বিবৃত করার ফলে নবুর মায়ের চাকরিটি গেছে। রত্নপ্রভা সঙ্গে সঙ্গে দূর ক'রে দিয়েছেন তাকে।

রত্নপ্রভা স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, "ডানাও চলুক না আমাদের সঙ্গে। তোমার লেখাপড়ার কাজে সাহায্য করতে পারবে"

"অসম্ভব। এখানে তা হ'লে দেখা-শোনা করবে কে ? ওর উপরই সব ভার দিয়ে যাচ্ছি এখানকার। অতগুলো পাখির বাসা টাঙানো হয়েছে, কোন্ পাখি কোথায় বাসা বাঁধে সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে তো ?"

"একা একা ওঁর ভাল লাগবে কি ?"

"তা লাগবে"—ডানা হেসে বললে।

"আনন্দবাবুও থাকবেন। তাঁর উপরও ভার দিয়ে যাব। নিন লিখুন। এইবার লিখুন—যেসব পাখি ঝোপে-ঝাড়ে কিংবা গাছের নীচের দিকে বাসা বানায়"

রত্নপ্রভা উঠে গেলেন। তিনি যা জানতে এসেছিলেন, তা জেনে গেলেন। নবুর মা ইঙ্গিতে যা প্রকাশ ক'রে গেল তা যদি সত্য হ'ত, তা হ'লে ডানাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বৈজ্ঞানিক

উল্লসিত হয়ে উঠতেন। স্বামীর উপর ক্ষণিকের জন্যও সন্দেহ হয়েছিল ব'লে অনুতাপ হ'ল তাঁর। রাগও হ'ল। নবুর মাকে আবার ডাকতে পাঠালেন তিনি।

বৈজ্ঞানিক আরম্ভ করলেন, "ঝোপে-ঝাড়ে বা গাছের নীচের দিকে—সাব-হেডিং দিয়েছেন ? এইবার লিখুন—ছাতারে, হোয়াইট আর সবজে মুনিয়া, বুলবুল, দর্জিপাখি, কুলোপাখি, বাবুই, টুনটুনি। হ'ল ? তারপর লিখুন—কুয়োপাখি, আনন্দবাবু যার নাম দিয়েছেন বাদামী-কালো, ঘুঘু ; আরও কয়েকটা নাম আছে, থাক্ সেগুলো। এইবার সাব-হেডিং দিন—যে সব পাখি গাছের উপরে মগডালের কাছাকাছি বাসা বাঁধে—সবরকম চিল, কাক, হাঁড়িচাঁচা, ফটিকজল, ফিঙে, শকুনি, সব রকম বাজ, হরিয়াল, বক, সারস, মুণ্ডক, পানকৌড়ি, গগনভেড় ইত্যাদি। আরও অনেক নাম আছে, সেসব এখানে দেখতে পাবেন না। তারপর সাব-হেডিং দিন—যারা ফসলের ক্ষেতে কিংবা নলখাগড়ার বনে কিংবা বড় বড় ঘাসের ঝোপে বাসা বানায়—হলদে-চোখ ছাতারে, বুলবুল, দর্জিপাখি, রেনওয়ার্বলার (হিন্দীতে যার নাম ফুৎকি), টুনটুনি, নীল বগলা, যার ইংরেজী নাম Purple Heron এইবার লিখুন—উঁচু পাহাড়ের খাঁজে বা ফাটলে যারা বাসা বানায়—চিল, শকুনি, বাজ, নীল পায়রা। এইবার লিখুন, ও, হয় নি বুঝি এখনও ?"

"হয়েছে। বলুন"

"লিখুন—মাটিতে যারা বাসা বানায়—কালিশ্যামা (কদাচিৎ), বগেরি, ভরতপাখির দল, নাইট্‌জার, ময়ূর, বনমুরগি, বটের, তিতির, সারস, হুকনা, বাটান, কাদাখোঁচা, টিট্টিভ, গাংচিল (হুইস্কার্ডগুলো নয় কিন্তু)। এইবার সাব-হেডিং দিন—ঝিলে বিলে যারা বাসা বানায়—জলমুরগি, কূট অর্থাৎ কারণ্ডব (এ দেশে যাদের বাবাজী বলে), জলপিপি, পানডুবি, অর্থাৎ Dalchick, Whiskered Tern, গুঁপো গাংচিল বললে কি খুব খারাপ শোনাবে ?"

ডানা লেখা শেষ ক'রে হেসে বললে, "এর অনেক পাখি কিন্তু চিনি না"

"সালিম আলি আর হুইসলার বই দুটো রেখে যাব। দেখে নেবেন। ছবি দেখলে চিনতে কষ্ট হবে না"

কবি এসে হাজির হলেন।

"আসুন, আসুন, আপনারই প্রতীক্ষা করছি। আমার অবর্তমানে আপনি আর ইনি আমার পাখিগুলোর তদারক করবেন। পাখিদের সম্বন্ধে যদি নতুন কিছু দেখেন, লিখে রাখবেন"

"আমি লিখব কবিতায়, তা আপনার কাজে লাগবে না তো"

"বেশ, আপনি কবিতাতেই লিখবেন। ইনি লিখবেন গদ্যে। দুটো মিলিয়ে দেখা যাবে, আমার সঙ্গে কোন্‌টা বেশি মেলে"

ডানার মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল।

কবি বললেন, "আমার সঙ্গে কিছু মিলবে না। আপনি সেদিন প্যাঁচার জাতি বংশ নখ পালক নিয়ে অত বক্তৃতা করলেন, কিন্তু আমার কবিতায় যা ফুটল সে একেবারে অন্য জিনিস"

"কবিতা লিখেছেন নাকি ?"

"এনেওছি সঙ্গে"

"পড়ুন"

কবি পকেট থেকে কবিতার খাতা বার ক'রে পড়তে লাগলেন—

দেখেছি তোমার মাঝে বিহঙ্গের অম্বর-বিলাস
মার্জারের শব্দহীন সুগোপন শিকারান্বেষণ
তীক্ষ্ণ তব নখ-চঞ্চু, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাধা-বিদারণ
চীৎকার-ছুরিকাঘাতে নিশীথের স্তব্ধতা-বিনাশ
কর যবে হে পেচক,
শান্তরে অশান্ত কর, কেঁপে ওঠে মৃত্তিকা আকাশ।

অতি স্বচ্ছ দিবালোকে শুনি গান অসংখ্য পক্ষীর
হিংস্র শ্বাপদেরা জানি অন্ধকারে করে সঞ্চরণ
উভয়ের প্রাণধর্ম করিয়াছ তুমি সংহরণ
অন্ধকার প্রাসাদের দ্বারপাল, হে গুরু-গম্ভীর,
শক্তিধর, হে পক্ষী-পাঠান,
হে অদ্ভুত, হে বলিষ্ঠ, হে বাহন জীবন-লক্ষ্মীর।

"চমৎকার হয়েছে তো!"—বৈজ্ঞানিক বললেন,—"প্যাঁচার চরিত্রটা বেশ ফুটেছে"

"বেশ ফুটেছে?"—ডানার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন কবি।

ডানা হাসিমুখ চুপ ক'রে রইল ক্ষণকাল, তারপর বললে, "সত্যিই বেশ হয়েছে"

কবিতার কথা কিন্তু চাপা প'ড়ে গেল পর-মুহূর্তেই।

বৈজ্ঞানিক কবিকে বললেন, "কোন্ কোন্ পাখি কোন্ কোন্ জায়গায় বাসা বানায়, তার মোটামুটি ফর্দ দিয়ে গেলাম একটা এঁর কাছে। লক্ষ্য রাখবেন, আমাদের তৈরি বাসাগুলোতে কোনও পাখি আসে কি না"

"বেশ"

"পাখিদের খাবার যদি বাসার চারিধারে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হ'ত, তা হ'লে খাবারের লোভে পাখিগুলো আসত অন্তত। তারপর বাসা পছন্দ হ'লে হয়তো থেকেও যেত। দাঁড়ান, পাখিদের খাবারেরও আইডিয়া একটা দিয়ে দিই আপনাদের"

বৈজ্ঞানিক উঠে পাশের ঘরে গিয়ে বই খুঁজতে লাগলেন।

কবি ডানাকে বললেন, "কি টুকছিলে এতক্ষণ? দেখি—"

ডানা খাতাখানা এগিয়ে দিলে। পড়তে পড়তে ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠল কবির।

এই সব রাবিশ লিখে যেতে হচ্ছে ওকে প্রত্যহ! ডানাকে

প্রাইভেট সেক্রেটারি নিযুক্ত করাতে তিনিই সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন। এখন কষ্ট হতে লাগল। খাতাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই ব'সে রইলেন তিনি। তাঁর মনে হতে লাগল, ছ্যাকড়া-গাড়িতে ঘোড়াই জোতা উচিত ছিল অমরবাবুর, ময়ূরকে এ কাজে লাগানোটা ঠিক হয় নি। আর কিছু নয়, অশোভন। ময়ূরের কথায় মনে পড়ল ময়ূরবাহন কুমার কার্তিকেয়কে। তারপরই মনে পড়ল কুমারসম্ভবের শ্লোক—

তস্যাত্মা শিতিকণ্ঠস্য সৈন্যাপত্যমুপেত্য বঃ
মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং বেণীবীর্য্যবিভূতিভিঃ।

যিনি নিজের বীর্যপ্রভাবে বন্দিনী দেববালাদের বেণী বিমোচন করতে পারেন, তিনিই ময়ূরবাহন হওয়ার উপযুক্ত।

একগাদা বই নিয়ে এলেন বৈজ্ঞানিক।

"এই বইগুলো আপনাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। অনেক রকম খবর পাবেন এগুলোতে"

বইগুলো খুলে খুলে প্রত্যেকটির পরিচয় দিতে শুরু করলেন। দিতে দিতে সক্ষোভে ব'লে উঠলেন বৈজ্ঞানিক, "সত্যি, আমরা কিছুই করছি না, এরা কত রকম ভাবে পাখির বিষয়ে লিখেছে দেখুন। ইনি কেবল পাখির ওড়া নিয়েই বই লিখেছেন একটা। ইনি লিখেছেন গান নিয়ে। পাখির বাসা নিয়ে, ডিম নিয়ে, দেশভ্রমণ নিয়ে, খাদ্য নিয়ে এঁদের কৌতূহলের আর অন্ত নেই। রিপ্লে সাহেব হামিং বার্ড দেখবার জন্যে ডাচ নিউগিনি পর্যন্ত ধাওয়া করলেন। আমরা কি করলাম জীবনে?"

"আপনিও করুন না। বাধাটা কিসের?"—হেসে বললেন কবি।

"অত টাকা কোথায় মশাই? আমার যদি টাকা থাকত, আমিও নিউগিনি গিয়ে থেকে আসতাম কিছুদিন"

"আপনার টাকা নেই? বলেন কি?"

"যা আছে, তা যথেষ্ট নয়। প্যাসিফিকের দ্বীপগুলোতে ঘুরে বেড়াতে গেলে নিজের ছোটখাট একটা জাহাজ থাকা দরকার। আমি একা তো যেতে পারব না। রত্নাকে চাই। তা ছাড়া আরও লোকজন চাই। ভাল একজন ফোটোগ্রাফার চাই। দোভাষীও দরকার প্রতি পদে। খরচ অনেক"

"কিন্তু আপনার তো আয়ও অনেক শুনেছি"

"খরচ নেই? চারটে স্কুলের সমস্ত খরচ দিতে হয়। প্রত্যেক জায়গায় কাছারি কাছে, কর্মচারী আছে। আমার মায়ের নামে একটা হাসপাতাল করিয়ে দিতে হবে, তাতেই দশ-বারো লক্ষ টাকা বেরিয়ে যাবে। জগুচকের প্রজারা ধরেছে, তাদের জমিতে বাঁধ দিয়ে একটা লক্‌গেট ক'রে দিতে, প্রতি বছর বানে তাদের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ক'রে দিতেই হবে। পাখির পিছনে খুব বেশি টাকা খরচ করব কোথা থেকে? এখানে যা ফেঁদেছি, তাতেই লাখখানেক বেরিয়ে যাবে। এইটেই অপব্যয় মনে হচ্ছে"

বৈজ্ঞানিকের মুখে অপ্রতিভ হাসি ফুটে উঠল একটা। তারপর সে ভাবটাকে চাপা দেবার জন্যে একটা বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলেন তাড়াতাড়ি।

"এই বইটাও আপনি পড়বেন আনন্দবাবু,—Hunters and the Hunted, বিশেষত পাখির অধ্যায়টা। আপনার কল্পনারও অনেক খোরাক আছে ওতে"

"বেশ, রেখে যান"

চরের দৃশ্য জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ হয়ে উঠেছিল। রৌদ্রালোকে দিবা দ্বিপ্রহরে যা ছিল অসহ্য, জ্যোৎস্নালোকে রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাই হয়ে উঠেছে মনোরম। এও অসহ্য মনে হচ্ছিল সন্ন্যাসীর একটা বালুস্তূপের উপর ব'সে ব'সে তিনি ভাবছিলেন, অনুভূতির এ বিকার কবে অবলুপ্ত হবে? চক্রবালরেখালগ্ন বৃক্ষশ্রেণীর রূপ বদলে গেছে, সবুজের লেশমাত্র নেই, সব কালো। নদীতীরের হেলে-পড়া গাছটাকে মনে হচ্ছে, একটা বিরাট সরীসৃপ যে মাথা তুলেছে নদী থেকে। বীভৎস নয়, অদ্ভুত। অদ্ভুত ব'লেই কিন্তু খারাপ লাগছে সন্ন্যাসীর। অন্য কোনও কারণে নয়, এ অনুভূতির মধ্যে নিজের অপূর্ণতার প্রমাণ আছে ব'লে। য অপ্রত্যাশিত, তাই অদ্ভুত। এ ব্যাপারটাকে অপ্রত্যাশিত কে মনে হচ্ছে তাঁর? নিত্যপরিবর্তনশীল বহির্লীলার অন্তরালে যি শাশ্বত অক্ষর, তিনি তো অপ্রত্যাশিত নন, তাঁকে চিনতে বার বা ভুল হচ্ছে কেন? চোখ বুজে ব'সে রইলেন সন্ন্যাসী। মনে ম বলতে লাগলেন, হে নিগূঢ়, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষলোকে অসংখ্য তোমা রূপ—কখনও ভীষণ, কখনও সুন্দর; অসংখ্য তোমার ভাষা- কখনও সরব, কখনও নীরব; অসংখ্য তোমার নির্দেশ—কখন স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট; অসংখ্য তোমার আশ্বাস—কখনও সহ কখনও দুরূহ। তুমিই প্রলোভন, তুমিই সংযম। ভোগে তোমার আনন্দ, ত্যাগেও তোমার আনন্দ। রৌদ্রে জ্যোৎস্না সবুজে কালোতে, পাপে পুণ্যে তুমিই ওতপ্রোত। কল্পনা যা স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে তা প্রতিভাত হচ্ছে না কেন চোখ বুজে ব'সে রইলেন অনেকক্ষণ, দৃষ্টি প্রেরণ অন্তরের অন্তস্তলে, কল্পনাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধিতে দেখতে চে করলেন।

…টিহি—টিট্টিহি—টিট্টিহি। টিট্টিভ পাখিটা ডাকতে ডাকতে উড়ে চ'লে গেল। দূর থেকে শোনা যেতে লাগল কেবল—টিটি, টিটি, টিটি। সন্ন্যাসীর ধ্যানলোকেও পৌঁছল সে ডাক ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে, এবং রূপান্তরিত হ'ল ব'লে ধ্যানের একাগ্রতাও নষ্ট হ'ল। তিনি শুনতে লাগলেন—চিঠি, চিঠি, চিঠি। ভিন্ন খাতে বইল চিন্তাধারা, মানসপটে মায়ের মুখখানা ফুটে উঠল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন, তাঁর দিকে ফিরে বলছেন—বাক্সর তলায় চিঠিখানা আছে, প'ড়ে দেখিস বাবা। ওতেই লেখা আছে সব কথা। বাক্সর তলা থেকে চিঠিখানা বার ক'রে নিয়েছেন তিনি। পড়েওছেন। কিন্তু…। বাবার মুখখানা মনে পড়ল। চোখ দুটো নির্নিমেষে যেন চেয়ে আছে তাঁর দিকে। পাঞ্জাবে চাকরি করতে করতে হঠাৎ তিনি যোগ দিয়েছিলেন সেকালের স্বদেশী-আন্দোলনে। দীক্ষিত হয়েছিলেন অগ্নি-মন্ত্রে। সন্ন্যাসী যদিও রিভল্‌ভার হাতে তাঁকে দেখেন নি কোনদিন, তবু যখনই তাঁকে মনে পড়ে তখনই একটা বিশেষ ছবি ফুটে ওঠে। অন্ধকার রাত্রে তিনি যেন একা হেঁটে চলেছেন বিরাট এক প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে। বলিষ্ঠ দক্ষিণ মুষ্টিতে ধ'রে আছেন পিস্তল। নির্জন প্রান্তর—বন্ধুর, উপলাকীর্ণ। অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে চলেছেন তিনি।…মনে হয়, আজও চলেছেন যেন। আর তিনি ফিরে আসেন নি। অর্থাভাবে দেশের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি ক'রে ফেলেন মা। গঙ্গার ধারের ওই প'ড়ো ঘরটাই নাকি বিক্রি করেন নি কেবল। অমরেশবাবু কি জানেন এ কথা?—সহসা মনে হ'ল সন্ন্যাসীর। মা যাঁকে সম্পত্তি বিক্রি করেছিলেন, তিনি আবার সেটা বিক্রি করেছিলেন আর একজনকে। এই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে অমরেশবাবুর শ্বশুর কিনেছিলেন। অমরেশবাবুর শ্বশুরও বেঁচে নেই। সুতরাং গঙ্গার ধারের ওই প'ড়ো বাড়িটার প্রকৃত মালিক কে—এ কথা অমরেশবাবু হয়তো জানেনই না। জানাবার প্রবৃত্তিও নেই সন্ন্যাসীর। বাবার মুখটা আবার

জেগে উঠল মনে। মনে হ'ল, অন্ধকারে চলতে চলতে হঠাৎ যেন তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। পিতার পথ চেয়ে কত দিন যে কেটেছে তাঁদের! শোকে দুঃখে মা মারা গেলেন অবশেষে। তারপর এলেন সাধু অলখবাবা। তিনি বলেছিলেন, অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধেই তো সমস্ত মানবজাতির অভিযান। কিন্তু সর্বাগ্রে ঠিক করা চাই, কি অসত্য, কোন্‌টা অন্যায়? যা সৎ নয়, তাই অসৎ, তাই অসত্য। যা অসত্য, তাই অন্যায়, তাই অযৌক্তিক। যা সৎ তাই চিৎ, তাই আনন্দ, তাই আমি। এই আমিকেই আবিষ্কার করতে হবে আগে, এই আবিষ্কারের পরিপন্থী যা কিছু, তার বিরুদ্ধেই করতে হবে সংগ্রাম। এই আমির সন্ধানেই তো কাটল অনেক দিন। কত তীর্থে, কত মন্দিরে, কত আশ্রমে, কত আখড়ায়!

টিট্টিহি—টিট্টিহি—টিট্টিহি।

টিট্টিভের ডাক শোনা গেল আবার। আবার চিঠিখানার কথা মনে পড়ল। ওই চিঠিখানাই তাঁকে টেনে এনেছে এখানে। এখনও কিন্তু করা হয় নি কিছু। মাঝে মাঝে মনে হয়, কি হবে হাঙ্গামা ক'রে? যেমন আছে থাক্ না। তাঁর নিজের তো কোনও প্রয়োজন নেই। চিন্তাটা কিন্তু নিঃশেষে মন থেকে মুছে ফেলতে পারছেন না কিছুতে। অদৃশ্য কাঁটার মত কেবলই যেন খচখচ করছে। মনে হচ্ছে, তাঁর নিজের প্রয়োজন নেই সত্য, শুধু যে প্রয়োজন নেই তা নয়, ও একটা জঞ্জাল, বাধা; কিন্তু তাঁর এই মনোভাব তো নির্বিকার মনোভাব নয়। কোন কিছুকেই বাধা ব'লে মনে হবে কেন? তা ছাড়া এটাও তো ঠিক যে, তাঁর হয়তো কাজে লাগবে না, কিন্তু অপরের কাজে লাগতে পারে। এটাও ঠিক যে, অযোগ্য লোকের হাতে পড়লে অকাজেও লাগতে পারে। হঠাৎ কেমন যেন বিব্রত বোধ করতে লাগলেন তিনি। মনে হ'ল, একটা জালে যেন আটকে গেছেন। না, এসব চিন্তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া

হবে না। আবার চোখ বুঝলেন। অন্তরের অন্তস্তলে প্রেরণ করলেন দৃষ্টি। দূরে দূরে বহুদূরে গোপন সত্তার গভীরে চ'লে গেল মন, অবলুপ্ত হয়ে গেল বাহ্য জগৎ, নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন তিনি।

সন্ন্যাসী যখন চোখ খুললেন, চন্দ্র তখন পশ্চিম-গগনে ঢ'লে পড়েছে, পূর্বাকাশে উত্তর-ভাদ্রপদ নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। প্রভাতের বেশি বিলম্ব নেই আর। উঠে পড়লেন তিনি। উঠতেই টিট্টিহি-টিট্টিহি শব্দ ক'রে কয়েকটা টিট্টিভ কলরব ক'রে উড়ল। কাছেই তারা একটা বালুস্তূপের আড়ালে ব'সে ছিল, সন্ন্যাসী দেখতে পান নি। সন্ন্যাসী বালির চড়া ভেঙে নদীর ধারে এলেন, তারপর বাঁশের সঙ্কীর্ণ সাঁকোর সাহায্যে নদী পার হয়ে নিজের আস্তানার দিকে এগিয়ে গেলেন। তখনও তিনি সম্পূর্ণভাবে বহির্জগৎ সম্বন্ধে সচেতন হন নি, অন্তরের যে জ্যোতির্ময় লোকে এতক্ষণ তিনি বিহার করছিলেন, তারই প্রভায় তখনও তাঁর মন আবিষ্ট হয়ে ছিল। তাই তিনি লক্ষ্য করলেন না যে, তাঁর ঘরের কপাটটা খোলা রয়েছে। কপাট অবশ্য খুবই জীর্ণ, তবু তাতে শিকল ছিল, যাবার সময় রোজই তিনি শিকলটা তুলে দিয়ে যান, আজও গিয়েছিলেন। কপাট খোলা কেন ?—এ প্রশ্ন তাঁর মনে যদিও জাগল না, কিন্তু ঘরে ঢুকে তিনি বিস্মিত হলেন। ঘরের এক কোণে অন্ধকারে কে যেন ব'সে রয়েছে!

"কে ?"

"আমি, ডানা"

"তুমি এ সময়ে এখানে কেন ?"—রীতিমত বিস্মিত হয়ে গেলেন সন্ন্যাসী।

"ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি"

"ভয় ? কিসের ভয় ?"

ভয়টা যে কিসের, তা ডানা সোজাসুজি বলতে পারলে না। ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বললে, "বলছি, বসুন"

আসনটা পেতে সন্ন্যাসী বসলেন। ভগ্ন বাতায়নপথে এক ফালি জ্যোৎস্না এসে ঘরে ঢুকেছিল, সেই জ্যোৎস্নালোকে ডানার আনত মুখখানি দেখতে পেলেন তিনি। তাঁর মনে হ'ল, এই ধরনের একখানি মুখ কোন এক মন্দিরের গাত্রে তিনি যেন চিত্রিত দেখেছিলেন। ভীত সঙ্কুচিত, কিন্তু একাগ্র। দেবতার কাছে বক্তব্যটা নিবেদন করতে বাধছে কিন্তু তাই ব'লে নিবেদন করবার আগ্রহটা কম নয়—এই ভাবটা ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী।

কি বলবে, তা ডানাও সত্যি ভেবে পাচ্ছিল না। নিজের আচরণে নিজের কাছেই লজ্জিত হয়ে পড়েছিল সে। যে ঔদাসীন্যের বর্মে নিজেকে আবৃত ক'রে, রূপচাঁদের প্রণয়-অভিযানকে ব্যাহত করবে সে ভেবেছিল, কার্যকালে তা কোনও কাজেই লাগল না। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসতে হ'ল। পালিয়ে আসার লজ্জাটাই সবচেয়ে পীড়া দিচ্ছিল তাকে। নিজের দুর্বলতার এত বড় অকাট্য প্রমাণ তার জীবনে আর কখনও এমন নিদারুণভাবে প্রকট হয়ে ওঠে নি।

সন্ন্যাসী নীরবে চেয়ে ছিলেন তার দিকে। নীরবতাটাই যেন প্রশ্ন করছিল, চুপ ক'রে আছ কেন, কি বলবে, ব'ল?

বলতেই হ'ল শেষকালে।

"রাতদুপুরে রূপচাঁদবাবু হঠাৎ এসেছিলেন আমার ঘরে"

"কেন?"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে প্রায় অস্ফুটকণ্ঠে ডানা বললে, "কি জানি!"

"জান নিশ্চয়, তা না হ'লে পালিয়ে এলে কেন?"

ডানা নতমস্তকে ব'সে রইল চুপ ক'রে।

সন্ন্যাসী বললেন, "অন্যায় করেছ। নিজেকে বুঝতে পার নি। তুমি অভয়, তুমি ভয় পাবে কেন ?"

কথাটার সম্পূর্ণ তাৎপর্য ডানা বুঝতে পারলে না। সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত হাসি হেসে বললে, "ভয় করল যে"

"তার মানেই—নিজেকে বুঝতে পার নি। দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি"

ঘরের কোণে ছোট একটা ডিপে ছিল, সেইটে জ্বেলে ফেললেন তিনি। জ্বেলেই দেখতে পেলেন, ডানার পাশে কাগজের ঠোঙায় লাল লাল আপেল রয়েছে কয়েকটা।

"ওগুলো এনেছ কেন ?"

"আমার জন্যে রূপচাঁদবাবু এনেছিলেন এগুলো। আমি আপনাকে দেবার ছুতো ক'রে পালিয়ে এসেছি তাঁর কাছ থেকে"

সন্ন্যাসী আবার গিয়ে বসলেন। হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। ডানার দিকে চেয়ে বললেন, "ভয় পেয়ে পালিয়ে আসার মধ্যে কোনও মহত্ত্ব নেই কিন্তু"

"পাপকেও ভয় করব না ?"

"ভয় করবে কেন ? জয় করবে। পালিয়ে এলে তো তার কাছেই নতি-স্বীকার করা হ'ল"

"আপনি নিজেও কি পলাতক নন ? সংসার থেকে আপনিও তো পালিয়ে এসেছেন"

কথাগুলো ব'লেই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল ডানা। সন্ন্যাসীকে কটু কথা বলতে সে আসে নি। আহত আত্মসম্মানের জ্বালায় কথাগুলো বেরিয়ে পড়ল মুখ দিয়ে। সন্ন্যাসীর উত্তর শুনে কিন্তু আরও অপ্রতিভ হ'ল সে।

"আমি যে খুব একটা মহৎ ব্যক্তি—একথা তো তোমাকে বলি নি কোনদিন। আমিও তোমারই মত দুর্বল। ঠিকই ধরেছ তুমি, আমিও পলাতক। কিন্তু অনেকদিন থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছি কিনা,

তাই কথাটা ভাল ক'রে বুঝেছি যে, পালিয়ে কোনও লাভ হয় না। কারণ, ভয়ের হেতু বাইরে কোথাও নেই, আছে আমাদেরই ভিতরে, আমাদেরই বোঝবার ভুলে। পাপ বা পুণ্য, ভীষণ বা সুন্দর, ভাল বা মন্দ আমাদের নিজেদেরই অজ্ঞতার সৃষ্টি। সংস্কারবশে আমরা নিজেরাই নানা রঙে রঙিন ক'রে দেখি সব জিনিসকে। আলকাতরা মাখিয়ে কাউকে করি কালো, আবার কুঙ্কুম মাখিয়ে কাউকে করি লাল। আবার নিজের সৃষ্টি কালোকে দেখে নিজেরাই শিউরে উঠি, লালকে দেখে নিজেরাই মুগ্ধ হই। আসলে কেউ লালও নয়, কেউ কালোও নয়—"

ডানা হেসে বললে, "আসলে কে যে কি, তা জানি না। কিন্তু রূপচাঁদবাবুর উদ্দেশ্যটা এত স্পষ্ট মনে হ'ল যে—"

সন্ন্যাসী হেসে প্রশ্ন করলেন, "মনে হ'ল, তার কারণ, রূপচাঁদের উদ্দেশ্য তোমার মনকে প্রভাবিত করেছে। শুধু প্রভাবিত করে নি, আতঙ্কিতও করেছে। আতঙ্ক আকাঙ্ক্ষারই আর একটা রূপ। যে লালসা রূপচাঁদবাবুর মনে জেগেছে, তা তোমার মনেও সাড়া তুলেছে। কিন্তু যেহেতু তোমার সংস্কারের সঙ্গে এই সাড়ার বিরোধ আছে, তাই তুমি ভয় পেয়েছ, মিল থাকলে খুশি হতে। ভয় না পেয়ে খুশি হ'লেও খুব যে বেশি একটা অপরাধ হ'ত, তা মনে করি না। ভয়, খুশি—দুইই মনের বিকার। ভয় পেয়ে তুমি বরং রূপচাঁদবাবুকে আরও বেশি প্রশ্রয় দিয়েছ"

কথাগুলো শুনে ডানা বিস্মিত হ'ল।

"আমার তা হ'লে রূপচাঁদবাবুর কাছে থাকাই উচিত ছিল বলছেন?"

"যা বললাম তত্ত্ব হিসাবে সেটা সত্যিই যদি উপলব্ধি করতে, তা হ'লে নিজেই বুঝতে পারতে সেটা, কারও উপদেশের দরকার হ'ত না। এই আপেলগুলোতে দাঁত বসিয়ে যখন রসাস্বাদন কর কিংবা কোনও তৃষিতকে জলদান ক'রে যখন তৃপ্তি লাভ কর, তখন যেমন

দ্বিধা বা সঙ্কোচ হয় না, এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা তেমনই সহজভাবে নিতে পারতে। নির্বিকার নও ব'লেই গোল বেধেছে। সংস্কারের তুলো দিয়ে কান বন্ধ করেছ ব'লেই মহাসঙ্গীতের ঐক্যতান শুনতে পাচ্ছ না। অসম্পূর্ণ শোনার ফলে বেসুরো লাগছে, কোনটা খারাপ কোনটা ভাল মনে হচ্ছে—"

"কাম ক্রোধ কি খারাপ নয় তা হ'লে?"—সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে ডানা।

"আগেই তো বললাম, নির্বিকার চিত্তে খারাপ ভাল কিছু নেই। আর একটা কথাও মনে রাখা উচিত। সকলেই আনন্দ চায়, নানা ভাবে সবাই সেটা পেতে চাইছে। সাধারণ লোকের বাইরের জীবনটাকে যদি বাঁশী বলি, তা হ'লে কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতিকে সেই বাঁশীর ছিদ্র বলা যেতে পারে। অধিকাংশ লোকই আনন্দ পাবার আশাতেই নানা সুর আলাপ করছে ওতে। সাধারণ বাঁশীতে গোটা কয়েক মাত্র ছিদ্র থাকে, মহাজীবনের বাঁশীতে কিন্তু অসংখ্য ছিদ্র, অসংখ্য রাগরাগিণীর আলাপ চলে তাতে। চলছেও। ওর কোনটাকে ভাল, কোনটাকে মন্দ বলার অর্থ হয় না। নিজেদের রুচিভেদে সাধনভেদে আমরা ভাল খারাপ ভাগ ক'রে নিয়েছি কেবল। আসলে ভাল খারাপ কিছু নেই"

"শাস্ত্রে কিন্তু কাম ক্রোধ প্রভৃতিকে রিপু বলেছে। নিশ্চয়ই এর কারণ আছে একটা"

ডানার বিস্ময় কেটে গিয়েছিল ব'লেই হোক কিংবা বিস্ময়ের সংঘাতে হোক, তর্ক করবার প্রবৃত্তিটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সহসা।

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, "শাস্ত্রও সংস্কার-মুগ্ধ মানুষেরই তৈরি। সংস্কারের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রও বদলেছে যুগে যুগে। তা ছাড়া ওদের রিপু বলবার কারণ একটা আছে বইকি। তুমি গান-বাজনা করেছ কখনও?"

"কিছু কিছু করেছি। সেতার বাজিয়েছিলাম কিছুদিন"

"গানের উপমা দিয়েই বলি তা হ'লে। ওড়ব জাতীয় বৃন্দাবনী সারঙ্গে গান্ধার এবং ধৈবত লাগে না। গান্ধার এবং ধৈবত বৃন্দাবনী সারঙ্গের পক্ষে রিপু। তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনার পথে কাম-ক্রোধেরাও রিপু"

ডানা হেসে বললে, "আধ্যাত্মিক উন্নতিই তো মানব-জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত"

"তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার পথও অনেক এবং অনেক সময় পরস্পর-বিরোধীও। শুনেছি, সহজিয়া মতে পঞ্চকাম উপভোগই সাধনার পথ। কাম উপভোগ ক'রে ক'রেই তাঁরা নিষ্কাম হতে চান"

"কি রকম ?"

"তাঁরা বলেন যে, আসক্তি আমাদের বদ্ধ করে, তা-ই আমাদের আবার মুক্তিও দেয়। তাঁদের কথা, 'রাগেণ বধ্যতে লোকে রাগেণৈব বিমুচ্যতে'। রবীন্দ্রনাথও তো বলেছেন, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'। বন্ধন মানেই—বাসনার বন্ধন। সুতরাং বাসনা-কামনা খুব অবহেলার জিনিস নয়। সবই নির্ভর করছে তোমার মনের উপর, তোমার চাওয়ার আন্তরিকতার উপর"

সন্ন্যাসী চুপ করলেন। গভীর নীরবতা ঘনিয়ে এল একটা। ডানা নতমুখে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ব'সে রইল। ধীরে ধীরে তারপর তার মনে যে প্রশ্নটা জাগল তা এতই অদ্ভুত যে, কথায় সেটা প্রকাশ করা উচিত কি না তা ঠিক করতেই আরও খানিকক্ষণ গেল। প্রকাশ করাই ঠিক করলে সে শেষ পর্যন্ত। তার কৌতূহলী নারীপ্রকৃতি এই সন্ন্যাসীটিকে যাচিয়ে নেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চকিতে একবার চেয়ে মৃদু হেসে বললে, "মনে করুন, আন্তরিকভাবে আপনাকেই যদি চাই, পাব ?"

সন্ন্যাসী শান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "এত ছোট জিনিস চাইবে তুমি ?"

"আমার কাছে তো আপনি ছোট নন"

সন্ন্যাসী স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইলেন।

"বলুন, পাব ?"

"তা আমি কি ক'রে বলব ? তোমার আন্তরিকতার উপর নির্ভর করবে তা। পেলে কি না তাও নিজেই বুঝতে পারবে"

"আন্তরিকতার পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হই, তা হ'লে সম্পূর্ণরূপে পাব তো ?"

"পাবে ব'লেই তো মনে হয়"

"আপনার দেহটাকে যদি ভোগের সামগ্রী ক'রে তুলি, তা হ'লেও আপনি আপত্তি করবেন না ?"

"সম্পূর্ণরূপে আমাকে যদি পাও, তা হ'লে আমার এই ভঙ্গুর দেহটা তুচ্ছ হয়ে যাবে তোমার কাছে। আর এই তুচ্ছ জিনিসটা নিয়ে যদি তুমি উন্মত্ত হতে চাও ক্ষণিকের আনন্দে, তা হ'লেও আমি আপত্তি করব না, এখনই আমার ওই গায়ের কাপড়টা নিয়ে যদি গায়ে জড়াতে চাও তা'তেও যেন আপত্তি করব না"

সন্ন্যাসী হাসতেই ডানাও হেসে উঠল। বেশ একটু জোরেই হেসে উঠল। মেঘটা কেটে গেল।

"তর্ক ক'রে আপনার সঙ্গে পারবার জো নেই দেখছি। বাজে কথা থাক্, আপনার মতটা কি, তাই বলুন ?"

"সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবে তো ?"

"নিশ্চয়"

"আমি কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি নি। আমি সন্ধান ক'রে বেড়াচ্ছি শুধু"

"কি সন্ধান করছেন ?"

"উপলব্ধিকে। আমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছি—আমি

কে, এই বাইরের জগৎটা স্বপ্ন কি না, এই স্বপ্ন-জগতের ভালমন্দ পাপপুণ্য স্বপ্নেরই মত অলীক কি না?”

“সত্যিই যদি সে উপলব্ধি হয় আপনার, তাতে লাভটা কি হবে?”

“পরমানন্দ। যেসব সুখ দুঃখ প্রতি মুহূর্তে কম্পিত করছে মনকে, হঠাৎ যদি উপলব্ধি করি সেসব অলীক, তা হ'লেই তো দুঃস্বপ্নটা ভেঙে যাবে, মুক্তি পাব”

সন্ন্যাসী চুপ করলেন। ডানাও চুপ ক'রে রইল। শেষরাত্রির আলো-আঁধারিতে আবার একটা নিবিড় নীরবতা ঘনিয়ে এল কিছু-ক্ষণের জন্য। ডানাই কথা বললে একটু পরে।

“আপনি যে পথের পথিক, সে পথের নিয়ম কি? সে পথে কামিনী কাঞ্চন ত্যাজ্য, না, পূজ্য?”

“বিষবৎ ত্যাজ্য। একাগ্র ধ্যানই হচ্ছে আমার পথ। সংযমের পথ থেকে একচুল বিচলিত হ'লেই আমার পতন। তাই সংসার থেকে আমি পলাতক। দুর্বল ব'লেই পলাতক। রাজর্ষি জনকের মত মনের জোর আমার নেই”

একটা ম্লান হাসি ছড়িয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর চোখে মুখে। ডানা মুচকি হেসে বললে, “তা হ'লে কোন্ ভরসায় এখনই বলছিলেন যে, আমি যদি চাই আপনি ধরা দেবেন?”

“তোমার অজ্ঞতার ভরসায়। আন্তরিকভাবে চাওয়া যে কাকে বলে, তা তোমার জানা নেই ব'লেই অত সহজে কথাগুলো বলতে পেরেছিলে। কায়মনোবাক্যে চাওয়াটা নিতান্ত সহজ নয়”

ডানা স্মিতমুখে চুপ ক'রে রইল। তারপর বললে, “আমি এখন কোন্ পথে যাব, তাই ব'লে দিন”

“সেটা তোমাকে নিজেই খুঁজে বার করতে হবে। আমার বিশ্বাস, কেউ তা কাউকে ব'লে দিতে পারে না। অন্তত আমি পারব না”

"আধ্যাত্মিক পথের কথা বলছি না, রূপচাঁদবাবুর হাত থেকে কি ক'রে পরিত্রাণ পাই, বলুন ?"

"তার উপায়ও তোমাকেই বার করতে হবে। একটি কথা শুধু বলতে পারি—পালিয়ে যাওয়া তার উপায় নয়। রূপচাঁদ জাতীয় লোকদের অভাব নেই পৃথিবীতে। এক রূপচাঁদের কবল থেকে পালিয়ে গেলেও আর এক রূপচাঁদের কবলে পড়তে হবে। নিজের চরিত্রকে নিজের মনকে বর্মাবৃত করা ছাড়া উপায় নেই, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি"

"আমার চরিত্রে বা মনে কোনও দুর্বলতা নেই। কিন্তু ধরুন, তিনি যদি জোর ক'রে আমার গায়ে হাত দেন, কিংবা—"

"তাতেও কিছু এসে যায় না, তোমার মন যদি ঠিক থাকে"

"খুব এসে যায়, আপনি পুরুষমানুষ তাই বুঝতে পারছেন না। পরপুরুষের অবাঞ্ছিত স্পর্শের চেয়ে গ্লানিকর আর কিছু নেই আমাদের জীবনে"

"তা জানি। কিন্তু এও জানি, ওর প্রতিকার তোমারই হাতে"

"আমার যদি প্রচুর অর্থ থাকত, তা হ'লে আমি প্রতিকার করতে পারতাম। এমন একদিন ছিল, যখন বন্দুকধারী দরোয়ান আমাদের গেটে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত। কিন্তু সে সামর্থ্য আমার নেই আপাতত"

"তোমার চাকরটা নেই ?"

"ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। ওই জীর্ণ শীর্ণ ছোঁড়াটা থাকলেও যে কিছু করতে পারত, তা মনে হয় না"

"টাকা পেলেই তোমার সমস্যার সমাধান হবে মনে কর ?"

"তা তো হবেই। কিন্তু অত টাকাই বা পাই কোথায় বলুন ? আমি বলছিলাম, আপনি যে কদিন এখানে আছেন, আমার বাড়ির একটা ঘরে গিয়ে যদি থাকেন—"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন, "না, তা হয় না।

আমি একা থাকতে চাই। কারও সান্নিধ্য আমার সাধনার পক্ষে অনুকূল নয়”

হঠাৎ একযোগে কলরব ক'রে উঠল পক্ষীকুল। সন্ন্যাসী দ্বারের দিকে ফিরে দেখলেন, পূর্বাকাশ লাল হয়ে উঠেছে।

“সকাল হয়ে গেল নাকি ?”—ডানা সবিস্ময়ে বললে।

“হ্যাঁ, এইবার যাও তুমি”

“আপনিও একটু চলুন আমার সঙ্গে”

সন্ন্যাসী হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তার দিকে খানিকক্ষণ।

তারপর বললেন, “বেশ, চল”

বাসায় পৌঁছে ডানা ভিতরে ঢুকে গেল, সন্ন্যাসী বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। ডানা ভিতরে গিয়ে দেখলে, কেউ নেই। বেরিয়ে এসে বললে, “চ'লে গেছেন”

“আমিও যাই তা হ'লে”

সন্ন্যাসী চ'লে গেলেন।

ডানা আবার ঘরে ঢুকল। ঢুকেই রূপচাঁদের ছোট চিঠিটা দেখতে পেলে এবার। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে পড়তে লাগল।

কল্যাণীয়াসু,

ভীতি উৎপাদন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। ভয় পেলে দেখে কিন্তু খুশি হয়েছি। নির্ভয় হওয়ার আগে ভয়ই তো থাকে। চললাম—

আর. সি.

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রেই চেয়ে রইল খানিকক্ষণ কাগজের টুকরোটার দিকে। তারপর কুঁচিকুঁচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলে সেটা।

রূপচাঁদও ভ্রূকুঞ্চিত করেছিলেন মনে মনে। নিজের ব্যর্থতার লজ্জায় তিনি ম'রে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু সে লজ্জাটা স্বীকার করতে চাইছিলেন না নিজের কাছেও। নিজের অক্ষমতা নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধছিল তাঁর। তিনি ভাবছিলেন, ও কিছু নয়, ও রকম হয়েই থাকে, সব ঠিক হয়ে যাবে। নূতন রকম কৌশল করতে হবে আর একটা। যে পাশ্চাত্য শিক্ষার কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন তিনি, যার মূল লক্ষ্য ঐহিক সুখ, সেই সুখলাভের বিবিধ প্রচেষ্টা যে শিক্ষাকে বহুমুখী করেছে, তারই মোহে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি ভাবছিলেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে একটা অহঙ্কৃত ধারণা থাকাতে অন্য রকম কিছু ভাবতে পারছিলেন না। যে স্থূল বাস্তব-বিজ্ঞান-মোহ মদদৃপ্ত করেছিল বিস্‌মার্ক-হিটলারকে, উদ্বুদ্ধ করেছিল নীট্‌শের দর্শন, তা রূপচাঁদকেও যুক্তি যোগাচ্ছিল। ডারবিনের ভক্ত রূপচাঁদও ভাবছিলেন, ছলে বলে কৌশলে জয়লাভ করাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব এবং সে ছল বল কৌশল যথাসময় যথাস্থানে প্রয়োগ করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। নিজের সঙ্গেই তর্ক করছিলেন তিনি। বার বার সেই পুরাতন কথাটাই আবৃত্তি করছিলেন—জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করবার চেষ্টা করাই জীবের একমাত্র ধর্ম। সঙ্কোচ, লজ্জা, দয়া, ক্ষমা, উদারতা, অহিংসা প্রভৃতির স্থান মানবজীবনে নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, ও-গুলো মুখোশ ছাড়া আর কিছু নয়। ও-গুলোও অস্ত্র। বহুরূপী গিরগিটি যেমন প্রয়োজন অনুসারে গায়ের রঙ বদলাতে পারে, অনন্তরূপী মানুষও তেমনই প্রয়োজন অনুসারে মহৎ, লাজুক, পরোপকারী, অহিংস সাজতে পারে। কখনও সে জ্ঞাতসারে সাজে, কখনও অজ্ঞাতসারে। কিন্তু লক্ষ্য ঠিক থাকা চাই। জয়লাভ করাই লক্ষ্য। আধ্যাত্মিকতার ধোঁয়ায় বা কবিত্বের কুয়াশায়

লক্ষ্যটাকেই হারিয়ে ফেলে যারা, তারা ওই সন্ন্যাসীর মত কৃচ্ছ্রসাধন বা আনন্দমোহনের মত কবিতা লিখেই মরে খালি। ওই রোগা সন্ন্যাসী বা পানসে আনন্দমোহনকে ভয় নেই রূপচাঁদের। ওই সন্ন্যাসী যদি বিবেকানন্দের মত পুরুষসিংহ হতেন কিংবা আনন্দমোহন যদি উদ্দাম বায়রন হতেন, তা হ'লে ভয়ের কারণ ছিল। ছন্দের আর ভাবের ফুলঝুরি কাটলে নারীর মন পাওয়া যায় না। রূপচাঁদের ধারণা, ওমরখৈয়াম আর হাফেজ সারাজীবন কেবল প্যানপ্যান ক'রেই মরেছে, সাকীকে পায় নি। নারী আত্মসমর্পণ করে পৌরুষের পদপ্রান্তে—তা তিনি শিবই হোন, বিবেকানন্দই হোন, বায়রনই হোন বা চেঙ্গিস খাঁই হোন। আমি কি? হঠাৎ মনে হ'ল রূপচাঁদের। এই জৈবিক জীবনদর্শনের নিকট তাঁর মূল্য কতটুকু? পৌরুষের কোন্ পরিচয় দিয়ে ডানাকে তিনি মুগ্ধ করবেন? ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। উত্তরটা ঠিক যোগাল না। মনে হতে লাগল, ডানার মনের প্রবণতা যে কোন্ দিকে, তা এখনও আবিষ্কার করতে পারেন নি তিনি ঠিক। অর্থের প্রতি সব নারীরই (নরেরও) স্বাভাবিক লোভ আছে একটা, ডানার কি নেই? হঠাৎ মনে হ'ল, টাকার কুমীর অমরেশটা চ'লে যাওয়াতে সুবিধাই হয়েছে। হয়েছে কি? ডানা ওর সঙ্গে গেল না কেন? টাকার প্রতি লোভ থাকলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। টাকার প্রতি লোভ নেই হয়তো। হয়তো ও ব্যতিক্রম। রূপ চায় হয়তো, হয়তো যশ, কিংবা প্রতিপত্তি, কিংবা—না, ঠিক বোঝা যায় নি এখনও, ঘনিষ্ঠতর পরিচয় না হ'লে বোঝাও যাবে না।···ডানার সুন্দর মুখখানা ধীরে ধীরে ফুটে উঠল মনে। যে রূপের স্বপ্নে তন্ময় হয়ে টিশিয়ান ভেনাসের ছবি এঁকেছিলেন, তাজমহলের কল্পনা করেছিলেন শাহজাহান, কবিতা লিখেছিলেন কালিদাস, যে অজানার আকর্ষণে সমুদ্রে তরী ভাসিয়েছিলেন কলম্বাস, হিমালয় অভিযান করেছিলেন ইয়ং-হাজ্ব্যাণ্ড (Younghusband),

যে রূপ অজস্র ভঙ্গীতে সহস্র লীলায় ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত হচ্ছে প্রকৃতির অরণ্যে-পর্বতে, সমুদ্রে-আকাশে, নদীতে-নির্ঝরে, মরুতে-মরীচিকায়, জীবনের বিচিত্র বিকাশে যে রূপ ছন্দিত স্পন্দিত আনন্দিত, সেই রূপের স্বপ্নে রূপচাঁদও তন্ময় হয়ে গেলেন চার্বাকীয় নিষ্ঠাসহকারে। তাঁর ক্ষুধিত মন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুলোকেই সুধার সন্ধান করতে লাগল। অতীন্দ্রিয় লোকের কথা তিনি শুনেছেন বটে, কিন্তু আস্থা নেই তাঁর অরূপ কোনও কিছুর উপরই, এমন কি অরূপরতনের উপরও না। যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, বোঝা যায় তিনি জানেন, তাই এখনও ধরা হয় নি, ছোঁয়া হয় নি, বোঝা যায় নি। সেইটেকেই আয়ত্তের মধ্যে আনবার তপস্যা করতে হবে আগে। তপস্যা মানে যোগ্যতা অর্জন। হবে কি তা? হতেই হবে। যখন হবে···। বাসনার আকাশে রূপচাঁদের মন পাখা মেলে উড়তে লাগল। পাশে বকুলবালা শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন। ছোট ছেলের মত নাকও ডাকছিল তাঁর। রূপচাঁদ পাশ ফিরতেই তাঁর ঘুমটা ঈষৎ ভেঙে গেল যদিও, কিন্তু রূপচাঁদকে জড়িয়ে ধ'রে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমন্ত পত্নীর বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে অদ্ভুত একটা আরাম অনুভব করলেন রূপচাঁদ। তবু কিন্তু ডানার স্বপ্নেই আবিষ্ট হয়ে রইল তাঁর মন। বস্তুর ক্ষুধাও অল্পে তুষ্ট হয় না, বস্তুজগতেও সে ভূমাকে ধরতে চায় আকাঙ্ক্ষার জাল পেতে।

২০

অমরেশবাবু সস্ত্রীক চ'লে গেছেন। কবি একা নিজের ঘরটিতে ব'সে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ছিলেন। একটু আগেই তিনি একটা পাখির বই প'ড়ে শেষ করেছেন। অমরেশবাবুর সাহচর্যে এসে এবং তাঁর দেওয়া বই প'ড়ে প'ড়ে পক্ষীজগৎ সম্বন্ধে তাঁর একটা অকৃত্রিম কৌতূহল জাগছিল ক্রমশ। ডানাকে দেখে যে

কারণে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন, এই পাখিদের দেখেও অনেকটা সেই কারণে তিনি মুগ্ধ হচ্ছিলেন। ভাষা ভঙ্গী গতির একটা নবতর সৌন্দর্য মুহূর্তে মুহূর্তে তাঁর কবি-সত্তাকে উদ্বুদ্ধ করছিল। রিপ্লে (Repley) এবং সিট্ওয়েল (Sitwell) সাহেবের বই দুটো প'ড়ে কাল সারা রাত তিনি বার্ড অব প্যারাডাইসের স্বপ্ন দেখেছেন। ওদের নামকরণ করেছেন—পরম পাখি। ওদের বিচিত্র রূপ, ওদের অদ্ভুত গান, ওদের নৃত্যভঙ্গী, বিশেষ ক'রে ওদের বাসা, বাসার সামনে পরিচ্ছন্ন ছোট উঠোন এবং সেই উঠোনকে ফুল-ফল-পাথর দিয়ে সাজাবার প্রবৃত্তি ওদের যেন ভিন্ন পর্যায়ে নিয়ে গেছে। ওরা যেন ঠিক পাখি নয়, পক্ষীরূপী কোনও শিল্পী-সম্প্রদায়। মনুষ্য-রূপী পশু থাকা যদি সম্ভব হতে পারে, এই বা অসম্ভব হবে কেন? বইটা মুড়ে রেখে স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি ব'সে ব'সে। নিউগিনিতে ঘন ঝোপে কষ্ট ক'রে তিনিও যেন পরম পক্ষী-দম্পতীর নাচ দেখছিলেন রিপ্লে সাহেবের সঙ্গে ব'সে ব'সে। পুরুষ পাখিটির সমস্ত গা কালো মখমলে মোড়া, মাথার উপর ছোট ত্রিভুজাকৃতি রৌপ্য-ধবল তিলক একটি। সেই তিলকের পিছন থেকে সরু সরু লম্বা তারের মত কয়েকটা চুল চ'লে গেছে পিঠের দিকে। প্রত্যেকটি চুলের আগায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পালকে তৈরি থুপনি ঝুলছে। বুকের উপর ছোট্ট একটি ঢাল বাঁধা আছে যেন। সূর্যালোকে তার থেকে কখনও সবুজ, কখনও তাম্রাভ রঙ ছিটকে পড়ছে। দুলে দুলে নাচছে,—ঠিক যেন মানুষ। তন্ময় হয়ে ব'সে রইলেন কবি। অনেক কাজ আছে তাঁর, তবু ব'সে রইলেন। অমরেশবাবুর পাখীগুলোর তদারক করতে হবে, ডানার কাছে যেতে হবে একবার, মন্দাকিনীর চিঠির জবাব দিতে হবে। বিয়ে-বাড়িতে কি আয়োজন হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারে কি রকম যে নাকাল হতে হচ্ছে, তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে দীর্ঘ পত্র লিখেছেন মন্দাকিনী। আনন্দনাড়ুর জন্য নারকেলই পাওয়া যাচ্ছিল না, অনেক কষ্টে অগ্নিমূল্য দিয়ে নাকি যোগাড়

হয়েছে। কলকাতা থেকে যে সব নতুন কাপড় এসেছে তার পাড়গুলো মোটেই ভাল নয়, খোকনের জামার ছিট মোটেই পছন্দ হয় নি অথচ দাম নিয়েছে একটি গাদা, কন্যাপক্ষ নমস্কারী নিয়ে নানা বায়নাক্কা তুলেছে নাকি—এই রকম বহু খবর দিয়েছেন মন্দাকিনী। আনন্দবাবু এবং সুন্দরীর সম্বন্ধে যে তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন, সে কথাও বার বার জানিয়েছেন। উভয়ের সম্বন্ধেই বিস্তৃত বিবরণও চেয়েছেন অবিলম্বে। সুন্দরীকে রোজ চরাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না, তার গোবরের যে পাতলা ভাবটা ছিল সেটা গেছে কি না, মৈথিল ঠাকুরটা রান্নাবান্না কেমন করছে, আনন্দবাবুর সর্দি-টর্দি আর হয়েছে কি না—এমনই নানা প্রশ্ন করেছেন মন্দাকিনী। মন্দাকিনীকে একটা উত্তর দিতে হবে, আজই দেওয়া উচিত, মনে হচ্ছিল কবির। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছিল না তাঁর। ঘন নীল আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতেই ভাল লাগছিল। দূরে কয়েকটা গাছ দেখা যাচ্ছে, গাছে ফুলও ধরেছে। নীল আকাশের পটভূমিকায় খানিকটা সবুজ, খানিকটা হলদে, সকালের রোদ এসে পড়েছে তাদের উপর, এবং সমস্তটার উপর ফুটে উঠেছে পরম পাখির স্বপ্নটা। এমন একটা সুন্দর পরিবেশ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল না কিছুতেই। এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল। বুলবুলির সাড়া পাওয়া গেল। বাগানে ঝোপের মধ্যে টুর টুর টুরু টুরু কুড়ুক কুড়ু শব্দ পেয়েই কবি বুঝলেন, বুলবুলি এসেছে। কদিন থেকেই আসছে ওরা ওই ঝোপটায়। ওদের নিয়ে কবিতা লেখবারও চেষ্টা করেছিলেন, কবিতা কিন্তু শেষ হয় নি। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে খাতাটা তুলে নিলেন।

ওরে, তোরা চুপ কর্
খোকা বুঝি হেসেছে
বাতাসেতে ফুট তুলে
কার সুর ভেসেছে

ও মা, না তো, আতাবনে
বুলবুলি এসেছে
টুরু টুরু টুরকি টুরু টুরু টুরকি
আতাবন রাতারাতি হ'ল মধুপুর কি !

পছন্দ হয় নি কেটে দিয়ে আর একটা শুরু করেছিলেন ভিন্ন ছন্দে।

ওই শোন্ ওই শোন্
টুরু টুরু টর
বুলবুলি এসেছে রে
ওরে চুপ কর্
ফোটে যেন খই
কই কই কই
ওই যে বসল উড়ে
বেড়াটার পর।
সারা মন ওঠে নেচে
শুনে গান তোর
ভুলে যাই দুষ্টু রে
তুই ধান-চোর
ওরে চঞ্চল
বল্ বল্ বল্
কোন্ ঝোপটির মাঝে
বেঁধেছিস ঘর !

এটাও পছন্দ হয় নি, এটাও কেটে দিয়েছেন। খাতাটা টেবিলে রেখে দিয়ে আবার তিনি চাইলেন বাইরের দিকে। ওই যে বেরিয়েছে বুলবুলি ছুটো। আমের ডালে উড়ে বসল। বাঃ, চমৎকার

জায়গাটি বেছে নিয়েছে তো! উপরে-নীচে আশে-পাশে গোছা গোছা আমের মুকুল দুলছে, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে কর্ণিকার পুষ্পের স্বর্ণকান্তি, রোদও এসে পড়েছে এক ফালি, চমৎকার লাগছে দেখতে। পরমুহূর্তেই কিন্তু উড়ে গেল বুলবুলিরা। বসল গিয়ে ভাঙা কার্নিসটার ধারে। শ্যাওলা-পড়া বিশ্রী জায়গাটা। কিন্তু ওখানেও ওদের উৎসাহ উপচে পড়ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে। একজন আবার ফুড়ুৎ ক'রে আর একটু উপরে উঠে বসল ল্যাজটি ঘুরিয়ে। ল্যাজের তলার টুকটুকে লাল অংশটুকু দেখা গেল ক্ষণিকের জন্য, তৎক্ষণাৎ ঘুরে বসল আবার। উড়ে গেল। উড়তে উড়তেও যেন লাফাচ্ছে। হঠাৎ যেন নূতন দৃষ্টি খুলে গেল কবির। ওদের তুলনায় নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল। তাঁর যে এই জানলার ধারটা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না, মনোমত পরিবেশকে আঁকড়ে থাকবার এই যে লুব্ধ প্রবৃত্তি, এটা—এই স্থাণুতাটা যেন মৃত্যুরই নামান্তর মনে হ'ল তাঁর। প্রাণের ধর্ম গতি। সে চলবে, থামবে না। মনে হওয়ামাত্রই উঠে পড়লেন তিনি। ডানার কাছে যেতে হবে। ডানার কাছ থেকে ফিরে এসেই চিঠি লিখতে হবে মন্দাকিনীকে। সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। তাড়াতাড়ি উঠে কাপড় ছাড়তে লাগলেন। কাপড়টা ছেড়েই হঠাৎ কিন্তু আবার টেবিলে এসে বসলেন। তাঁর মনে হ'ল, বুলবুলির কাছে ঋণ-স্বীকার না করলে অধর্ম হবে সেটা। চোখ বুঝে ব'সে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর লিখলেন—

আমার মনের ভুলগুলি
শুধরে দিলে বুলবুলি।
আটকে থাকা নয় কিছু
চললে পরেই হয় কিছু
হয় উঁচু বা নয় নীচু
কোথাও গিয়ে ঠেক্ না রে—

ছাড়তে হবে ঘুলঘুলি
শিখিয়ে দিলে বুলবুলি
পায়ের দড়ি পাকাস কে
পথের দিকে তাকাসে কে
চাইতে হবে আকাশকে
ডানা মেলেই দেখ্ না রে।

কবিতাটা লিখেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন আবার। কবিতাটা কোটের পকেটে পুরে নিলেন। তারপর আলোয়ানটা টেনে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে গেলেন, যেন ট্রেন ধরতে যাচ্ছেন। পথে যেতে যেতে আর একটা অদ্ভুত কথাও মনে হ'ল। মনে হ'ল, যে সুষমা ডানার অঙ্গে নেমেছে, তাও হয়তো পাখির মতই একটা কিছু, একটু পরেই উড়ে যাবে। উড়ে গিয়ে বসবে হয়তো কোন কার্নিসের উপর, তারপরে উড়ে যাবে হয়তো আকাশে, নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় লোকে গিয়ে বসবে হয়তো ক্ষণকালের জন্য, তারপর আবার···। কল্পনার আকাশে ডানা মেলে উড়তে লাগল তাঁর মন।

কিছুদূর গিয়ে দেখা হ'ল মল্লিক মশাইয়ের সঙ্গে। মল্লিকের চেহারাটা কেমন যেন মনে হ'ল। মুখ শুষ্ক, চুল এলোমেলো। চোখের দৃষ্টিও কেমন স্বাভাবিক নয়। কবিকে দেখতে পেয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। বললেন, "ওঁদের কি কোনও চিঠিপত্র পেয়েছেন আপনি ?"

"না, পাই নি তো! অমরবাবু গিয়েই একটা চিঠি লিখবেন বলেছিলেন দোয়েল পাখির বিষয়ে। আপনি পেয়েছেন নাকি কিছু ?"

"আমি পেয়েছি। কাণ্ড দেখুন!"

মল্লিক মশাই পকেট থেকে একটি রেজিস্ট্রি-করা খাম বার ক'রে দিলেন। কবি খাম থেকে চিঠি বার ক'রে দেখলেন, রত্নপ্রভার চিঠি। গোটা গোটা গোল অক্ষরে রত্নপ্রভা লিখেছেন—

সবিনয় নিবেদন,

আপনি আনন্দমোহনবাবুকে সমস্ত হিসাবপত্র বুঝাইয়া দিয়া আপিস-ঘরের চাবিটি দিয়া দিবেন। আমরা তাঁহাকেই হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার হইবার জন্য অনুরোধ করিব। আপনার ছয় মাসের বেতন অদ্য মনি-অর্ডার যোগে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলাম। টাকাটি পাইলে আনন্দমোহনবাবুকেই একটা রসিদ দিয়া দিবেন। নমস্কার। ইতি

শ্রীরত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে রইলেন কবি খানিকক্ষণ। বেশ একটু বিব্রত বোধ করছিলেন তিনি। চিঠিটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে মাথা চুলকে বললেন, "আমি তো কিছু জানি না। ব্যাপারটা কি বলুন তো ?"

যদিও ব্যাপারটা কি এবং কেন তাঁকে তাড়ানো হ'ল মল্লিক মশাই সম্পূর্ণই বুঝেছিলেন, তবু তিনি বললেন, "কি জানি! খেয়াল আর কি! স্ত্রীবুদ্ধিও বলতে পারেন। যাক, ভালই হ'ল, আমি বাঁচলুম। এ বয়সে ওসব ঝামেলা আর পোষায়ও না। আপনি তা হ'লে কবে সব বুঝে নিচ্ছেন বলুন ?"

"আমি! আমি কোনও চিঠি পাই নি। তা ছাড়া আমিই কি পারব ওসব ?"

"সে আপনি ওঁর সঙ্গে বোঝাপড়া করুন গিয়ে। আমাকে খালাস ক'রে দিন। আমি কালই আপনাকে চাবি-টাবি দিয়ে দেব। এখন চলি"

কোনও উত্তরের অপেক্ষা না রেখে মল্লিক মশাই হনহন ক'রে চ'লে গেলেন এবং দেখতে দেখতে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কবি। নিজেকে অকস্মাৎ একটা নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে আবিষ্কার ক'রে কৌতুকও জাগল একটু মনে। তিনি হবেন হরিপুরা কাছারির ম্যানেজার! অদ্ভুত কাণ্ড!

কবি ডানার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে যখন পৌঁছলেন, ডানা তখন স্নান সেরে চুল শুখচ্ছিল রোদের দিকে পিঠ ক'রে। কবি দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হ'ল, আলোকের শিখর থেকে অন্ধকারের একটা প্রপাত নামছে যেন! ডানা তাঁর পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল, সম্বৃত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কবি এগিয়ে এসে হেসে বললেন, "বাঃ, চমৎকার!"

"কি চমৎকার?"

"তোমার চুলের শোভা। অনেক দিন এমন শোভা দেখি নি"

ডানা কোনও উত্তর না দিয়ে মাথার কাপড় একটু টেনে ঘরে ঢুকে গেল। একখানা চিঠি হাতে ক'রে বেরিয়ে এল একটু পরে।

"মিসেস সেনগুপ্ত একটা চিঠি লিখেছেন, পড়ে দেখুন"

কবি দেখলেন, এটিও রেজিস্ট্রি চিঠি। খুলে পড়লেন—

সুচরিতাসু,

বিশেষ প্রয়োজনে এই পত্র লিখিতেছি। স্থির করিয়াছি, মল্লিক মহাশয়কে হরিপুরার ম্যানেজারি-পদ হইতে অব্যাহতি দিব। আনন্দবাবু যদি এই কার্যের ভার লইতে সম্মত হন, আমরা নিশ্চিন্ত হই। তাঁহাকে বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না, কর্মচারীরাই সমস্ত করিবে। তিনি কেবল একটু নজর রাখিবেন। তাঁহার মত একজন সচ্চরিত্র অভিজ্ঞ বিদ্বান লোক যদি একটু লক্ষ্য রাখেন, তাহাতেই যথেষ্ট কাজ হইবে। তাঁহাকে বেতন হিসাবে কিছু দিবার স্পর্ধা আমাদের নাই, প্রণামীস্বরূপ যদি কিছু গ্রহণ করেন আমরা কৃতার্থ হইব। তুমি ভাই আমার হইয়া একটু অনুরোধ করিও। তিনি যদি বরাবর কাজ করিতে রাজী না-ও হন, তাহা হইলে আমরা যত দিন না ফিরি তত দিন অন্তত যেন কাজটা চালাইয়া দেন, কারণ আমরা মল্লিক মহাশয়কে জবাব দিয়াছি। তিনি অবিলম্বে যেন মল্লিক মহাশয়ের নিকট হইতে চাবি এবং হিসাবপত্র বুঝিয়া লন। আর বেশি কিছু লিখিবার নাই। উনি তোমাকে

যে সব কাজ দিয়া আসিয়াছেন, সেগুলি ভালভাবে করিও। টাকার প্রয়োজন হইলে সদর-নায়েব জগৎবাবুর কাছে চিঠি লিখিয়া পাঠাইবে। তাঁহাকে এই মর্মে লিখিত উপদেশ দিয়া আসিয়াছি। টাকা লইয়া তাঁহাকে একটা রসিদ দিয়া দিও। আশা করি, ভাল আছ। ভালবাসা লও। আনন্দবাবুকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইবে। ইতি

শ্রীরত্নপ্রভা সেনগুপ্ত

চিঠিটা প'ড়ে কবি বললেন, "এ মহা মুশকিল হ'ল দেখছি"

"মুশকিল আর কি!"—মুচকি হেসে ডানা বললে—"একটু-আধটু দেখাশোনা করবেন"

"কিন্তু তাও কি পারব? আমি কবি, বৈষয়িক তো নই—"

"খুব পারবেন"

"তুমি বলছ পারব?"

"না পারবার কি আছে এতে?"—ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে একটু যেন ধমকের সুরেই বললে ডানা।

"বেশ। তা হ'লে তাই হোক। চেষ্টা করা যাক। তোমার চাকরটা আছে কি?"

"না। কেন?"

"একটু চা খেতুম"

"আমিই ক'রে দিচ্ছি"

"একটা খাতা দিয়ে যাও। কবিতা লিখি ততক্ষণ একটা"

একটা খাতা দিয়ে ডানা ভিতরের দিকে চ'লে গেল। স্টোভে তেল ছিল না। উনুন ধরাতে হ'ল। খানিকক্ষণ পরে চায়ের পেয়ালা নিয়ে এসে ডানা দেখলে, কবি কবিতা লেখা শেষ করেছেন।

"নিন"

"কবিতাটা আগে শোন"

পড়ুন। চা কিন্তু ঠাণ্ডা হয়ে যাবে”

“যাক। তুমি পেয়ালাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ব'স ভাল ক'রে”

ডানা বসতেই কবি শুরু করলেন—

অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

শ্রীকৃষ্ণের বংশী যেন কালিন্দী-তরঙ্গ-দলে তোলে শিহরণ,
আলোকের শুভ্র বৃন্তে ফুটিল কি তমস্কান্তি কৃষ্ণ শতদল,
প্রত্যক্ষ জীবন আর পরোক্ষ মরণ—
কাজল নয়ন মাঝে হাসি অশ্রু করে টলমল,
শিব-সুন্দরের বক্ষে নৃত্যপরা কালীর চরণ,
ময়ূর-মানস-পটে নবোদিত মেঘের বরণ,
অমিত অসিত কাব্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিকুর উচ্ছল
কবিচিত্ত করিল হরণ।

অয়ি, সখি, অনবদ্যা চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

আসন্ন-নগ্নতা ভীতা অসম্বৃতা কৃষ্ণা যেন কৌরব-অঙ্গনে,
শুক-কলরব-মুগ্ধা মধুমত্তা মাতঙ্গিনী বল্লকী-মোদিতা
সহসা চকিতা যেন দৈত্য-আগমনে ;
অন্তলোকে ধ্যানলগ্না ওজস্বিনী আঁধার কবিতা
সংযম-প্রস্তর ভেদি, সমুচ্ছ্রিতা শত প্রস্রবণে
খুঁজিল প্রকাশ যেন শব্দহীন বিরাট গর্জনে,
বিমুগ্ধ বিমূঢ়া ক্ষুব্ধা অকুণ্ঠিতা মত্তা প্রলোভিতা
কে ছুটেছে আত্ম-বিসর্জনে।

অয়ি, সখি, অনবদ্য চিকুর-ধারিণি,
তোমারে নেহারি আজি কল্পনা যে স্বতোৎসারিণী।

"বুঝতে পারলাম না ভাল"—মুচকি হেসে ডানা বললে—"বড় কটমট হয়েছে। বিষয়টা কি ?"

কবি হেসে উত্তর দিলেন, "অমিত অসিত কাব্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিকুর উচ্ছল ! তুমি সংস্কৃতের ছাত্রী, তোমার কানেও কটমট লাগল ?"

লাল হয়ে উঠল ডানার কানের পাশটা। সে বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু ভান করছিল না-বুঝতে পারার।

"কি যে বাড়াবাড়ি করেন আপনি ! লোকে শুনলে কি বলবে !"

এ ধরনের কথা ডানার মুখে কবি ইতিপূর্বে শোনেন নি। শুনে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, "বাড়াবাড়ি তোমার মনে হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে, কিছু হ'ল না। লোকের কথা ভেবে ভয় পাবার দরকার নেই। এখনই আমি যেলোকে গিয়েছিলাম, সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। এমন কি তুমিও—মানে, তোমার স্থূল দেহটাও—ছিল না সেখানে"

ডানা অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের বই-খাতাগুলো গুছিয়ে গুছিয়ে রাখতে লাগল। কবি চুপ ক'রে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপরে বললেন, "বেশ, তোমার যদি আপত্তি থাকে, তোমাকে কবিতা আর দেখাব না"

"না না, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। এমনই বলছিলাম"—হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে হেসে বললে ডানা।

"আপনি আমার বাবার বয়সী, আপনি যদি আমার সম্বন্ধে দু-একটা কবিতা লেখেনই, তাতে মনে করবার কি আছে! কিন্তু সখী বলেছেন কেন, বুঝলাম না"

কবি হেসে ফেললেন।

"তুমি যদি সত্যি সত্যি আমার মেয়ে হতে, তা হ'লেও তোমার

এলোচুল নিয়ে কবিতা লেখবার সময় তোমাকে সখী সম্বোধন করতুম। কাব্যলোকে বয়সের হিসাবটা সামাজিক মাপকাঠি দিয়ে হয় না। স্থূল বস্তুজগতের কোন মাপকাঠিরই দাম নেই সেখানে। কাব্য-বৃন্দাবনে সবাই সখী। অনেকদিন আগে একটা কবিতা লিখেছিলাম তার সবটা মনে নেই, প্রথম চার লাইন হচ্ছে—

সন্ধ্যার মেঘে যে স্বর্ণ লাগে
স্যাকরা তাহার বোঝে না মর্ম
কুসুমে কুসুমে যে বর্ণ জাগে
রঙ-রেজ তার জানে না ধর্ম।

একটু আগে বুলবুলিকে দেখে যে কারণে কবিতা লিখছিলাম, তোমার কালো চুলের রাশি দেখেও ঠিক সেই কারণেই কবিতা লিখেছি। বুলবুলিও নয়, কালো চুলের রাশিও নয়, ওদের অবলম্বন ক'রে মনের ভিতর কে যেন ছন্দ জাগিয়ে তোলে। ওগুলো বৃন্ত, সেই বৃন্তে ফুল হয়ে ফোটে কি একটা যেন। কবির লক্ষ্য বৃন্তও নয়, ফুলও নয়, সেই কি-যেন-কি-টা”

এ কথা শুনে ডানার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এতে তার আত্মসম্মান একটু আহত হ'ল যেন। সে যে কবির কবিতার বিষয় হতে পেরেছে, এতে একটু বিব্রত বোধ করলেও ভিতরে ভিতরে সে খুশি হয়েছিল বইকি। তাকে নয়, তাকে অবলম্বন ক'রে যা কবিমানসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে তাই কবিতার হেতু—এ কথা শুনে একটু মর্মাহতই হয়ে গেল সে। মৃদু হেসে বললে, “তাই নাকি ?”

“নিশ্চয়। আর একটা কথাও শুনে রাখ। যে কবিতা লেখে, সে আমার এই দেহটা নয়। সেও যেন কি-একটা-কি মাঝে মাঝে ভর করে এসে আমার উপর”

ডানার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল আবার। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতে লাগলেন। তাঁর মনে হতে লাগল, ডানার গ্রীবাভঙ্গীতে

যে অপরূপ শ্রী ফুটেছে তা শুধু রক্তমাংসের সমন্বয় নয়, তা যেন কোনও অজ্ঞাত শিল্পীর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, আর কোনও শিল্পীর নবতর সৃষ্টিতে মূর্ত হবার আশায় অপেক্ষা করছে।

২১

বসন্ত শেষ হচ্ছে।

নিজের বাপের বাড়িতে রত্নপ্রভা স্বামীর ঘরে ঢুকে একটা বই খুলে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বহু রকম পাখির বহু রকম ঠোঁটের ছবি। চওড়া, সরু, লম্বা, ছোট, উপরের দিকে বাঁকানো, নীচের দিকে বাঁকানো, চামচের মত, ছাঁকনির মত···বইটা নূতন এসেছে। বেশ মোটা বই। পাতার পর পাতা উলটে যেতে লাগলেন রত্নপ্রভা। কত ছবি, কত লেখা···। খানিকক্ষণ পরে তাঁর মনে হ'ল, গহন অরণ্য। গ্রন্থটা নয়, তাঁর স্বামী। বিশাল বিরাট অরণ্য। প্রতি পদক্ষেপেই নূতন কিছু চোখে পড়ছে। মাঝে মাঝে একটা অজানা ভয়ে গা ছমছম করে। আবার পরিচিত শব্দ শুনে, প্রত্যাশিত দৃশ্য দেখে ভয় কেটে যায়। কত রকমের গাছ-পালা পশু পাখি, কত ধরনের শব্দ গন্ধ রূপ রস, আর এই সমস্তটাকে ঘিরে একটা অজানা রহস্য, কখনও গাম্ভীর্যে অটল, কখনও শিশুর মত সজীব। অজানাটা যদিও জানা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিঃশেষ হতে চাইছে না; মনে হচ্ছে, যেন কত কি আছে আরও। সহসা রত্নপ্রভার সমস্ত চিত্ত পুলকিত হয়ে উঠল। অরণ্যটা যে তাঁর একার, আর কারও নয়—এই অনুভূতি আনন্দিত ক'রে তুলল তাঁর সমস্ত সত্তাকে। একটা নবীন উৎসাহ জাগল তাঁর মনে, হোক জটিল, হোক দুর্গম, তবু সমস্তটা আয়ত্ত করতে হবে তাঁকে। শক্তি সংগ্রহ করতে হবে তা করবার জন্যে।

পাশের ঘরে বৈজ্ঞানিক নানা বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দোয়েল পাখির সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখছিলেন একটা। আনন্দবাবুকে ব'লে এসেছিলেন, কিন্তু লেখবার সময় ক'রে উঠতে পারেন নি এতদিন। দোয়েলরা নিশ্চয়ই ডাকতে শুরু করেছে খুব সেখানে। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলেন একটু। তারপর নিজের ডায়েরি খুলে দেখলেন। দোয়েলের গান তো তিনি শুনেই এসেছেন—প্রথম গান শুনেছিলেন ১০ই ফাল্গুন, এতদিন ধুম লেগে গেছে নিশ্চয়। তন্ময় হয়ে লিখতে লাগলেন আবার। পাশে চা ঠাণ্ডা হচ্ছিল।

কবি কবিতা লিখছিলেন নিজের ঘরটিতে ব'সে। গঙ্গা এবং শান্তনুর পৌরাণিক গল্পটা উদ্দীপ্ত করছিল তাঁর কল্পনাকে। তাঁর মনে হচ্ছিল, গঙ্গাই বুঝি বসন্তের বেশে এসেছিল পৃথিবী-শান্তনুর কাছে। এইবার ছাড়াছাড়ি হচ্ছে।

ফুটিছে ঝরিছে ফুল অরণ্যে উদ্যানে;
গঙ্গা-বাসন্তিকা যেন আপন সন্তানে
ভাসাইছে কাল-স্রোতে লীলায় কৌতুকে।
পৃথিবী-শান্তনু চেয়ে ছিল শুষ্ক মুখে
নিষ্ঠুরা প্রেয়সী পানে।
"আর নয়—না—না"
সহসা ধ্বনিল যেন শান্তনুর মানা
আতঙ্কিত কষ্ঠকণ্ঠে—ক্ষান্ত দাও প্রিয়া।"
"চলিলাম আমি তবে" সুমিষ্ট হাসিয়া
কহিলেন সুরধুনী।
মর্ত্য-পাশ হতে
চ'লে যায় বাসন্তিকা, জাগে নদী-স্রোতে
কল্লোল-ক্রন্দন মৃদু; থাকিয়া থাকিয়া
আর্তকণ্ঠে হাহাকার করিছে পাপিয়া।
শিশু ভীষ্ম প'ড়ে আছে মাতৃহারা হায়
শিশু গ্রীষ্ম জাগিতেছে দিগন্ত-সীমায়।

রূপচাঁদ নদীতীরে একা নিস্তব্ধ হয়ে ব'সে ছিলেন। মল্লিক মশাইয়ের চাকরি যাওয়াতে তিনি নিজে যেন ব্যক্তিগতভাবে আহত হয়েছিলেন। কিন্তু হতাশ হন নি। সীমাহীন সমুদ্রে পথ-হারা হয়ে কলম্বাস হাল ছাড়েন নি, রূপচাঁদও ছাড়েন নি। তিনিও আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চেয়ে ব'সে ছিলেন। পর্যবেক্ষণ করছিলেন বাতাসের গতি। যদিও আশ্বস্ত হবার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু বিশ্বাস ছিল যে যাবেই। স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে ব'সে ছিলেন তিনি।

বকুলবালাও স্বপ্ন দেখছিলেন। চণ্ডীর বন্ধুটি হলদে পাখির বাচ্চা যোগাড় ক'রে দেবে বলেছে। মার্বেল খেলার জন্য ভাল একটা 'চ্যাম্পিয়ন' মার্বেলও এনে দেবে বলেছে চণ্ডী। চণ্ডীর বন্ধু সত্যিই যদি হলদে পাখির বাচ্চা এনে দেয়, কি মজাই যে হবে! এবার আর ছাতু খাওয়াবেন না তিনি। ফড়িং ধরবার ব্যবস্থা করাতে হবে। চণ্ডী ঠিকই বলেছে, বাচ্চা-বেলা থেকে না পুষলে পোষ মানে না পাখি। পাখিদের বাসা বানাবার জন্যে অমরবাবু গাছে গাছে যে সব বাক্স টাঙিয়ে দিয়েছেন, তার একটাতেও কোনও হলদে পাখি বাসা বাঁধতে পারে। কিছুই বলা যায় না।

মন্দাকিনী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন তাঁর ছোট ভাই বিনয়কে নিয়ে। বিনয় সেলুন থেকে চুল ছাঁটিয়ে এসেছিল। তার মাথার দিকে চেয়ে মন্দাকিনী হেসে লুটিয়ে পড়ছিলেন। নন্দরাণীকে ডেকে বলছিলেন, "ওলো নন্দ, বিনুর চুলের বাহার দেখে যা একবার। বিয়ের নামেই এই, বিয়ে হয়ে গেলে না জানি কি করবে ছেলে!"

স্নেহে গ'লে পড়েছিলেন তিনি যেন। যে বিনুকে তিনি এতটুকু

থেকে মানুষ করেছেন, তাকে ঘিরেই রঙিন হয়ে উঠছিল তাঁর স্বপ্ন। তাঁদের বাড়ির পাশের সজনেগাছটায় একটা দোয়েলও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য ছিল না মন্দাকিনীর।

সন্ন্যাসী একা ব'সে ছিলেন নদীর পরপারে বালুস্তূপের উপর। তিনি সহসা যেন নিজেকে ফিরে পেয়ে ভারি তৃপ্তি বোধ করছিলেন। গত কয়েকদিন থেকে একটা কথা কাঁটার মত খচখচ করছিল তাঁর মনের মধ্যে। সেদিন শেষরাত্রে ডানার সঙ্গে তিনি যে সব আলোচনা করেছিলেন, তার প্রকৃত মর্ম ডানা যদি বুঝতে না পেরে থাকে, যদি তাঁর অতি-সরল অভিমতকে ঘোলা দৃষ্টি দিয়ে বিচার ক'রে থাকে, তা হ'লে হয়তো সে তাঁর সম্বন্ধে খারাপ ধারণাই পোষণ করছে। এই চিন্তাটা পীড়িত করছিল তাঁর মনকে। কিন্তু এখনই একটু আগে দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি যেন উপলব্ধি করলেন যে, কে তাঁর সম্বন্ধে কি মনে করছে—এ নিয়ে মাথা ঘামানোর অর্থ নিজেকে তিনি চেনেন নি এখনও। তিনি যে কি এবং কে, তার নির্ভুল প্রমাণ তো তাঁর নিজের চেতনার মধ্যেই রয়েছে। অপরের সমর্থন বা প্রতিবাদে তার মূল্য তো এতটুকু পরিবর্তিত হবে না। সুতরাং ডানা তাঁর সম্বন্ধে কি ভেবেছে বা ভাবে নি—এ প্রশ্ন নিতান্তই অবান্তর। ওই শস্যক্ষেত্র কিছুদিন আগে সবুজ ছিল, এখন স্বর্ণকান্তি। কিছুদিন পরেই আবার রিক্তাভরণ হবে। কোনও অবস্থাতেই তো সে সঙ্কুচিত নয়, তার এই পরিবর্তন কার মনে কি ভাবোদ্রেক করছে তা জানবার জন্যে কিছুমাত্র আগ্রহও নেই ওর। নিজের অনন্ত ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ও সম্পূর্ণ সচেতন যেন, কারও স্তুতিনিন্দায় বিচলিত হবার ওর প্রয়োজনই নেই। খানিকক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থেকে তারপর শস্যক্ষেত্রকে প্রণাম করলেন তিনি। যা খুঁজছিলেন তা পেয়ে ভারি তৃপ্তি হ'ল তাঁর।

ডানাও খুঁজছিল।

সে যথারীতি কর্তব্যকর্ম ক'রে যাচ্ছিল সব। পাখিগুলির তদারক করছিল, দেখে বেড়াচ্ছিল কোনও পাখি কোথাও বাসা বাঁধবার আয়োজন করেছে কি না, অমরবাবু যে সব বই রেখে গিয়েছিলেন সেগুলি প'ড়ে 'পাখিদের পালক' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধও লেখবার আয়োজন করছিল, কবির কবিতা শুনছিল, রূপচাঁদবাবুকে এড়িয়ে চলছিল, সন্ন্যাসীর গতিবিধি সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছিল দূর থেকে। কিন্তু আসলে সে খুঁজছিল নিজেকে। খুঁজছিল নিজের সেই বিশেষ আকাশটিকে, যেখানে পক্ষ বিস্তার ক'রে সত্যিই আনন্দ পাবে সে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত